মহাজিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় খণ্ড

লুই ফিসার

THE GREAT CHALLENGE
BY
LOUIS FISHER

পূর্ব্বাশা লিমিটেড
কলিকাতা

২য় ও ৩য় পর্ব্ব

প্রথম সংস্করণ
চৈত্র, ১৩৫৬
দাম পাঁচ টাকা

পূর্ব্বাশা লিঃ, পি ১৩, গনেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্ব

যুদ্ধের পথে

শান্তির অভিযান

দ্বিতীয় পর্ব্ব

যুদ্ধের পথে
শান্তির অভিযান

রুজভেল্ট, গান্ধী ও চিয়াংকাইশেক

ভারতের অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে জেনারেলেসিমো চিয়াং-কাইশেক ১৯৪২-এর ২৫ শে জুলাই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সাঙ্কেতিক ভাষায় পনেরোহাজার শব্দ সম্বলিত এক গোপন তারবার্ত্তা পাঠান। এই তারবার্ত্তা ২৯শে জুলাই রুজভেল্টের হাতে পৌঁছায়। তিনি ৮ই আগষ্ট প্রায় তিনশ পঞ্চাশটি শব্দে এর উত্তর দেন। হ্রস্বতর এক বাণী পাঠিয়ে চিয়াং ১৩ই আগষ্ট প্রত্যুত্তর দেন। পরদিনই রুজভেল্ট তার জবাব পাঠান।

এই তারবার্ত্তাগুলো থেকে বোঝা যায় দুজন রাষ্ট্রনায়ক কিভাবে পরস্পরের মধ্যে পত্রালাপ করেন। এগুলো এর পূর্ব্বে কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি। দুচারজন উচ্চপদস্থ আমেরিকান ও চাইনীজ কর্ম্মচারি ছাড়া এগুলোর অস্তিত্বও কারো জানা ছিলনা।

সুরুতে চিয়াং লিখলেন, ভারতের অবস্থা এক অতি দারুণ সঙ্কটময় পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে। প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থার পরিণতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগ্রামের (বিশেষতঃ প্রাচ্যের) ফলাফল নির্ণয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। তিনি চাইলেন, রুজভেল্ট কিছু করুন। তিনি লিখলেন, ক্ষমতাদর্পীর বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষার এই সংগ্রামে আপনার দেশই নেতা, আর আপনার মতামত বৃটেন বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে। তার ওপর বহুদিন ধরে ভারতবাসীগণ আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এসে ন্যায় ও সাম্যের পক্ষে দণ্ডায়মান হবে।

ভারতবর্ষে একটা গোলমাল বাঁধবে বলে চিয়াং আশঙ্কা করলেন। তিনি জানতেন যে গান্ধী ও নেহেরু ভারতব্যাপী এক নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করবার সঙ্কল্প করেছেন। কাজেই তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানালেন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বিশেষ করে ভারতবাসীর চোখে শ্রদ্ধার পাত্র যুক্তরাষ্ট্র যদি তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা নিয়ে ভারতের নিকট এসে দাঁড়ায়, একমাত্র তাহলেই তারা তাদের কর্ম্মপন্থা পুনর্বিবেচনা করতে পারে। এতে করে তাঁরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরে পাবে আর পৃথিবীতে ন্যায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাসও শক্তিশালী হবে। অবস্থা স্বচ্ছন্দ হয়ে গেলে তা স্থায়ী করা যাবে, আর, সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞ ভারতবাসী স্বেচ্ছায়ই যুদ্ধে যোগ দেবে। অন্যথায় হতাশ ভারতবাসী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বৃটেনের অনুরূপ মনোভাবই পোষণ করবে। যদি তা ঘটে তাহলে পৃথিবীতে তা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপারই হবে, আর তাতে একা বৃটেনই ক্ষতিগ্রস্থ হবেনা।

চিয়াং আরও লিখলেন, বৃটেনের সম্বন্ধে বলা যায়, বৃটেন এক মহান দেশ এবং বিগত কয়বৎসর তা উপনিবেশ অঞ্চলে উন্নত নীতিরই অনুসরণ করেছে। অপরপক্ষে ভারত দুর্ব্বল দেশ। একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপক যুদ্ধ যখন চল্‌ছে তখন যে সাধারণ ভাবে কিছু চালানো যাবেনা তা স্বাভাবিক।

চিয়াংকাইশেক রুজভেল্টের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে বৃটেনের এই সঙ্কটের মুখোমুখী দাঁড়াবার চেষ্টা একটা শাঁখের করাতের মত। "এসব ব্যবস্থা অবলম্বনে যদি অহিংস আন্দোলন দমনও করা যায়, তবু এতে যুদ্ধক্ষেত্রের যে কোন বিপর্য্যয় অপেক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নৈতিক ক্ষতি ও আঘাত অধিকই হবে। এরূপ একটা অবস্থা বিশেষ করে বৃটেনেরই স্বার্থ-হানি ঘটাবে।"

পরামর্শচ্ছলে চিয়াং লিখলেন, "বৃটেনের পক্ষে বিজ্ঞতম ও সর্ব্বাধিক

উন্নত নীতিই হবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা। ....আমাদের সাধারণ স্বার্থে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগ্রামের যে উদ্দেশ্য তার খাতিরে আমার পক্ষে নির্ব্বাক থাকা অসম্ভব। প্রাচীন চাইনীজ প্রবাদে আছে, ভাল ঔষধ তেতো হলেও রোগ আরাম করে। অকপট পরামর্শ অপ্রীতিকর হলেও চলার পথ সুগম করে। আমি অন্তরের সহিত আশা করি, যত অপ্রীতিকরই হোক না কেন বৃটেন উদার হৃদয়ে দৃঢ়চিত্তে আমার উপদেশ গ্রহণ করবে।...”

শেষের দিকে চিয়াং লিখলেনঃ “আমি নিজমতে অবিচল থাকব। আমাদের সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতিকে বড়োরকমের বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ভারতীয় পরিস্থিতির ব্যাপারে নির্ভুল নীতি গ্রহণ করে তা কার্য্যকরী করতে সচেষ্ট হোক। আমার একমাত্র কামনাই এই, আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আপনি আপনার নির্ভুল মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।”

রুজভেল্টের উত্তর এলো। তার সুরুতে এইঃ “ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনি যে বাণী পাঠিয়েছেন, তা আমি যথাসম্ভব সুবিবেচনা ও চিন্তা সহকারে ভেবে দেখেছি। একথা আপনি অবশ্যই উপলব্ধি করবেন।” ...প্রেসিডেন্ট এবিষয়ে চিয়াংএর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন যে “সম্মিলিত পক্ষের জয়লাভের খাতিরে ভারতের পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে হবে এবং যুক্ত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতবাসীদের সক্রিয় সমর্থন লাভ করতেহবে।''

কিন্তু তারপরেই ‘কিন্তু’ এলো। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জেনারেলেসিমোকে তারযোগে জানালেন, “আপনি প্রস্তাব করেছেন আমার গভর্ণমেন্ট বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও ভারতবাসীদের উভয়কে একটা যুক্তিসঙ্গত, সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে পরামর্শ দিক। অবশ্য আমি জানি, আমার পক্ষে যে তা কত কঠিন আপনি বুঝবেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মতে ক্রীপস্ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতের সঙ্গে

বৃটেনের সন্তোষজনক মিটমাট্ সম্ভব হত।"

তিনি আরও লিখলেন, "তারওপর, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে এই মুহূর্ত্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের নিকট হতে এ ধরণের প্রস্তাব এলে ভারতের একমাত্র অস্তিত্বশালী গভর্ণমেণ্টের শক্তিতে ফাটল ধরবে। আর এতে করে আপনি ও আমি যে সঙ্কট এখনো এড়ানো যায় বলে আশা করছি, সে সঙ্কটই এসে দেখা দেবে।"

উপসংহারে রুজভেল্ট লিখলেন, "সুতরাং অবস্থাদৃষ্টে মনে করি," আপনার প্রস্তাবে যে ধরণের কর্ম্মপন্থার উল্লেখ আছে, তা থেকে আপনার ও আমার বিরত থাকাই বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে।"

ওয়াশিংটন থেকে প্রেসিডেণ্টের সাঙ্কেতিক ভাষার তারবার্ত্তা পাঠানোর পরদিন গান্ধী, নেহেরু কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ ও তাঁদের হাজার হাজার অনুগামীদের গ্রেপ্তার করে জেলে দেওয়া হল। পরে ভারতের বৃটিশ লর্ড চিফ-জাষ্টিস্ স্যর মরিস গয়ার এক প্রকাশ্য নির্দ্দেশনামায় ঘোষণা করেন যে ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীদের বেআইনীভাবে জেলে দেওয়া হয়েছে। যে আইনের বলে তাঁদের ধরা হয়েছে সে আইন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রযোয্য নয়। তারপর ১৯৪৩-এর ২৮ শে সেপ্টেম্বর এক অর্ডিনান্স জারী করে ভাইসরয় ১৯৪২-এর আগস্ট-গ্রেপ্তার বৈধ করলেন।

এই গ্রেপ্তারে ভারতব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। আইন অমান্য আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। তার ওপর, এই আন্দোলন দেখতে না দেখতে সহিংস সংগ্রামে পরিণত হ'ল।

গ্রেপ্তারের ব্যাপারের দুদিন পর চিয়াংকাইশেক রুজভেল্টকে তার করলেন, "আমি নিশ্চয় জানি যে গান্ধী, নেহেরু সহ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তারের সংবাদে আপনি আমারই মত উদ্বিগ্ন।" রুজভেল্টকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে

হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্ত দেখেও চিয়াং তাঁকে যাহোক একটা কিছু করতে পুনর্ব্বার অনুরোধ করলেন।

."সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিঘোষিত নীতি সর্ব্বজাতির সকলের জন্য ন্যায় ও স্বাধীনতা নিরাপদ করা। যেভাবেই হোক, এ ঘোষণার আন্তরিকতা বিশ্বের কাছে প্রামাণ করতেই হবে। আটলাণ্টিক সনদের অনুপ্রাণিত উদ্যোক্তা হিসাবে আমি একান্তভাবে আপনার নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, ভারত ও বিশ্বের সম্মুখে যে দুরূহ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, তা সমাধান করবার জন্য আপনি (কার্য্যকরী ?) ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। এ ব্যপারে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে উদয় হয়েছে।"........শেষের দিকে চিয়াং প্রায় ভয়ের ইঙ্গিত করলেন ঃ

"আমরা যারা এতদীর্ঘদিন এত কঠোর ক্লেশ সহ্য করে আক্রমণ-কারিদের পাশব শক্তি প্রতিরোধ করেছি, তাদের সকলকে আপনার নীতিই পথ দেখাবে। বিশ্বাস করি, আপনি এর উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।"

ঘটনাবলী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চুংকিং থেকে চিয়াং যেদিন বাণী পাঠালেন, তারপরদিনই রুজভেল্টের উত্তর এলো ঃ "আমার গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘদিনের নীতি, এবং আটলাণ্টিক সনদের ব্যবস্থা, এই উভয়বিধ বিবেচনায়ই স্বাধীনতাকামী পরাধীন জাতিসমূহের প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন। এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের সরকারী মুখপাত্রগণ বহুদিন ধরে এই নীতি বারবার ঘোষণা করে এসেছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মত ব্যাপারে এই নীতির বাস্তব প্রয়োগও করা হয়েছে।......." প্রেসিডেণ্ট আরো লিখলেন, এটা পরিস্কার যে ইংরেজ সরকার ও গান্ধীদলের গুরুতর অন্তর্বিরোধের মধ্যে কার্য্যতঃ অংশ না নিয়ে আপনি ও আমি বাইরে থেকে আপোষ-মীমাংসার সকল চেষ্টাই

করেছি। ।কন্তু এ পর্য্যন্ত তা ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হয়েছে।.... ভারতের সাহায্যে আমাদের একান্তই প্রয়োজন। সাহায্য যে এই মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন, গান্ধী যদি তা আরো ভালোভাবে বুঝতেন! আর, অক্ষশক্তি জয়ী হলে যে ভারত সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থারই সম্মুখীন হবে, এটা যদি তিনি বুঝতেন!"

"আমার সঙ্গে আজ প্রশান্তমহাসাগরীয় পরিষদের দেখা হয়েছিল। চীনের বৈদেশিক সচিব ডক্টর স্থঙ্‌ও সেখানে ছিলেন। আমি তাঁদের বল্‌লাম যে, আপনার ও আমার কর্ত্তব্য হল ইংরাজ সরকার ও গান্ধীপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া যে তাঁদের ব্যাপারে জোর করে কিছু করার নৈতিক অধিকার এখনো আমাদের হয়নি। আমাদের স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের জানান উচিত যে, উভয় পক্ষের সম্মতি থাকলে বন্ধুজনোচিত সকলপ্রকার সাহায্যদানেই আমরা সানন্দে প্রস্তুত।"

শেষের দিকে রুজভেল্ট লিখলেন, "আমরা যে উভয় পক্ষের আহ্বানে সবকিছুই করতে প্রস্তুত এ সাধারণ কথাটা ভারতবাসীদের জানিয়ে দিলেই, আমার মতে, আপনি-আমি তাদের কাজে আসতে পারি। প্রকাশ্য কোন আবেদন বা ঘোষণায় সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।"

রুজভেল্ট আগেই জানতেন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোনদিনই তাঁর বা অন্য কারো কাছে সাহায্যের আবেদন জানাবেন না। স্থতরাং দুপক্ষের একযোগে আবেদন কোনদিনই ঘট্‌বেনা। প্রকৃতপক্ষে রুজভেল্ট চিয়াংকাইশেকের ভারতের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করলেন। রুজভেল্ট বৃটেনের বিচার-বুদ্ধির উপরই ভরসা করছিলেন। তিনি জানতেন ভারতের গোলমাল যুদ্ধজয়ে বিলম্ব ঘটাবে। কিন্তু তিনি কূটনৈতিক রীতি-নীতির খুঁটিনাটি মানতেন; উভয়পক্ষ আহ্বান না জানালে তিনি হস্তক্ষেপ করবেননা।

অর্থাৎ তিনি হস্তক্ষেপই করবেননা।

উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সম্পত্তিগত অধিকার রুজভেল্ট স্বীকার করে নিচ্ছিলেন। এক উপনিবেশে আগুন লাগল। এতে বাইরের জগতেরও বিপদ ঘটতে পারে। উপনিবেশের মালিক দমকলের লোকদের ঢুকতে দিলেন না, আর দমকলের লোকরাও সবিনয়ে সরে গেল।

সাম্রাজ্যবাদী শাসক যখন নড়বেনা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও ভালমন্দে আসবেনা, তীব্র স্বাধীনতাকামী উপনিবেশগুলির পক্ষে তখন বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কি করা সম্ভব? ১৯৪২-এর জুলাই-আগষ্টে রুজভেল্ট-চিয়াংকাইশেকের মধ্যে যে পত্রালাপ চলছিল ভারত ও এশিয়াবাসীদের কাছে তা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁরা এটা জানতেন যে বৃহৎ শক্তিগুলির কোনটিই স্বাধীনতাকামী এশিয়ার কোন জাতিকে সাহায্যদানে প্রস্তুত নন। এধারণা তাঁদের মনে দৃঢ়মূল ছিল।

কেবলমাত্র সাম্প্রতিক আজ সুবিধার দিকে নজর রেখে রাজনীতি পরিচালিত করলে ভবিষ্যতের জন্য বিপদই সঞ্চিত হয়। ১৯৪২-এর সমস্যাগুলি মেটাতে না পারায় ১৯৪৫-৪৬-এর সমস্যাগুলিও অধিকতর জটিল হয়ে উঠল।

সামনার ওয়েলস্ '৪২ সালে আমেরিকার আণ্ডার-সেক্রেটারী ছিলেন। এবিষয়ে রুজভেল্টের মতামত তিনি জানতেন। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে' ৪৫-সালের ৮ই আগষ্ট তিনি লিখলেন, "প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিশ্বাস করতেন যে ভারতের স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্তি সুদূরপ্রাচ্যের সুশৃঙ্খল অগ্রগতি বহুল পরিমাণে এগিয়ে দেবে। প্রচেষ্টা ও ভুলভ্রান্তির অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটা সহজ সমাধানে পৌঁছতে পারলেই ভারতবাসী পরিণামে রুচিসম্মত স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।"

চার্চিল এসব পছন্দ করেননি। ওয়েলস্ লিখলেন, যুদ্ধের এক অতি সঙ্কটময়-ক্ষণে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ও-ধরনের বন্ধুভাবাপন্ন প্রস্তাবে কোন লাভই হয়নি। শুধু তাই নয়, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হন।

চার্চিলকে টলানো সহজ ছিলনা। রুজভেল্ট বারকয়েক চার্চিলের সঙ্গে ভারতপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারেননি। তাতে শুধু চার্চিলের ক্রোধেরই উদ্রেক হয়েছিল, আর তা বেশ প্রকাশও পেয়েছিল।

যুদ্ধশেষের অবশ্যম্ভাবী সামাজিক পরিবর্ত্তনে তাঁর ইংলণ্ড সুবিধাভোগী ও শ্রেণীবিভক্ত সমৃদ্ধ ইংলণ্ড আর থাকবেনা, প্রধানতঃ এই ভয়েই প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তোষণ-নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চার্চিলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ড একটা যুদ্ধ চালাতে পারে, তাতে জয়ী হতে পারে এবং নিজসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। ভারতবিহীন ইংলণ্ডের অস্তিত্ব চার্চিলের কল্পনায় ছিলনা। চার্চিলকে ভারতের স্বার্থ ত্যাগ করতে বলার একমাত্র অর্থই হল তিনি যার জন্য যুদ্ধ করছিলেন তা-ই ত্যাগ করা।

একটা বিলম্ব-ক্রিয় বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বজায় রেখে সাময়িকভাবে তার বিস্ফোরণ ঠেকিয়ে রাখা যা, সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চার্চিলের কথায় ভারতের ব্যাপার স্থগিত রাখাও তা-ই। ফলে দাঁড়াবে এই যুদ্ধপর্ব্বের শেষে সাম্রাজ্যবাদজাত গুরুতর সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব সবটাই পড়বে শান্তিস্থাপয়িতাদের ঘাড়ে। যুদ্ধকালীন সময়ে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞতর ব্যক্তিরা ঔপনিবেশিক আধিপত্যের দুষ্টক্ষত থেকে জগতকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের দিনকে এগিয়ে আনার যে কোন প্রচেষ্টাকেই সমর্থন করতেন। উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারলে ঐ সময়েই ভারতের ব্যাপারের নিষ্পত্তি করা

অধিকতর সহজ হত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নায়ক '৪২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এক হস্তলিখিত পত্রে সংক্ষেপে বিরূপ মতই প্রকাশ করলেন। মন্ত্রীবর আমাকে লিখলেন, "স্বীকার করি, আমার মনের একটা একরোখামি আছে। বর্ত্তমান সমস্যা-সমাধানের তাগিদে অন্য সবকিছুই আমি উপেক্ষা করি। আর বর্ত্তমান সমস্যা বলতে আমি শুধু বুঝি কিভাবে স্বল্পতম সময়ে সর্ব্বাধিক শত্রু নিপাত ও সর্ব্বাধিক পরিমাণ সাজসরঞ্জাম ধ্বংস করা যায়। সুতরাং ভূত-ভবিষ্যতের কথা আমার ভাববার সময় নেই। যুদ্ধোত্তর গঠনকর্ম্মে সহযোগী হতে পারেন, অথচ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ব্যাহতই করছেন বলে মনে হচ্ছে, এমন লোকদের বন্ধুত্ব এখন আমি চাইনে। জানিনা আমার এ সীমাবদ্ধ মতামত গান্ধী ও তাঁর কার্য্যকলাপের ব্যাপারে প্রযোজ্য কিনা, কিন্তু আমি জানি আমাদের সবকিছু করবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং আমি মনে করি, কতটা শক্তি ব্যবহার করলে আমরা সর্ব্বাধিক দ্রুত জয়লাভ করতে পারি, সে বিষয়েই আমাদের একমনে ভাবা উচিত। তারপর আমাদের মধ্যে যে অল্প কয়জন মস্তিষ্কবান ব্যক্তি আছেন, তাঁদের সাহায্যে অতীতের অন্যায় দূর করে।দয়ে মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব। একথায় কি তোমার ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে?"

এতে আমার বিরক্তির উদ্রেক হয়নি, আমি এতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। কারণ এই মতবাদ হচ্ছে ওয়াশিংটনের একটা নামজাদা সম্প্রদায়ের। এই মতবাদের হোতা ছিলেন হ্যারী হপ্‌কিনস্। তাঁর নীতি সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছিলেন, প্রথমে যুদ্ধে জয়ী হও: শান্তির ব্যাপারে ঘাবড়াও কেন? ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে এই যে শান্তি বসে থাকেনা। আমরা শান্তিস্থাপনে অগ্রণী না হয়েও শান্তিস্থাপন করলাম। আমরা না করলেও অন্যেরা ছিল।

যুদ্ধকালে আমাদের শক্তি ও প্রভাব যখন সর্ব্বাধিক ছিল, তখন আমরা উঠে পড়ে লাগতে অনিচ্ছুক ছিলাম বলেই আজ এই সঙ্কট। ১৯৪৪-এর ৩০ শে আগষ্ট ওয়েণ্ডেল উইলকির সঙ্গে আমার দেখা হয়। ঠিক তার এক সপ্তাহ পরেই তিনি হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে বাধ্য হন। সেখানেই তিনি মারা যান। তিনি বল্লেন, "১৯৪০ সালের বসন্তকালেই আমরা শান্তি হারাতে সুরু করলাম। ১৯৪২ সালে পৃথিবী ঘুরে এসে আমি প্রেসিডেণ্টের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে বিমানযোগে মস্কো গিয়ে ষ্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করি। আমি তাঁকে বললাম, ষ্টালিন রাশিয়া ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হলেও সাক্ষাতের জন্য ষ্টালিনের কাছে গেলে তাঁর সম্মানের কোন হানি হবে না। আমরা শক্তিমান, শক্তিমানের পক্ষেই এ সম্ভব। তখন ছিল অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানোর প্রকৃষ্ট সময়। কেননা রাশিয়া তখনো শক্তিমান হয়ে ওঠেনি, তাই শান্তি সম্পর্কে সন্দিগ্ধও হয়নি। শক্তিমান প্রায়ই সন্দেহাত্মা হয়।"

উইলকি মুহূর্ত্তের জন্য জানালার বাইরে তাকালেন। কর্ম্মব্যস্ত নিউইয়র্ক বন্দরের সবটাই দেখা যাচ্ছে। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে আমার কথার সূত্র ধরে বলতে লাগলেন: "আমি মাইক (গার্ডেনার) কাউলেস্‌কে দিয়ে প্রেসিডেণ্টের ক্রেমলিন গমনের উদ্দেশ্যের খসড়া দিয়ে একটা স্মারকলিপি পর্য্যন্ত তৈরী করেছিলাম। মাইক গভর্ণমেণ্টের কাজে আমার সহযাত্রী হয়েছিলেন। লিখিত স্মারকলিপি তৈরী করার একটা কারণ আছে। ১৯৪১ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে আমি প্রেসিডেণ্টের নিকট এ ধরণের একটা প্রস্তাব করেছিলাম। আমি তাঁকে চার্চ্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভবিষ্যৎ শান্তির রূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনুরোধ করি। সে সময়ে ভারত, চীন ও অন্যান্য দেশের

সম্বন্ধে কিছু একটা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন…” উইল্‌কি হঠাৎ থেমে গেলেন। পূর্ব্বেকার সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার না করায় নিরুপায় ভাবে শান্তিভঙ্গ দেখতে হল !

অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজ স্বার্থে ক্ষমতা ব্যবহার একটা জাতির পক্ষে অন্যায়। একটা জাতি যখন স্বাধীনতা ও মানবীয় শিষ্টাচারের ভিত্তিতে কল্যাণকর শান্তি স্থাপনের জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করে তখন তা' মঙ্গলকর।

সামনার ওয়েল্‌সের ভাষায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিশ্বাস করতেন যে স্বায়ত্তশাসন-সম্পন্ন ভারত সুদূরপ্রাচ্যের সুশৃঙ্খল অগ্রগতি বহুলপরিমাণে এগিয়ে দেবে। সুতরাং তাঁর পক্ষে উচিত ছিল ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা। শান্তির পাকা বনিয়াদ গড়বার জন্যে প্রথমেই যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান যেত, তাহলে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দিকে আমেরিকার ঝোঁক বন্ধ করা অধিকতর সহজ হত।

চার্চ্চিলের কাছ থেকে একগজ দূরে বসলেও তাঁর রোষের অভিব্যক্তিতে যে কেউ বিব্রত হত। কিন্তু ভবিষ্যতে যে রোষ তার পরিমাণ অনেক বেশি।

চিয়াংকাইশেক ও রুজভেল্ট দুজনকেই চার্চ্চিল প্রতিনিবৃত্ত করলেন। ভারতের ব্যাপারে একটা কিছু করবার জন্য জেনারেলেসিমো চিয়াং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সরসরি আবেদন জানিয়েছিলেন। উত্তরে চার্চ্চিল-সরকার জানালেন যে চীন এভাবে ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে চল্‌লে ইঙ্গ-চীন সন্ধিচুক্তি বিঘ্নিত হবে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল কুইজন ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন ডি সির সোরহাম হোটেলে আমাকে বলেছিলেন: “যদি আমেরী (লিওপোল্ড, এস্, আমেরী, ভারত-সচিব) আমার রাষ্ট্রদূতকে একথা বলতেন আর আমার দেশ যদি দেড়কোটীর দেশ না হয়ে চল্লিশ কোটীর দেশ

হত, তাহলে আমি তাঁকে বলতাম, ভাল, ঐ সন্ধির কোন মূল্যই আর আমার কাছে নেই। তারপর আমি জাপানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতাম।”

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিজয় বিপন্ন হতে পারে এমন কিছুই না করতে অনুরোধ করে ৭ই আগষ্ট কুইজন গান্ধী, নেহেরুকে যে তারবার্ত্তা পাঠিয়েছিলেন, সেটা আমাকে জোরে পড়ে শোনালেন। কুইজন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে ঐ তারবার্ত্তাগুলি দেখিয়েছিলেন। রুজভেল্ট তা অনুমোদনও করেছিলেন। তারবার্ত্তাগুলি কোনদিনই গান্ধী, নেহেরুর হাতে পৌঁছয়নি।

১৮ই সেপ্টেম্বর কুইজন ওয়াশিংটনের বৃটিশ রাজদূত লর্ড হালিফক্সের এক পত্র পেলেন। লর্ড হালিফক্স তাঁকে জানালেন যে ভাইসরয় লিনলিথ্‌গো তারবার্ত্তাগুলি গান্ধী নেহেরুকে দিতে সম্মত নন।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে হোয়াইট্‌ হাউসে অনুষ্ঠিত প্রশান্ত-মহাসাগরীয় পরিষদের এক সভায় কুইজন ভারতের প্রশ্ন তুললেন। তিনি যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করে একথাই বোঝাতে চাইলেন যে আমেরিকারই মধ্যস্থতা করা উচিত। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে ভারত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুবই সামান্য। কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকানই ভারতের স্বাধীনতার সমর্থক, এবং বৃটেন ও ভারত একসঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা চালাক, এটা খুবই বাঞ্ছনীয়। সভায় লর্ড হালিফক্সও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর বৃটেন তা করবেও। কুইজন তখন চৈনিক রাষ্ট্রদূত ডক্টর সুঙ্‌-এর দিকে ফিরে তাঁর মতামত জানতে চান। সুঙ্‌ উত্তর দেন যে ইঙ্গ-মার্কিণ আন্তরিকতার পরীক্ষাক্ষেত্রই ভারতবর্ষ।

২৮শে আগষ্ট হালিফক্স আমাকে বললেন যে বৃটিশের নীতি

শুধু শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, আর কিছু নয়। তিনি বল্লেন, "আমি ভারতের ভাইসরয় হলে—সুখের বিষয় আমি তা নই—নিশ্চয়ই এখন কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতাম না। ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী অজ্ঞ। অক্ষরজ্ঞানহীন মেষপাল। আপনি যদি এই জনতাকে শাসন করতে চান তবে আপনাকে দেখাতে হবে শাসন করবার ক্ষমতা আপনার আছে।

এই মনোবৃত্তির জন্যই চার্চ্চিল ও হালিফক্স রুজভেল্টকে ভারতের ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন। আর রুজভেল্টও চুপ করে গেলেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের হাতে পৌঁছাবার জন্যে মহাত্মা গান্ধী আমাকে একটা ব্যক্তিগত পত্র দিয়েছিলেন। এই পত্রের যথেষ্ট গুরুত্বও ছিল। প্রেসিডেন্ট যদি এই পত্রের কথাগুলি বিবেচনা করে কাজ করতেন, তাহলে ভারতের অনেক গোলমালই এড়ানো যেত। আমি যথাসম্ভব শীঘ্র এটা প্রেসিডেন্টের হাতে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান-বাহিনীর জেনারেল গ্রাবার তখন বিশেষ অনুমতিতে বিমানযোগে সোজা ওয়াশিংটন যাচ্ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন বল্লেন। মহাত্মা গান্ধীর চিঠিটা আমি তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম। চিঠিটা ১৯৪২-এর ১লা জুলাই সেবাগ্রাম থেকে লেখা হয়েছিল। আর সেটা এই:

প্রিয় বন্ধু,

আপনার মহান্ দেশে দুবার আমার যেতে-যেতে যাওয়া হয়নি। জানা অজানা আমার অনেক বন্ধুই সেখানে আছেন। আমার অনেক দেশবাসী সেখান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন, এখনও করছেন। আমি এও জানি যে কয়েকজন সেখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেছেন। থরো ও ইমাসনের লেখা পড়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। আপনার দেশের সঙ্গে যে আমার গভীর

যোগাযোগ রয়েছে তা জানাবার জন্যই আমি এসব উল্লেখ করছি। গ্রেট বৃটেন সম্বন্ধে আমি এর অধিক বল্‌তে চাইনে যে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে আমার তীব্র বিরাগ থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে আমার অনেক বন্ধু রয়েছেন। তাঁদের আমি আমার দেশবাসীর মতোই ভালবাসি। সেখানেই আমি আইন অধ্যয়ন করেছি। তাই ইংলণ্ড এবং আপনার দেশের প্রতি আমার শুধু শুভেচ্ছাই রয়েছে। সুতরাং আপনি বিশ্বাস করুন ভারতের জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন উল্লেখ না করেই বৃটেনের সরলমনে অবিলম্বে শাসন গুটিয়ে নেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাব আমি খুব বন্ধুভাবেই করছি। বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের মনে যে বিরূপ মনোভাব রয়েছে, (এর বিপক্ষে যাই বলা হোক না কেন), তা আমি শুভেচ্ছায় পরিণত করতে চাই। এভাবে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক বর্ত্তমান যুদ্ধে তাঁদের অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

আমার ব্যক্তিগত ভূমিকা পরিষ্কার, আমি সকল প্রকার যুদ্ধই ঘৃণা করি। সুতরাং আমি যদি দেশবাসীদের বোঝাতে পারি তাহলে সম্মানজনক শান্তির পথে তাঁদের কার্য্যাবলী প্রবল এবং চূড়ান্ত হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু আমি জানি অহিংসার উপর আমাদের সকলের জ্বলন্ত বিশ্বাস নেই। সে যাই হোক, বৈদেশিক শাসনে থেকে বর্ত্তমান যুদ্ধে আমরা কোন কার্য্যকরী অংশই গ্রহণ করতে পারিনা। যা পারি তা কেবল দাসরূপেই, সম্মানজনকভাবে কাজ করবার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃটেনকে বিব্রত না করাই কংগ্রেসের বরাবরের নীতি।

কংগ্রেস বহুলাংশে আমার দ্বারাই পরিচালিত। একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে কংগ্রেসই ভারতে সর্ববৃহৎ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। প্রায় সকল দলই ক্রীপস্‌ মিশন প্রস্তাবিত বৃটিশ নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। এই নীতি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এজন্যেই

আমি বর্ত্তমান প্রস্তাবগ্রহণে বাধ্য হয়েছি। আমি বলতে চাই আমার প্রস্তাব পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেই মিত্রশক্তির আদর্শ দুর্ভেদ্য বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পারে। আমি সাহস করে বলব, যতদিন ভারত ও আফ্রিকা গ্রেটবৃটেনের দ্বারা শোষিত হবে, আর আমেরিকার নিজদেশে নিগ্রোসমস্যার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন মিত্রপক্ষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ঘোষণা অন্তঃসার-শূন্যই মনে হবে। কিন্তু জটিলতা এড়াবার জন্য আমি ভারত-প্রসঙ্গই শুধু উল্লেখ করেছি। যদি একই সঙ্গে মুক্তিলাভ না ঘটে, ভারত মুক্তিলাভ করলে অন্যান্য দেশ অবশ্যই পরে মুক্ত হবে। আমার প্রস্তাব যাতে নির্ব্বোধের নিকটও স্বচ্ছ হতে পারে—এজন্যে আমি বলেছি যে মিত্রশক্তি জাপানী আক্রমণ থেকে ভারত ও চীনকে রক্ষা করবার জন্যে (ভারতের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলারক্ষা করবার জন্যে নয়) প্রয়োজনবোধে নিজ ব্যয়ে সৈন্যদল রাখতে পারে। ঠিক আমেরিকা ও বৃটেনের মতোই ভারতকে স্বাধীন হতে হবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকল প্রকার বহিঃপ্রভাবমুক্ত ভারতের জনগণের দ্বারা গঠিত স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারেই যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় সেনাদল ভারতে থাকবে।

এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে সক্রিয় সহানুভূতি লাভের জন্যেই আমি এই পত্র প্রেরণ করছি।

আশা করি এ প্রস্তাব আপনার অনুমোদন লাভ করবে।

মিষ্টার লুই ফিশার আপনার নিকট এই পত্র বহন করছেন।

আমার পত্রে কোন অস্পষ্টতা থাকলে আপনি আমাকে জানালেই আমি তা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করব।

পরিশেষে আমি আশা করি আপনি আমার এ পত্রকে অনধিকার-

চিঠি বিবেচনা করে বিরূপ হবেন না, এ পত্র মিত্রপক্ষের মঙ্গলকামী বন্ধুর পত্র বলেই বিবেচনা করবেন।

ভবদীয়

স্বাঃ এম্, কে, গান্ধী

প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কালিন, ডি, রুজভেল্ট সমীপে—

ভারত থেকে মিয়ামী এসে আমি সাক্ষাৎলাভের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট তার করি। দুদিন পরে, প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী এম্-এম্ ম্যাক্‌ইস্টায়ার স্বাক্ষরযুক্ত এক তারবার্ত্তা আমার নিকট পৌঁছে: "কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী। তাই আপনার সঙ্গে সেক্রেটারী হালের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি।"

কয়েকদিনের মধ্যেই ১৯৪২-এর ১১ই আগষ্টের তারিখযুক্ত প্রেসিডেণ্টের এক পত্র পেলাম। পত্র নিম্নরূপ:

প্রিয় মিষ্টার ফিশার,

আমি পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সংযোগ রাখতে চেষ্টা করছি। প্রত্যহ একাধিক স্থান থেকে আমি সর্ববিশেষ সংবাদ পাই।

আপনার একান্ত

(স্বাঃ) ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট

এটা আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় যে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার মনে হ'ল যে গান্ধীর চিঠি যদি জেনারেল গ্রাবারকে দিয়ে না পাঠিয়ে নিজের কাছে রাখতাম, তাহলে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা অধিক থাকত।

১২ই আগষ্ট রুজভেল্টের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বল্লেন, "ফ্রাঙ্কলিন আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনার বক্তব্য জেনে তাঁকে তা জানাতে বলেছেন।"

ভারতবর্ষ থেকে নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর মিসেস ক্লেয়ার বুথ আমাকে টেলিফোন করে শুধোলেন, উইল্‌কির সঙ্গে আমার

কথা হয়েছিল কিনা। আমি 'না' বলায় [redacted] করলেন। ১৫ নম্বর ব্রড স্ট্রীটে তাঁর অফিসে আমি [redacted] প্রবেশ করার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন না। তিনি অত্যন্ত [redacted] বললেন, আমেরিকার ভারতীয় লীগের প্রেসিডেণ্ট জে জে সিং আমাকে বললেন উইল্‌কি তাঁকেও অনুরূপভাবেই অভ্যর্থনা করেছেন। এ আমার ভালই লাগল। আমি তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ লাভ করলাম। ক্লান্ত অবস্থায় তাঁর চেহারায় দেখা গেল একটা ধূসর পাণ্ডুরতার আভাস—যদিও তাঁর কেশ আদৌ ধূসরবর্ণ হয়নি।

উইল্‌কি ভারতের ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হলেন। তিনি ভাবছিলেন এমন দিন আসবে যখন আমাদের সংগ্রাম-আদর্শ হবে প্রকৃত শান্তি কায়েম করবার হাতিয়ার। সেই অনাগত দিনে অবস্থার রূপান্তর ঘটবে। তাঁর কামনা ছিল সমস্যা-সমাধানকালে যেন তাঁর মতামত বিবেচিত হয়। তিনি বললেন, "এক দুনিয়া" ব্যপদেশে তাঁর ভারতে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল। এ-ইচ্ছা তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট প্রকাশও করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁকে জানালেন যে কোন আমেরিকানেরই সে অবস্থায় ভারতে যাওয়া উচিত নয়, এবং উইল্‌কির উচিত হবে নিকট প্রাচ্য, রাশিয়া ও চীনের মধ্যেই তাঁর ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রাখা।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এক বেসরকারী উপদেষ্টার সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতাম। আমি ভারত থেকে ফিরবার পর তিনি উভয়ের এক সাধারণ বন্ধুর মারফৎ আমাকে জানালেন যে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে ইচ্ছুক নন।

আমেরিকার নীতিই ছিল ভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে বৃটেনকে উত্তেজিত না করা। এটা সুবিধাজনক ছিল। একটা সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া প্রায়ই সুবিধাজনক। কিন্তু এর মূল্য দিতে হতে পারে অনেক।

১৯৪২-এর ২৭শে আগষ্ট আমি রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State) কর্ডেল হালের সঙ্গে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সময় বেলা বারোটা পনেরোতে সাক্ষাৎ করি। তিনি ভারত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে মন্তব্য করলেন, "মুস্কিল হচ্ছে এই—অপর পক্ষ যখন স্বমতে অটল, তখন আমাদের হস্তক্ষেপ সম্ভব নয়। কোন বৈদেশিক শক্তি আমাদের মন্‌রোনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গেলে যা দাঁড়ায়, এও ঠিক তাই।" আমি বল্‌লাম, "ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার খানিকটা দায়িত্ব আমাদের। সেইরূপ, কোন লাটিন আমেরিকান জাতিকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষার কিছু দায়িত্ব যদি বৃটেনের থাকত, আর একটা সমগ্র মহাদেশ যদি সেই জাতিকে মিত্রপক্ষের আন্তরিকতার পরীক্ষাক্ষেত্র বলে বিবেচনা করত (যেমন ভারতকে করা হচ্ছে), তাহলে এ ব্যাপারে ইংলণ্ডের কিছু বলবার অধিকার থাকত।"

মিষ্টার হাল বল্‌লেন যে স্বাধীনতা আন্দোলন ও নূতন গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে সবসময়েই তাঁর একটা সমর্থনের মনোভাব রয়েছে। তিনি বললেন, "খ্রীষ্টের দিব্য, আমাব যখন বয়স অল্প ছিল, কিউবার স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে আমি তখন একটা রেজিমেণ্ট গঠন করেছিলাম। ১৯৩৩ সালে বহু বাধাবিঘ্নের মুখে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে স্বীকার করে নেওয়ার আন্দোলনেও অগ্রণী হয়েছিলাম। আমরা লাটিন আমেরিকায় 'উত্তম প্রতিবেশী নীতি' প্রবর্ত্তন করেছি। চীনদেশের ব্যাপারে আমি সম-অধিকার সমর্থন করেছি।...ভারতবর্ষের ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট চেষ্টার কোনই ত্রুটি করছেন না। কিন্তু বৃটেন স্বমতে অটল থাকাতে আমরা অধিকদূর এগোতে পারিনা। অন্য কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলে হয়তো বল্‌বে, সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।" বারকয়েক তিনি এর পুনরুক্তি করলেন।

বেলা বারোটা চল্লিশে মিষ্টার হালের সেক্রেটারী এসে শুধোলেন তিনি মধ্যাহ্ন-ভোজন করবেন কিনা। তারপরই সেক্রেটারী একটা ট্রেতে করে এক প্লেট ঠাণ্ডা বীফ রোষ্ট, কাঁচা শাকের ঘণ্ট, এক গ্লাস টম্যাটোর রস, এক গ্লাস দুধ, এক গ্লাস জল ও এক কাপ চা নিয়ে এলেন। এগুলির সদ্ব্যবহার করে হাল বল্লেন, "আমাকে এখন উঠ্‌তে হবে। আমি আজ নিউজিলাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ফ্রেজারকে মধ্যাহ্ন-ভোজনে আপ্যায়িত করব।"

এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কয়েকটি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে যুদ্ধ চালায়। তারা তাদের সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও সরবরাহ একত্রিত করে। তাদের সন্তানরা একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। কিন্তু সন্ধি-স্থাপনের বেলায় তারা নিজ নিজ পথে চলে। তারা তাদের সর্ব্বময়কর্তৃত্বে অনধিকার হস্তক্ষেপ সহ্য করেনা। এবিষয়ে তারা অটল। এ মনোভাবের অবসান না ঘট্‌লে শান্তিস্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কথা আজগুবিই থেকে যাবে।

ভারতে বৃটেন শক্তিবলে সর্ব্বময় কর্ত্তা। ভারতবাসীদের বৃটেনকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা থাকলে তারাই সর্ব্বময় কর্ত্তা হত। রাশিয়া বাল্টিক সাগরতীরের রাষ্ট্রগুলি ও পূর্ব্বপোলাণ্ড তার কর্তৃত্বাধীন করেছে; কারণ, অধিকতর শক্তিশালী বলে বাইরের কারো হস্তক্ষেপই সে সহ্য করবেনা। এ হচ্ছে আইন-কানুনবিরুদ্ধ নিছক শক্তিলীলা।

মধ্যযুগে যেমন দস্যুদল রাজপথে জাঁকিয়ে বসে দুর্ব্বল নাগরিকদের কাছ থেকে কর আদায় করত, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও মানবতা তেমনি সেই মধ্যযুগেই আছে।

শক্তিমান আইন-লঙ্ঘনকারিদের অঙ্কিত মানচিত্রে যখন

শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন সর্ব্বজাতির প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, আর তার কর্ত্তৃত্ব যখন আইন লঙ্ঘনকারী গভর্ণমেণ্টগুলির হাতেই থাকে, তখন স্বভাবতঃই তা পঙ্গু হতে বাধ্য।

নীতি বা বিধি-বিরুদ্ধ ক্ষমতা চালানোই ফ্যাসিবাদ। এ অবস্থায় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সংগ্রাম-রত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি করে এমন ধারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করল, যার দেহের রক্তমাংসে নীতি-বিরহিত বিধি-বিরুদ্ধ শক্তি থেকে যায়?

কোথায় চলেছে আমেরিকা, আর কোথায়ই বা চলেছে পৃথিবী?

আর একটা যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী, আর এবার কি হবে আণবিক যুদ্ধ?

স্বস্তির সন্ধান

শক্তিমত্তার দিক থেকে যে দুটো জাতির স্থান প্রথম ও দ্বিতীয়, তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি গড়ে ওঠে। নেপোলিয়নের যুগে ইউরোপ সকল সময়েই ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের আবর্ত্তনদণ্ডে ঘূর্ণিত হত। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম চার দশকে (১৯১৯ থেকে ১৯৩৫ বাদে, তখন জার্ম্মানী দুর্ব্বল ছিল) ইঙ্গ-জার্ম্মান দ্বন্দ্বই ইউরোপের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত করত। আজ প্রকৃতপক্ষে বা সম্ভাবনার দিক থেকে রাশিয়াই ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ রাষ্ট্র, তারপরে ইংলণ্ড। ফলে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কই আজ ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা।

ইউরোপ তার সাগরপারের সাম্রাজ্য নিয়ে কয়েক শতাব্দীকাল পৃথিবীর প্রায় সকল ক্ষমতাই অধিকার করেছিল। ফলে ইউরোপের বৈদেশিক কার্য্যকলাপই সারা পৃথিবীর রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায়।

ইউরোপ আজ আর পৃথিবীতে শক্তির প্রধান আধার নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নে (যার বড়ো একটা অংশ ইউরোপের বাইরে) বিরাট শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান রাষ্ট্র আমেরিকা ও দ্বিতীয়-শক্তি রাশিয়ার সম্পর্কই বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

ইউরোপে রুশ-শক্তিকে বৃটিশের সম্মুখীন হতে হয়। সারাবিশ্বের ব্যাপারে রুশ-শক্তিকে আমেরিকার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও যে মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মতভেদ ঘটেনা এমন নয়।

বৃহৎ শক্তিত্রয় একসঙ্গে যুদ্ধজয় করেছে। সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে রাশিয়া ও আমেরিকার দূরত্ব অনেক। ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তাহলে এই সংঘর্ষ ও তিক্ততা কেন ?

জার্ম্মানীর দ্বারা ইংলণ্ড বিপন্ন হল, আর ইংলণ্ডের পতন হলে যুক্তরাষ্ট্রও বিপন্ন হত। অতঃপর জার্ম্মানীর দ্বারা রুশশক্তি আক্রান্ত হ'ল। এ পরিস্থিতিতেই বৃহৎ ত্রিশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়।

জার্ম্মান-শক্তি আজ বিধ্বস্ত। জাপ-শক্তির সমাধি চলেছে। এ অবস্থায় বৃহৎ শক্তিত্রয় ঐক্যবদ্ধ থাকবে কি করে ?

আর একটা যুদ্ধের ভয়ে কি তারা ঐক্যবদ্ধ হবেনা ? কেবলমাত্র বৃহৎ শক্তিত্রয়ের পক্ষেই বড়ো কোন যুদ্ধ চালান সম্ভব। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে যুদ্ধই অসম্ভব।

এই সাধারণ বুদ্ধিজাত মনোভাবের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রকৃতি একটা সংঘর্ষ বাধায়। সহযোগিতার বেলায়ও তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সকল সময়েই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জাতিগুলির প্রকৃতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোবৃত্তি দাবিয়ে রাখতে পারা না পারার উপরই শান্তি নির্ভর করে। প্রথম আণবিক যুদ্ধে এভাবেই বিনাশ এড়ানো সম্ভব। আত্মহত্যার তাড়না ও আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফলের দ্বারাই মানুষের ভাগ্য নির্ণিত হবে।

বিভিন্ন জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণ দমন কিভাবে সম্ভব ?

অনেকে বৃহৎ ত্রিশক্তি বা বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তির দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করার কথা বলবেন। তার উপর, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত প্রতিষ্ঠানও থাকবে, তাঁরা বলবেন।

এ ধরণের ব্যবস্থায় জাতিসমূহ কেবলমাত্র স্বেচ্ছামূলকভাবেই একমত হবে, ইচ্ছার অভাব ঘটলে মতানৈক্য ঘটবে, আর বাধবে সংঘর্ষ।

এ কোনো সন্তোষজনক সমাধান নয় ব'লে অনেকে মনে করেন, (আর তাঁদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে), যদি জাতিপুঞ্জ তাদের নিজ নিজ কর্তৃত্ব উচ্চতর কোন অন্তর্জাতিক গভর্ণমেণ্টের (এই গভর্ণমেণ্টই মতসাম্যে বাধ্য করবে) নিকট সমর্পণ করে, একমাত্র তাহলেই জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ দূর করা সম্ভব হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা ভাবেনা। তাদের যুদ্ধ করাই অসম্ভব। সম্মিলিত গভর্ণমেণ্টই তাদের থামাবে। যদি সারা-বিশ্বই একটা সম্মিলিত গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকত, তাহলে যুদ্ধই হতনা।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলি তাদের কর্তৃত্বের খানিকটা ওয়াশিংটন ডি সির হাতে ছেড়ে দেয়—তার যোগ্য প্রতিদানও তারা পায়। তারা নিজেদের জন্যে কতকগুলি আইন তৈরী করে, এবং যে সব আইন তাদের সহযোগিতায় বাইরে থেকে প্রণীত হয় তা-ও তারা মেনে নেয়। এই হল শান্তির পথ।

বিশ্বশাসনতন্ত্র লাভ করবই। একমাত্র প্রশ্ন এই যে স্বেচ্ছায় একটা যুদ্ধ না করেই আমরা লাভ করব, না প্রথমে একটা আণবিক যুদ্ধ চালিয়ে তা লাভ করব। এই আণবিক যুদ্ধের ফলে একটিমাত্র শক্তি শেষ পর্য্যন্ত জয়মাল্য লাভ করবে, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার পক্ষেই তা সম্ভব—তারপর সারা-বিশ্বে সে-শক্তি তার শাসন চাপিয়ে দেবে।

স্বেচ্ছায় বা যুদ্ধের ফলে, যে ভাবেই হোক, বিশ্বশাসনতন্ত্র গড়ে উঠবেই। মানুষের যে কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে।

প্রাচীনদের নগর-রাষ্ট্র ছিল। গোযান ও অশ্বের যুগে পল্লীই

ছিল শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক পর্য্যায়। বাষ্প ও বিদ্যুতের যুগে জাতিই গ্রহণযোগ্য মান হয়ে দাঁড়ায়। বিমান ও আণবিক যুগে সারা-বিশ্বই রাষ্ট্র-মান।

তবুও যুদ্ধকালে জাতীয়তাবাদ বজায় রাখবার জন্যে সেকেলে মণ্ডল, প্রভাব-অঞ্চল, সাম্রাজ্য ও মৈত্রীর বহু প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে মৈত্রীপ্রস্তাবের এক বিরাট হিমশিলা আমাদের উপর নেমে এলো। নিউ ইয়র্কের গভর্ণর টমাস ই ডিউই ও ক্লেয়ার বুথ ইঙ্গ-মার্কিণ মৈত্রীর জন্যে বিশেষ চাপ দেন। আমেরিকান কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা আর্ল-ব্রাউডার ইঙ্গ-মার্কিণ-রুশ মৈত্রীর পক্ষে বিশেষভাবে ওকালতি করেন। যুদ্ধজয়ের পর শান্তি বজায় রাখবার নিখুঁত যন্ত্র হিসাবে ওয়াল্টার লিপম্যান ও অন্যান্যেরা ইঙ্গ-রুশ-মার্কিণ-চাইনীজ মৈত্রীই নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন।

আমি এক প্রবন্ধে লিখেছিলাম, "এ ধরণের প্রস্তাব ক্ষতিকর, কারণ মৈত্রীচুক্তি দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর পক্ষে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হবে না।" কিন্তু অনেক বহুল প্রচারিত সা্মরিক পত্রের সমসাময়িক রেওয়াজ অনুসরণের দিকে ঝোঁক রয়েছে; তারা সময়ের আগে এগোতে চায়না। আজ, মৈত্রীচুক্তি শান্তি ভেঙে পড়ার লক্ষণ বলে গণ্য হয়। ১৯৪৩-৪৪ সলে মৈত্রীচুক্তির খুব রেওয়াজ ছিল। সুতরাং মৈত্রীচুক্তির নিন্দা ও আন্তর্জাতিকতার যৌক্তিকতা স্বভাবতঃই জনসাধারণেব কাছ থেকে তাঁদের গোপন রাখতে হয়েছিল। আমার প্রবন্ধটি শেষ পর্য্যন্ত ভার্জিনিয়া কোয়াটারলী রিভিউতে প্রকাশিত হয়।

ডাম্বারটন ওকাসের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবাবলী প্রকাশিত হল। ঐ প্রস্তাবগুলি পর্য্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে "জাতি" প্রবন্ধে আমি সেগুলির অকিঞ্চিৎকরতা

উদ্‌ঘাটিত করলাম। যে ব্যবস্থাবলে বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে কোন শক্তি নিজে আক্রমণকারী হলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধা দিতে পারে, আমি বিশেষভাবে সেই 'ভেটো' ব্যবস্থারই তীব্র নিন্দা করলাম। পরের দিকে, সানফ্রানসিস্‌কো সনদে প্রস্তাবিত বৃহৎ শক্তিগুলির 'ভেটো' ক্ষমতার প্রতিকূলতা প্রকাশ করে সংশোধনের কথাও বলেছিলাম। আমার এ মনোভাবের জন্যে নর্মান ক্যাজিনস্ স্যাটারডে রিভিউর এক সম্পাদকীয়তে আমার সমালোচনা করে আমাকে "শুদ্ধবাদী" বলে বিদ্রূপ করেন। তারপর, পৃথিবীর বুকে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটল এবং নর্মান ক্যাজিনস্ স্যাটারডে রিভিউতে সানফ্রানসিস্‌কো সনদের ত্রুটি উদ্‌ঘাটিত করে এক দীর্ঘবিবৃতি দিলেন। নতা দেখে আমি তাঁকে এভাবে এক চিঠি দিলাম :

প্রিয় নর্মান,

"শুদ্ধবাদীদের" মধ্যে স্বাগত জানাচ্ছি।

ভবদীয় লুই।

তিনি লিখলেন :

প্রিয় লুই,

দক্ষিণা কি ?

ভবদীয় নর্মান।

উত্তরে আমি লিখলাম :

প্রিয় নর্মান,

"শুদ্ধবাদীদের" প্রতি মাসে একটি "অর্ব্বাচীন" ভাব দক্ষিণা দিতে হবে।

ভবদীয় লুই

আমেরিকান সম্পাদকদের কাছে তিন বা ছয় মাস আগেকার চিন্তাও একেবারে বর্জনীয়। তাঁরা সময়ের সঙ্গে চলতে চান।

তার অর্থ এই যে তাঁরা সময়ের পেছনে পড়ে যান, আর তাঁদের পাঠকরা প্রায়ই এমন সব খবর পান যার জন্যে তারা আদৌ প্রস্তুত নন।

বিশেষ করে যুদ্ধকালে বিশ্ব-সমস্যা সম্বন্ধে একমাত্র বক্তৃতামঞ্চ ও পুস্তকেই সেনস্‌র-কবলমুক্ত সত্যকথা বলা সম্ভব। অন্যান্য স্থানে জনসাধারণকে যে খোরাক দেওয়া হত, তা জন ফষ্টার ডালসের ভাষায় শুদ্ধ "যুদ্ধকালীন সান্ত্বনাপ্রদ সরবৎ।"

১৯৪৪ সালে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় চার্লসটনে একটি ছোটখাট ভোজসভায় নিউ ইয়র্কের একজন সাংবাদিক সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উক্ত সাংবাদিক সবকিছু সম্বন্ধেই লিখতেন। আমি বললাম, "তার জানাশোনা খুব বেশী নয়। তিনি মঁস্তিষ্কের খোরাক জোটাননা, তাতে শুধু সুড়সুড়িই দেন।"

প্রশ্নকারী উত্তরে বললেন: "মিষ্টার ফিশার, দোহাই ওকথা বলবেননা। তাঁর লেখা আমার বেশ লাগে!"

যুদ্ধকালীন বহু লেখা ও সম্পাদনার উদ্দেশ্যই ছিল এই। জনসাধারণ জয়লাভের জন্যে বিরাট স্বার্থত্যাগ করে যাচ্ছিল, এবং পৃথিবীতে সবকিছু ঠিকই চলছে, এ ধরণের চিন্তা করে স্বাচ্ছন্দ ও সান্ত্বনা পেতে চাইত। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি আছে এমন কোন গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যাই তারা পছন্দ করতনা। "সান্ত্বনাপ্রদ সরবতে" অভ্যস্ত লক্ষলক্ষ আমেরিকান অধিকতর পুষ্টিকর ও উপকারী খাদ্য পরিপাকে এখনো অপারগ।

শান্তিকালীন সমস্যা সম্বন্ধে যুদ্ধকালীন আমেরিকান "সাহিত্য" ফিরে পাঠ করা একটা কষ্টদায়ক ব্যাপার। এর থেকে এশিক্ষাই আমরা লাভ করি যে একটা বিশেষ সময়ে জনসাধারণের জন্যে লিখিত বস্তুর সঙ্গে বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা ঘটনা-প্রবাহের কোন যোগাযোগই হয়ত থাকেনা। ১৯৪৩-৪৪ সালে চালু মৈত্রী চুক্তিগুলির সম্বন্ধেই আমার মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ইতিহাস ও দৈনিক পত্রিকার সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই আমি মৈত্রী-চুক্তি বর্জ্জনের পক্ষপাতী হয়েছিলাম। ভার্জিনিয়া কোয়ার্টারলীতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম, "অক্ষশক্তি-বিরোধী বৃহৎ চতুঃশক্তি বর্ত্তমানে এমন পথে চলেছেন যার ফলে তারা যুদ্ধোত্তর কালে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবেন। ভাবী শান্তিপর্ব্বের রূপ এমনি বিষাদময়। আশঙ্কা হয়, এর ফলে হয়তো পৃথিবীতে প্রায় ১৯৩৯এর অরাজকতাই চিরস্থায়ী হবে।

"তারপর, দেশমাত্রই চঞ্চলমতি। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে কাইজার-জার্ম্মানীর মিত্র ইটালী জার্ম্মানীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের পক্ষে চলে এলো। জাপানও আমাদের পক্ষেই ছিল। এযুদ্ধে ইটালী ও জাপান হল আমাদের শত্রু।

"১৯০৪-৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ ঘটে। ১৯১৪-থেকে ১৭ পর্য্যন্ত তারা পরস্পরের যুদ্ধকালীন মিত্র ছিল। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ পর্য্যন্ত তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে তারা চরম সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আজ আবার তারা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, যদিও উভয়ের যুদ্ধকালীন মিত্ররা পরস্পর যুদ্ধ-রত।...

"১৯১৪-১৮ সালের জার্ম্মান-যুদ্ধে গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্স বহু রণক্ষেত্রে সহোদরের মত একসঙ্গে রক্তদান করেছে। তবুও বৃটেন কয়েক বৎসরের মধ্যেই জার্ম্মানী অপেক্ষা ফ্রান্সেরই বেশী বিরোধী হয়ে উঠল।...

"মৈত্রী-চুক্তি শক্তির পাল্লায় ওজন করে দেখা গেছে ভারসাম্য বজায় থাকেনা। ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রত্যেক শক্তিসাম্যই পাল্টা শক্তিসাম্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আর শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়েছে সংঘর্ষ। ফ্রান্স ও বৃটেন লাভ করল জয়ের মালা, আর ভেঙ্গে পড়ল জার্ম্মানী। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, এবং চূড়ান্ত অস্ত্রহিসেবে বিমানপোতের উদ্ভব ঘটায় নাৎসী

জার্ম্মানী তার সুযোগ দেখতে পেল। ঠিক তেম্নি নূতন কোন যান্ত্রিক কৌশল বা রাসায়নিক দ্রব্য আবার যুদ্ধক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে। তারপর ভয়, আশা বা ঈর্ষা একটা আপাতদুর্ভেদ্য মৈত্রীর মধ্যেও ভাঙ্গন ধরাতে পারে, আর সেই মৈত্রী যখন একেবারে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখন একটা জাতি বা জাতিপুঞ্জ যুদ্ধের পথে এগুতে উৎসাহিত হয়।"

আমি লিখেছিলাম, "বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখবার জন্যে কোন মৈত্রীচুক্তির প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন হল যুদ্ধেব মূল কারণই দূর করা।"

বৃহৎ ত্রিশক্তির মধ্যে যুদ্ধোত্তর সংঘাতের দুর্লক্ষণ পঠনক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখতে পেয়েছেন। সংগ্রামের কোলাহল ও কাল্পনিক "চিন্তার" গুঞ্জনধ্বনিতে ভাবী দুর্য্যোগের গুরু-গুরু ধ্বনি ডুবে গেল।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল স্মাটস্ ১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর লণ্ডনে কমন্সসভায় এক বিবৃতিতে মুখ খুললেন—এই বিবৃতি তিনি নিজেই "বিস্ফোরক" বলে অভিহিত করেন। তাঁর মন্তব্য সরকারী খাতা-পত্রে স্থান পায়নি। কিন্তু এই বিবৃতি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তার বহু আলোচনা ও বিকৃতি হতে থাকে এবং তা দেখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গোটা বক্তৃতাটাই প্রকাশিত করেন।

স্মাটস্ ঘোষণা করলেন যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবী ত্রিশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন হয়ে পড়বে। অবশ্য সেই ত্রিশক্তির মধ্যে গ্রেটবৃটেন হবে "নিঃস্ব" এবং "ইউরোপে সে হবে পঙ্গু।" অপর পক্ষে রাশিয়া হবে ইউরোপের ভীমকায় মূর্ত্তি আর আমেরিকার রয়েছে সীমাহীন সম্পদ, সঙ্গতি ও শক্তির সম্ভাবনা। এই অসাম্য স্মাটসকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, "আমি চাই ক্ষমতাসাম্যের ভিত্তিতেই ত্রিশক্তির মৈত্রী হোক। আমি ত্রিশক্তির প্রত্যেককে সর্ব্বভাবের শক্তি

ও প্রভাবে সমান দেখতে চাই। আমি অসমানের বন্ধুত্ব দেখতে চাইনে।"

স্মাটসের ত্রিশক্তি-সাম্যের ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার ইচ্ছারই নামান্তর। কিন্তু ত্রিশক্তির অন্য দুটি শক্তির সঙ্গে দুর্ব্বলতর ও অসম আর একটি শক্তির সাম্যলাভ কি ভাবে সম্ভব? স্পষ্টতঃই দেখা যায়, এটা দু'ভাবে সম্ভব—হয় ত্রিশক্তির অন্য দুটী শক্তিকে ব্যাহত করে—যা করা কঠিন নয়—হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও উপনিবেশের স্বার্থহানি করে। স্মাটস্ ঠিক এরই পক্ষে ওকালতি করলেন। লণ্ডনে বক্তৃতাকালে স্মাটস্ দুটো পন্থার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন: প্রথমতঃ 'গ্রেটবৃটেনকে তাব সাম্রাজ্য আরো ঘনিষ্ঠ বাঁধনে বাঁধতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে ইংলণ্ডকে এক "মহান ইউরোপীয় রাষ্ট্র" গড়ে তুল্‌তে হবে।

হাতী আর কাঠবিড়ালীব মধ্যে শান্তি স্থাপিত হতে পারেনা অথবা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শক্তিবৃন্দ একসঙ্গে বসে সন্ধির খসড়া তৈরী করতে পারেননা বলে যে সব সরলমতি তর্ক তোলেন, স্মাটস্ এখানে তাঁদের জবাব দিয়েছেন। ব্যাপাবটা হাতীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। মুস্কিল হচ্ছে এই যে হাতীদেব মধ্যেও ছোট বড়ো আছে। স্মাটস্ দেখালেন যে একটি হাতীর (ইংলণ্ডের) আশঙ্কা হল তাকে বুঝি কাঠবিড়ালীর পর্য্যায়ে ফেলা হবে। এজন্যে কি কবে সে অপর দুটী হাতীর মতই বলশালী হতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইল। হাতীতে হাতীতে মিল হাতীতে কাঠবিড়ালীতে মিলেব মতই অসম্ভব। এটা খাঁটি সত্য যে কাঠবিড়ালীদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে হাতীরা কাঠবিড়ালীদের উপর আধিপত্য করতে চাইলে হাতী ও কাঠবিড়ালীদের মধ্যে মৈত্রী গড়ে ওঠেনা, আর তাতে হাতীদের মধ্যেও মিল থাকেনা।

বৈদেশিক সচিব এন্টনী ইডেন ১৯৪৪-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর কমন্সসভায় বৃটেনের প্রভাবাধীন অঞ্চল সম্পর্কে নীতি খোলাখুলি ভাবে

ঘোষণা করেন। তিনি বল্‌লেন, "আমরা যদি কমনওয়েলেথ্‌ ও আমাদের পশ্চিম ইউরোপের নিকট-প্রতিবেশীদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াই, তাহলে অন্যান্য বৃহৎশক্তির সামনে আমরা অধিকতর মর্য্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পারি। আমার মতে ঐটেই ঠিক পথ এবং ও ধরণের কাঠামো তৈরী করতেই আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন ঐ ব্যাপারেই ব্যস্ত।" ইডেনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। "এতে অন্যান্য বৃহৎশক্তির সামনে আমরা অধিকতর মর্য্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পারব,"—একথা ত্রিশক্তির ভিতরকার প্রতিদ্বন্দ্বিতারই স্বীকৃতি।

মৌখিক ঐক্যের দরজার আড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জেঁকে উঠছিল। কিন্তু দরজার ভেতরে প্রবেশ করে দেখার যে কোন চেষ্টাকেই "লাল আক্রমণ", "টোরী আক্রমণ" বা সোজাসুজি "নৈরাশ্যবাদ" বলে দোষারোপ করা হত। এটা "নৈরাশ্যবাদ" ঠিকই, কিন্তু এটা সত্য। এটা ছিল সৃষ্টিমূলক নৈরাশ্যবাদ। সমস্যাকে অগ্রাহ্য করলেই তার সমাধান হয় না। বাস্তব ব্যাপারের অবদমন বা বিকৃতিকরণ সাধারণ সর্ব্বাত্মক নীতিরই অঙ্গ। গণতন্ত্রবাদীরা তা করলে নিজেদের বিপদই ডেকে আনবে।

মার্শাল স্মাটসের ল বক্তৃতার সবটুকুই নিউইয়র্কের ব্রিটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে আমার হাতে আসে। তারপর থেকে প্রতি বক্তৃতাতেই মার্শাল স্মাটসের ভাষণের পূর্ণ উল্লেখ আমি করেছি আর দেখিয়েছি সোভিয়েট প্রভাবাধীনে দ্রুত উদ্ভূত হচ্ছে একটি পূর্ব্বাঞ্চল—আর দেখিয়েছি ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে এক পশ্চিমী শক্তির পরিকল্পনাও তৈরী হচ্ছে।

আমি মৈত্রীচুক্তি বা প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টি উভয়েরই বিরোধী, কারণ তা নীতিসঙ্গতও নয়, বাস্তবও নয়। এতে দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা হারায়, যুদ্ধও থামেনা, এসব কার্য্যকলাপ স্বস্তিলাভের নিষ্ফল, উন্মাদ প্রচেষ্টারই অংশ। কিন্তু জাতীয়

স্বস্তি বলে কিছুই নেই। একটিমাত্র পথেই স্বস্তিলাভ সম্ভব: হয় সকলের নিরাপত্তা না হয় কারুরই নয়। হিরোশিমা দিবসের (৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫) আগেই এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল—এখন এটা স্বীকার না করে উপায় নেই।

স্বস্তির জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যেমন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অকিনাওয়া, বা জাপানের প্রয়োজন নেই, ইংলণ্ডের যেমন ভারত বা সিঙ্গাপুরের প্রয়োজন নেই, তেমনি রাশিয়ারও পোলাণ্ড, বল্কান বা পোর্ট আর্থারের প্রয়োজন নেই।

সমরলিপ্সু জাপানের যদি কোনদিন পুনরভ্যুত্থান ঘটে, তাহলে অবস্থা বিশেষে কোন কোন ধরণের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে আমেরিকার অকিনাওয়া প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এখন থেকে দশ বৎসর পর আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, স্পেন, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং যে কোন জায়গা থেকে আমেরিকার উপর আণবিক হামলা সম্ভব। এধরণের আক্রমণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার উপায় কি? যে সকল জাতির পক্ষে আমেরিকার ভূখণ্ড আক্রমণ সম্ভব, তাদের প্রত্যেকটির নিকটবর্ত্তী ঘাঁটিগুলি আমেরিকা হয়তো দখল বা ইজারাবলে হাত করবে। এতে করে যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ভূখণ্ডের মালিক হয়ে দাঁড়াবে, আর সর্ব্বত্রই তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বৈরীভাব জেগে উঠবে। এতে অবশ্যই আমেরিকার স্বস্তি বাড়বেনা। কারণ বিমান ও আণবিক যুগে জগতের যে কোন স্থান থেকে হঠাৎ হামলা ঘটা সম্ভব। নূতন আণবিক যুগে স্বস্তিলাভের জন্যে আমেরিকাকে প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জই নয় জগতের সকল জাতিকেই তার কর্তৃত্বাধীন রাখতে হবে। এ হল আপন স্বস্তির জন্যে আমেরিকার বিশ্ব-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠারই নামান্তর। তার চেয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ব-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই অধিকতর কাম্য।

আক্রমণকারী দেশ বা আক্রমণ করেনি এমন দেশ জয় করতে

সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও ঘাঁটির প্রয়োজন আছে। কিন্তু সংগ্রামের একটি বাহু যত শক্তিশালীই হোক না কেন, রেডিও-চালিত যান্ত্রিক-বিমানেব থেকে আণবিক-আক্রমণ প্রতিহত করা তাব পক্ষে অসম্ভব।

আণবিক বোমা তৈবীব সবকারী ইতিহাস লেখক প্রিন্সটনেব পদার্থবিদ্যা বিভাগেব চেযাবম্যান অধ্যাপক হেনবী ডিউলাব স্মিথ ১৯৪১ সালেব মার্চমাসে বলেন: "বৈজ্ঞানিকবা এখন অনুমান কবেন যে, নিউইয়র্ক শহবে একটিমাত্র আণবিক বোমা ফেল্‌লেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিন থেকে দশ লক্ষ লোক নিহত হবে।"

অধ্যাপক জে রবার্ট ওপেনহেমারেব পবিচালনায় নিউ মেক্সিকোব লস্ আলামসে প্রথম আণবিক বোমা পবীক্ষামূলকভাবে দেখানো হয়েছিল। তিনি এক সেনেট কমিটিকে বলেন যে, আণবিক বোমার প্রথম হামলায়ই চারকোটি আমেবিকান প্রাণ হারাতে পারে।

লস আলামসে ব্যবহৃত প্রথমটি ও জাপানে নিক্ষিপ্ত দুটি আণবিক বোমাই ব্রিগেডিয়াব জেনাবেল টমাস, এস, ফ্যাবেল সংগ্রহ করেছিলেন। স্বভাবতঃই তিনি জানেন ঐ অপরিণত ক্ষুদ্র বোমাগুলিও কি ভীষণ মারাত্মক ছিল। ১৯৪৫ এব ১৯শে অক্টোবর তিনি বলেন, "আণবিক বোমাব বিকাশ অব্যাহতভাবে ঘটতে দিলে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে সমগ্র মানবজাতিই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে।

এদিকে নির্ব্বোধরা স্বস্তিলাভেব কথা বলে।

দ্রুতগামী বোমা ও বিমানপোত যখন গতিতে দূবত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছে তখন কোন দেশই আব নিরাপদ নয়। এ অবস্থায় রাশিয়ার স্বস্তি কোথায়? আমেরিকারও স্বস্তি কই?

কতকগুলি জাতি সমগ্র জগতকে নয়, কেবলমাত্র নিজেদেরই যুদ্ধের কবলমুক্ত রাখতে চেয়েছিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তারই পরিণতি।

১৯৪১ সালের পূর্ব্বে প্রত্যেক তোষণকারী জাতিরই লক্ষ্য ছিল যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে যতদিন সম্ভব নিজ শান্তি ও স্বস্তি বজায় রাখা। এই মনোভাবের ফলেই যুদ্ধের পথ সুগম হয়। হিটলার, হিরোহিতো ও মুসোলিনি এ-বিশ্বাসেই উৎসাহিত ছিলেন যে তাঁরা তাঁদের কবলিতদের একে একে শেষ করতে পারবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রায় সফলও হয়েছিল। ব্যবস্থা অবলম্বন করেও কোন জাতি বিমান থেকে আণবিক আক্রমণের মুখে নিজেকে নিরাপদ অনুভব করতে পারে না। আক্রমণের পর প্রতি আক্রমণের ক্ষমতাই সে বাড়াতে পারে। সামরিক বলে বলী জাতিগুলি শুধুমাত্র একটা সুবিধাই ভোগ করতে পারে: ধ্বংস হতে হতে তারা অন্যকেও ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু আণবিক যুদ্ধে কারুর পক্ষেই জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। সানফ্রানসিসকো-ভূমিকম্পে জয়ী হয়েছিল কে ?

আণবিক বোমা মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও এতে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমা দূরে থাক, বেড়েই চলে। আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের অস্তিত্ব আক্রমণকারিদের যারপরনাই উৎসাহিত করবে। হিটলার ভেবেছিলেন তিনি তাঁর পান্‌ৎসার ও বিমানবাহিনীর দ্রুত আঘাতে যুদ্ধে জয়ী হবেন। সেইরূপ, নূতন কোন আক্রমণকারী আক্রমণের লক্ষ্য দেশটির চেয়ে দুর্ব্বলতর হয়েও বহুপরিমাণ আণবিক প্রক্ষেপণ জমিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে মারাত্মক আঘাত হেনে সাফল্যলাভের পরিকল্পনা করবে। যদি কোনদিন আণবিক-যুদ্ধ বাধে, তাহলে তা এক অতি-পার্লহারভার দিয়েই সুরু হবে, তাতে শুধু অর্দ্ধেক নৌবাহিনী ডুবিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাই থাকবেনা, একটা জাতির অর্দ্ধেক লোক হত্যার পরিকল্পনাও থাকবে। আণবিক আক্রমণকারী প্রথম আঘাতেই তার আক্রমণের লক্ষীভূত রাষ্ট্রকে এমনভাবে পঙ্গু করতে চাইবে, যাতে তার পক্ষে প্রতি-আক্রমণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ ধরণের

সংঘর্ষে প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে সুবিধা হবে প্রচুর, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মারাত্মক বোমা তৈরী হলে উদ্যোগকারীর সাফল্য চূড়ান্তই হবে।

১৯৪৫ সালের ৬ই নভেম্বর চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন আণবিক গবেষণাকারী পদার্থবিদ বলেন যে, যে সকল আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের সহরগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সেগুলি "আগামী দশ বা বিশ বৎসরের তৈরী বোমার তুলনায় পট্‌কাবাজি মাত্র।" যে কারণেই হোক মানুষের সীমাবদ্ধ কল্পনা বাঁচবার আশায় আরও সীমাবদ্ধ। এজন্যে আমরা সম্ভবত আণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বড়ো করে দেখছিনা, ছোট করেই দেখছি। আণবিক বোমা মারাত্মক ভয়াবহতার যুগ সৃষ্টি করেছে। সার্ব্বজনীন সঙ্কট বা সার্ব্বজনীন স্বস্তি—আজ মানুষকে এ-দুটোর একটা বেছে নিতে হবে।

সুতরাং এ অবস্থায় ১৯৫৬ বা ৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার আর থাকবে কি? পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপে মস্কোরচিত বেষ্টনী দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়নেব ওপব ব্রিটিশ ও আমেরিকান যান্ত্রিক-বিমানের হামলা ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। ইউরোপ ও এশিয়ায় রুশ-আধিপত্য বিস্তার অন্যান্য জাতিগুলিকে শঙ্কিতই করে তুল্‌বে এবং তাতে রাশিয়ার সঙ্কটই বৃদ্ধি পাবে। তেম্নি বৃটেন বা আমেরিকার আধিপত্য বিস্তাবে রাশিয়া উত্যক্ত হবে, আর এতে সাধারণ তিক্ততা বেড়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে স্বস্তিকামী হলে বৃহৎশক্তিগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ও দুর্ব্বল উপনিবেশগুলির সীমানা থেকে সরে দাঁড়ানই মঙ্গলকর। রাশিয়া, ইংলণ্ড বা রাশিয়া, আমেরিকার সম্পর্ক তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা যতটা না নির্ণিত হয় তার চাইতে বেশী নির্ণিত হয় জগতের দুর্ব্বল জাতিগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দ্বারা।

হিটলার ১৯৩৯ সালে গ্রেটবৃটেন আক্রমণ করেন নি। তিনি পোলাণ্ড আক্রমণ করেন। এর থেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু। প্রধান প্রধান অনাক্রমণকারী জাতিরা নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারিদের বাধা না দিয়ে প্রকারান্তরে তাদের কতকগুলি কাজেরই সুবিধা করে দেয়। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে বৃটেন বলে উঠল: এপর্য্যন্ত, আর নয়। এ সীমানা ছাড়িয়ে গেলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য। এই সীমানা অতিক্রম করে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করেন, ফলে জার্ম্মাণী বিধ্বস্ত হল।

বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের আধিপত্য বিস্তার করে যায়—তাদের একটি শক্তি ক্রমশঃ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে সে-জায়গা অপর এক শক্তির মতে তার আত্মরক্ষার ঘাঁটি। শান্তির পথে সবচেয়ে বড়ো বাধাই এই।

১৯৪৫-এর শেষে অর্দ্ধেক ইউরোপ, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর ইরাণে রাশিয়ার আধিপত্য ছিল। তা সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী সর্ব্বোচ্য পলিটব্যুরোর সদস্য লাজার কাগানোভিচ ঘোষণা করেন: "আমাদের দেশ এখনো পুঁজিবাদী শক্তিগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং নিরাপদ-বোধের কোন কারণই নেই। আমরা কোনমতেই ঢিল দেব না।" এধরণের চিন্তাধারা থেকেই রাশিয়া তুরস্কের অংশ দাবী করে বসল এবং তেহরাণে ইরাণ-গভর্ণমেন্টের উপরও কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করল। কতকগুলি নূতন ভূখণ্ড অধিকার করে সেই ভূখণ্ডগুলির নিরাপত্তার জন্যে বলশেভিকদের আরো নূতন ভূখণ্ডের প্রয়োজন হবে। কোথায় এর শেষ? আর এটাও কি অবশ্যম্ভাবী নয় যে এধরণের আত্মবিস্তৃতি অন্যান্য জাতিকেও পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করবে?

আণবিক যুগে জাতীয় নিরপত্তার প্রচেষ্টা সঙ্কটের পথেই এগিয়ে দেয়।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যতই দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করে ততই তারা (বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি) পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে তাদের কার্য্যক্ষেত্রগুলি একেবারে লাগালাগি হয়ে পড়ে আর তাদের মধ্যবর্ত্তী কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব থাকেনা। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তারা নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টির প্রেরণা পায়। যখন তারা পূর্ণ আয়ত্তাধীন অঞ্চলের সংকীর্ণ সীমারেখায় এসে পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়াবে, তখন কেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর থাকবেনা—কোন যুক্তি বলে এমন সম্ভাবনা স্বীকার করে নেওয়া যায়? কোনো যুক্তিবলেই নয়।

উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোর প্রতি বৃহৎ ত্রিশক্তির সশ্রদ্ধ মনোভাবই এই আণবিক যুগে শান্তিরক্ষার চাবিকাঠি। তা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যে আজ লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা চলেছে তা-ও থেমে যাবে। তারপর আইন বলে আণবিক বোমা বর্জ্জন করে আমরা বিশ্ব-শাসনতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। অপর জাতির প্রভুত্ব দমনের জন্যেই জাতীয় প্রভুত্বের প্রয়োজন। কিন্তু কোন জাতির প্রভুত্বে হস্তক্ষেপ না ঘটলেই তখন আর জাতীয় প্রভুত্বেরও প্রয়োজন ঘটবেনা। জাতীয় প্রভুত্বের অবসানের অর্থই আন্তর্জাতিক শাসনতন্ত্রের উদ্ভব।

নিউইয়র্ক-রাষ্ট্র কানেক্টিকাটের প্রভুত্বে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। এজন্যেই তাদের একই যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য হতে আপত্তি থাকেনা। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অবশ্য যে কোন রাষ্ট্রের প্রভুত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারে, এবং বহুবৎসর ব্যাপী এ সব ব্যাপারের সামঞ্জস্য বিধানও চলে। কিন্তু সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা বলবৎ আছে বলেই কোন রাষ্ট্র এখন আর যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের চেষ্টা করেনা।

প্রভুত্বই স্বস্তিহীনতা তৈরী করে।

১৯৪৫-এর ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রসচিব বার্ণস নিউইয়র্ক হেরাল্ডে লিখেছেন: "বাধা দেওয়া দূরে থাক, উদাহরণ স্বরূপ, সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও মৈত্রীস্থাপনের প্রচেষ্টাকে আমরা সহানুভূতিই দেখিয়েছি। ঐসব দেশের সম্বন্ধে যে সোভিয়েটের স্বস্তি-সম্পর্কিত স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত আছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন।" সেক্রেটারী বার্ণস্ এভাবে অর্দ্ধেক ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চলের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু এর কোন সার্থকতাই নেই। কার ভয়ে রাশিয়া স্বস্তির সন্ধানী? আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ভয়ে। এসব কথা স্মরণ রেখেই আমেরিকার রাষ্ট্র-সচিব আমেরিকার ভয়ে রাশিয়ার স্বস্তিসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এসব কথার মধ্যে তিনি আসল কোন্ কথাটি স্বীকার করে নিচ্ছেন:—আমেরিকা থেকে রাশিয়ার ভয়ের কারণ, না বৃটেন থেকে? আমেরিকার সাহায্য ছাড়া বৃটেন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামবেনা। তবে কি জার্ম্মানীর ভয়? জার্ম্মানী থেকে রাশিয়ার এখন আশঙ্কার কোন কারণই নেই—ইংলণ্ড ও আমেরিকা রাশিয়ার স্বস্তিকামী হলে সে আশঙ্কা কোনদিন থাকবেও না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার জন্যে জার্ম্মানীকে পুনরুজ্জীবিত করা একমাত্র আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সাহায্যেই সম্ভব এবং মিষ্টার বার্ণস্ যদি প্রকৃতই রাশিয়ার স্বস্তিকামী হন, তাহলে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না।

কাজেকাজেই মিষ্টার বার্ণসের কথায় কোন প্রত্যয়ই জন্মেনা। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব ইউরোপে গণতন্ত্র বজায় রাখবার জন্যে তিনি এমন সব কথা বলেছিলেন যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের রুশপ্রভাবাধীন অঞ্চলে রুশ-কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করার সুপরিচিত ইচ্ছাটাই প্রতিফলিত হয়। কূটনীতিবিদদের কথাবার্ত্তার অর্থ বাহ্যত যেরূপ মনে হয়, প্রকৃত

পক্ষে প্রায়ই তার বিপরীত থাকে। কূটনীতিবিদগণ তাঁদের কাঁধের উভয়দিকেই জল বয়ে নেন এবং প্রায়ই শূন্য দুটি জলাধার নিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছান।

কোন পূর্ব্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রে যখন শাসনযন্ত্র রাশিয়ার প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন হবে সে রাষ্ট্র তখন স্বাধীন থাকবে কি করে? ধরা যাক, সে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ এমন একটা শাসনযন্ত্র গঠন করলেন যা মস্কোর মতে শত্রুভাবাপন্ন। এ অবস্থায় অনুমান করা যায়, মস্কো এই নির্ব্বাচন নাকচ করে দেবে। শাসনান্তর প্রতিষ্ঠার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে। ধরা যাক, সে দেশের পররাষ্ট্র সচিব রাশিয়ার মতে শত্রুভাবাপন্ন। আমার মনে হয় তাঁকে পদত্যাগ করতেই হবে। ধরা যাক, সে দেশ এমন একটা শুল্ক বসালে বা আইন করলে যা ক্রেমলিনের মতে বিদ্বেষপ্রসূত। এর প্রত্যাহার করতেই হবে। এ অবস্থায় ঐ দেশের স্বাধীনতার অর্থ আর কি? তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই বা কি করে বলা যাবে? রাশিয়া এ রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাকে খুসীমত চালাবে। বাধ্যতামূলক বন্ধুত্ব অধীনতারই নামান্তর। জোর করে বন্ধুত্ব গছিয়ে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদকে ছদ্মবেশ পরানোর এক অতি উদ্ভট আধুনিক আবিষ্কার। যাঁরা এই নীতির পক্ষে, তাঁরা জবরদস্ত গুণ্ডার জোর যার মুলুক তার নীতিরই সমর্থক।

পরিবেষ্টনী প্রভাবাধীন অঞ্চল ও সাম্রাজ্য প্রাগাণবিক যুগের ব্যাপার, স্বস্তির ধারণাও প্রাগাণবিক যুগের। মানবজাতি অবশ্য দুর্লভ স্বস্তির পেছনে ছুটে বহু লক্ষ কোটী ডলার ঢালবে। হয়তো বহু লক্ষ জীবনও বলি দেবে। সমস্ত জাতিগুলিই যদি একটিমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হ'ত, তাহলে বহু অর্থও বেঁচে যেত। এত প্রাণহানিও হতনা।

এতে কি কি সমস্যার উদ্ভব হয়, তা আমি জানি, কিন্তু

এর বিকল্পই হচ্ছে প্রথম আণবিক যুদ্ধ—আর এ যুদ্ধে পঞ্চাশ কোটী মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে।

বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের মূল সমস্যাই হচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বের বাকী অংশের সম্পর্ক স্থাপনে।

রাশিয়ার উদ্দেশ্য কি

বৈদেশিক নীতি একটি দেশের আভ্যন্তরীণ নীতি ও অবস্থার দর্পণ। কিন্তু অধিকাংশের কাছেই সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে বুদ্ধির দিক থেকে এক অগম্য স্থান—চার্চ্চিলের ভাষায় (১৯৩৯) "প্রহেলিকায় ঘেরা রহস্যাবৃত একটা হেঁয়ালী।" এজন্যে সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণের বেলায় সমালোচকরা যে সকল সংবাদ রাখেন না বা যার সম্মুখীন হতে চান না, কথায় ও লেখায় তাঁরা তার বদলে যুক্তি বসাতে চান। তাঁরা বলেন, "রাশিয়া একটা বিরাট দেশ, স্বভাবতঃই তার নূতন কোন ভূখণ্ডের প্রয়োজন নেই।" তারা ভুলে যান যে রাশিয়া নিজে যথেষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়েও ১৯৩৯-৪০ সালে বল্টিক, ফিনিশ, পোলিশ ও বল্কান অঞ্চল, '৪৫ সালে চেকোশ্লোভাক, জার্ম্মান ও জাপ অঞ্চল অধিকার করে এবং '৪৫ সালেই তুরস্কের অংশ ও ভূমধ্য-সাগরীয় ঘাঁটিগুলি দাবী করে। তাঁরা বলেন, রাশিয়া এখন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে, বিদেশে সম্প্রসারণের দিকে এখন তার মন নেই। তাঁরা ভুলে যান যে বৈদেশিক অঞ্চল থেকে রাশিয়ার পুনর্গঠনের উপযোগী সস্তা মাল ও যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতে পারে।'

সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির এক নম্বর উদ্দেশ্য হল—রুশ জাতীয়তাবাদ, ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদ ও শ্লাভবাদ। সোভিয়েট ছিল আন্তর্জাতিকতার দেশ। বলশেভিকবাদ শিক্ষা দিত যে মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থাই আসল কথা — তার মাথার আকার, ত্বকের রং, জন্মস্থান বস্তুতঃ জন্মের পূর্ব্বের কোন কিছুই বিবেচ্য নয়। সোভিয়েট মতবাদ বিশেষ করে এমতের ওপরই

জোর দিত যে, ইউক্রেনীয় শ্রমিক ইউক্রেনীয় পুঁজিপতি অপেক্ষা ইটালীর শ্রমিক বা চীনের শ্রমিকের অধিকতর ঘনিষ্ঠ। এরূপ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল একজন ইউক্রেনীয় শ্রমিককে জাতীয়তাবাদী তৈরী না করে আন্তর্জাতিকতাবাদী তৈরী করা। ফ্যাসিস্ট ঘেঁসা আমেরিকানের থেকে ফ্যাসী-বিরোধী স্পানিস বা ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকের সঙ্গে আমার অনেক বেশী মিল।

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ নীতি যখন অন্তর্জাতিকতাবাদী ছিল, তখন তার বৈদেশিক নীতিও ছিল তাই। আর লিটভিনভও সম্মিলিত নিরাপত্তার কথাই বলতেন।

১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত সোভিয়েট আদর্শে কোন নরগোষ্ঠী বা জাতির শ্রেষ্ঠত্বের স্থান ছিলনা। তারপর দেখা দিল নূতন ভাব—রুশ জাতীয়তাবাদ। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত আমার 'মানুষ ও রাজনীতি' পুস্তকে এর ক্রমবিকাশ আমি অঙ্কিত করেছিলাম। সেই থেকে সোভিয়েট সরকার তার চরিত্রগত দোদুল্যমান নীতি ও কার্য্যক্ষমতা বলে শুধু রুশ-জাতীয়তাবাদেরই বিকাশ ঘটায় নি ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদ ও শ্লাভবাদেরও বিকাশ ঘটিয়েছে। রক্তের সম্পর্কের ওপর এই জোর দেওয়া সাম্যবাদ, সমাজবাদ, বলশেভিকবাদ ও সেভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব্ব-আচরিত দিকের লেনিনীয় নীতির বিরোধী। এ হচ্ছে এক প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ। ১৯৪৫ সালের ২৪ শে মে ক্রেমলিনের এক নৈশ ভোজ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ষ্টালিন বললেন, "আমি প্রথমেই রুশ জনসাধারণের স্বাস্থ্যপান করছি, কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে রুশজাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি রাশিয়ার স্বাস্থ্যপান করছি কারণ এযুদ্ধে আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যে রুশজাতিই সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় শক্তি বলে স্বীকৃত হয়েছে।" সেসময়ের নিউইয়র্ক টাইমসের মস্কোস্থিত সংবাদদাতা মিঃ ডব্লিউ এইচ লরেন্স

কিছুদিন হয় টাইমসে লিখেছেন যে 'এই বিবৃতি ইহুদীদের বিব্রত করেছিল।'

দশ কি আট বৎসর পূর্ব্বেও ষ্টালিনের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব ছিলনা। সেসময় সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন একটি জাতিকে নেতৃস্থানীয় শক্তিরূপে তুলে ধরা মারত্মকরকম বলশেভিক-বিরোধী কাজ বলে গণ্য হত। সকল জাতিই ছিল সমান, কেউ নেতা বা কেউ অনুগামী নয়। একজন নেতা হলে অন্যান্যদের অধীনস্থ হতেই হয়।

সুবিধাবোধে "রাশিয়া" কথাটার ব্যবহার হয়। রাশিয়া বলতে শুধু "রাশিয়া"ই বুঝায় না, গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নকেই বুঝায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে রুশ অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন মাত্র। অন্যান্য অধিবাসীরা হচ্ছে কালমাক, বুরিয়াট, তুর্কোমান, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান, তাতার, ওসেটিয়ান ও অন্যান্য বহু জাতি। বাস্তবিকপক্ষে জাতিগুলির সংখ্যা একশো কুড়িটিরও বেশী। জাতিগত মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেনা বলে বলশেভিকরা গর্ব্ববোধ করত। তারা বলত, কোন নরগোষ্ঠীরই মূলগতভাবে কোন বিশেষ কৌলিন্য নেই। কোন জাতিরই বিশেষ মর্য্যাদা বলে কিছু থাকতে পারেনা।

সোভিয়েট ইউনিয়নে রুশ-জাতি এখন নেতৃত্বের মর্য্যাদার অধিকারী।

১৯৪৫ সালের ৬ই নভেম্বর বৈদেশিক সচিব মলটভ বলেন, "সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে হিটলারপন্থী জার্ম্মানী কেবলমাত্র আমাদের দেশই দখল করতে চায়নি, রুশ জনসাধারণ ও সমগ্র শ্লাভজাতিকে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল।" একই অবস্থায় দশ বৎসর পূর্ব্বে হলে মলটভ বলতেন যে বিদেশী শত্রু বলশেভিক বিপ্লব ও সমাজবাদকেই ধ্বংস করতে

চায়। ১৯৪৫ সালে তিনি বললেন, হিটলার শ্লাভ ও রুশজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত।

বলশেভিক-বিপ্লবের প্রধান রূপান্তরই এই। এই রূপান্তর সোভিয়েট শাসনের সম্পূর্ণ প্রকৃতিই বদলে দিয়েছে। রুশ জাতীয়তাবাদ থেকে শ্লাভ জাতীয়তাবাদ এবং শ্লাভ জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র।

আন্তর্জাতিকতাবাদের উপাসক হিসাবে বলশেভিকদের সঙ্গে নাৎসীদের আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল। নাৎসীরা শ্রেণীব ওপর গোষ্ঠীর প্রাধান্য দিত। প্রকৃতপক্ষে তারা জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা সৃষ্টি করবার জন্যেই গোষ্ঠী-মনোবৃত্তির পরিপুষ্টি ঘটাতে চেষ্টা করত।

তারপর জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা হিটলারের আক্রমণ-যন্ত্রের ইন্ধন যোগাল। ভার্সাইএব সন্ধি অনুসারে জার্ম্মান-অধিকৃত অঞ্চলেব বিলোপ ঘটেছিল। হিটলার অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দাবী কবলেন। ঐ অঞ্চলগুলি জার্ম্মান দেশেব অন্তর্গত ছিলনা কিন্তু তাঁর দাবী ছিল এই যে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ জার্ম্মান। তার থেকে, জার্ম্মান অধ্যুষিত নয় এমন অঞ্চলও তিনি অধিকার করতে সুরু করেন।

বেগবান্ জাতীয়তাবাদের খাদ্যের প্রয়োজন—আর সে খাদ্য হচ্ছে ভূখণ্ড।

শ্লাভ, রুশ ও ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদের পুষ্টি ঘটাতে ষ্টালিন কেন অনুপ্রাণিত হলেন? সোভিয়েট শাসন বরাবরই রুশ ও ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীদের (তার মধ্যে কিছু কমিউনিষ্টও ছিল) ধ্বংস করতে কয়েকবার রক্তগঙ্গা বহানোর প্রয়োজনও ঘটেছিল। বিশ ও ত্রিশ দশকে সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করত। দুই কোটী আশি লক্ষ ইউক্রেনীয় সোভিয়েট নাগরিকদের মধ্যে

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের কি ভীষণ প্রাবল্য ছিল, এ ঘটনায় তারই সাক্ষ্য মেলে। ১৯৩২-৩৩ সালের ইউক্রেনের দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক দুর্গতির জন্যে মস্কোর অধিবাসীদেরই দায়ী করা হ'ল। এতে করে তাদের ওধরণের মনোভাব অধিকতর পুষ্ট হয়। ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করতে অসমর্থ হয়ে ষ্টালিন সেই জাতীয়তাবাদের সহায়তাই করতে লাগলেন। তিনি বললেন, ইউক্রেনীয় জাতিকে তিনি এক স্বর্ণযুগে নিয়ে যাবেন। ইউক্রেনবাসিদের তারপর আর পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ায় থাক্‌তে হবেনা—তিনি তাঁদের সবাইকেই সোভিয়েটের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করবেন। চেকোস্লোভাকিয়াব কার্পেথো-রুশ বা কার্পেথো-ইউক্রেনীয় 'অধ্যুষিত অঞ্চলের জন-সংখ্যা সোভিয়েট সরকারী হিসাবমতে সওয়া সাত লক্ষ। এই জনসংখ্যার শতকরা পঁয়ষট্টিভাগ হল ইউক্রেনীয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার এ অংশে ষ্টালিনের অধিকার-বিস্তারের ব্যাখ্যা একমাত্র এভাবেই সম্ভব। এ অঞ্চল কোনদিনই জার-শাসিত রাশিয়াব অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। এটা খাঁটি সত্য যে চেকোশ্লোভাকিয়া কোনদিনই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুভাব পোষণ করেনি—সোভিয়েটকে আক্রমণ করার মতলবও তার কোনদিন ছিলনা। আসল কথা ঠিক তার উল্টো। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা অতিক্রম করে কোন জাতির পক্ষেই রাশিয়া আক্রমণ করা সম্ভব ছিলনা। তবু, ১৯৪৩ সালেই মস্কো কার্পেথো-রুশ প্রশ্ন তুললে। ১৯৪৩ সালের ১৭ই মে ওয়াশিংটন ডিসিতে ব্লেয়ার হাউসে অবস্থান কালে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট বেনেসের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। তিনি আমাকে বল্লেন যে কার্পেথিয়ানের অনুন্নত অঞ্চল দখল ব্যাপারে সোভিয়েটকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন বলেই তিনি মনে করেন। ষ্টালিনের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা ছিল। ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুন রাশিয়া কার্পেথো-ইউক্রেন দখল করে।

ইউক্রেনবাসীদের পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার অংশ দান করে ষ্টালিন তাদের আনুগত্য লাভের আশা করেন। গ্রেট-রাশিয়ানদের তিনি দিলেন বাল্টিক সাগরতীরের রাষ্ট্রগুলি, ফিনল্যাণ্ডের একটুকরো, আর দিলেন শক্তিমান রাশিয়া গড়ে তুলবার স্বপ্ন। ককেশাস অঞ্চলের আজেরবাইজান রাষ্ট্রকে তিনি ইরাণের অন্তর্গত সংলগ্ন আজেরবাইজান অঞ্চল দিলেন। আর্মেনিয়ানদের জন্যে তিনি চাইলেন কাছাকাছি তুরস্কের প্রদেশগুলি।

রুশ আধিপত্য-বিস্তার শুধু শ্লাভবহুল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু ইউরোপের শ্লাভ-অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর রাখাই সোভিয়েট-নীতি। যখন সোভিয়েট-নীতি আন্তর্জাতিকতাবাদী, তখন তার আওয়াজ ছিল "দুনিয়ার মজদুর এক হও"। সোভিয়েট এখন স্লাভদেরও ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মস্কোতে কয়েকবার শ্লাভ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিন্তু যুদ্ধের বৎসরগুলিতে মস্কোতে কোন আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারা সম্মেলন, শ্রমিক সম্মেলন বা ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেসের অধিবেশনই হয়নি। শ্লাভ মহাসম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে পূর্ব্ব ইউরোপের শ্লাভদেশগুলি ও রাশিয়ার বন্ধনের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল সোভিয়েটের প্রাচ্য ব্লক গঠনেরই পূর্ব্বাভাষ—আর এরই ফলে রাশিয়ার সঙ্গে গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আজ গোলমেলে হয়ে উঠেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ষ্টালিন কারুর ক্রোধের উদ্রেক করতে বা প্রয়োজন বোধে তাকে ধ্বংস করতেও দ্বিধা করেন না—সে শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক। বিপ্লবের পরও যাদের জাতীয়তাবাদী প্রবণতা থেকে গিয়েছিল, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের সে প্রবণতার খোরাক যোগাচ্ছিলেন। যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব সুপ্ত অবস্থায় ছিল, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সে মনোভাব পুনর্ব্বার জাগিয়ে

তুলছিলেন। সোভিয়েট জনগণ আন্তর্জ্জাতিকতাবাদের দীক্ষাই পেয়েছিল। জাতীয়তাবাদ কি তারা কোনদিনই তা জানত না। আজ সোভিয়েট ইউনিয়নে নবীনদেরই সংখ্যাধিক্য। এই নবীন দল যেন মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী হতে পারে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ সে চেষ্টাই করে আস্‌ছিলেন। জাতীয়তাবাদের আবেগ বাস্তব প্রয়োজনঘটিত অসন্তোষ দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ধারাবাহিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন বহু নূতন নগর ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল — নাৎসীশক্তির পরাজয়ে এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দানও কম-নয়। যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা বৈদ্যুতিক শক্তির বিরাট বহু-বিস্তৃত উৎপাদন ব্যবস্থা, নূতন লৌহ ও ইস্পাতের করখানা, এলুমিনিয়ামের কারখানা, যানবাহনের উন্নতি, বহুধা-বিস্তৃত স্থানের ধাতব ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার ও প্রয়োগ, বহুসহস্র স্ত্রীপুরুষকে যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা,—এইভাবে উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হবার জন্যে নূতন এক শিল্প সমৃদ্ধি গড়ে তোলা হয়েছে। তার ওপর, যৌথ-কৃষি প্রথার প্রচলন হয়েছে। ইউরোপের দাসরা চাষীর পর্য্যায়ে উন্নীত হবার পর কিষাণ-সংগঠন এই প্রথম যৌথ-কৃষি ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হ'ল কিন্তু এই সব বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনেও সোভিয়েটের জনসাধারণের এখনো কোন বাস্তব লাভ হয়নি। এমনকি পূর্ব্ব ইউরোপীয় মান অনুসারেও জনসাধারণের জীবিকার মান অত্যন্ত নীচুস্তরে। সোভিয়েট নাগরিক পরিশ্রমের উপযুক্ত মর্য্যাদা পান না। নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, অস্ত্রশস্ত্র ও বিরাট সরকারী-চাকুরে শ্রেণীর বাবদ যে ব্যয় হয়, তারই ফলে সোভিয়েট নাগরিকের শ্রমমূল্য ও মজুরীর সামঞ্জস্যের ব্যতিক্রম ঘটে। ব্যয়টা অবশ্যই কাউকে-না-কাউকে বহন করতে হবে। জনসাধারণ তা বহন করে। দুঃখভোগও করে জনসাধারণই।

হ্যাঁ, জাতির তো উপকার হচ্ছে সোভিয়েট প্রচার বিভাগ যুক্তি দেখাতো। সোভিয়েট প্রচার বিভাগ জাতীয় গর্ব্ববোধ বাড়ানোর চেষ্টা করত। বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েট ব্যবস্থার জন্যে গর্ব্ববোধ ক্রেমলিনের বিবেচনায় এত প্রেরণা যোগাতে পারতোনা, বা তার এতটা আবেগময় আবেদন ছিলনা যাতে দৈনন্দিন নানা অভাব-অনটনের ক্ষতিপূরণ হয়। বিপ্লবী উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে ধরে নিয়ে নূতন এক প্রেরণা দেওয়া হল—সে প্রেরণা হ'ল জাতীয়তাবাদ। এ প্রেরণা যখন দেওয়াই হয়েছে তখন তার খোরাকও যোগাতে হবে,—সোভিয়েটের আধিপত্য-বিস্তার নীতির প্রথম প্রেরণাই তাই।

যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে—তারই সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার পুনরুদ্ধার এবং ধ্বংসাবশেষ পুনর্গঠন করার অভূতপূর্ব্ব বিরাট দায়িত্ব আজ মস্কোর সামনে। রাশিয়া অভিযানের চরম সাফল্যের কালে জার্ম্মান সেনাবাহিনীর অধিকারে মূল জার্ম্মানী দেশের তিনগুণ ভূখণ্ড ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের এ-অঞ্চল ছিল সর্ব্বাধিক সমৃদ্ধ ও উন্নত। যুদ্ধকালে লক্ষলক্ষ জার্ম্মানী ও সোভিয়েট সেনার সামরিক তৎপরতা সত্ত্বেও যা চূর্ণবিচূর্ণ হয়নি, নাৎসীরা ইচ্ছাপূর্ব্বকই তা ধ্বংসস্মাৎ করলে। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই বিরাট ব্যয়ে যা নির্ম্মিত হয়েছিল তার পুনর্নির্ম্মাণ হৃদয়-বিদারক। সোভিয়েট নাগরিককে পুনর্ব্বার ত্যাগ স্বীকারে আহ্বান করা হল—তাকে কম খাদ্য গ্রহণ করতে। বলা হল স্বল্পপরিসর বাসস্থানে খুশী থাকতে, আর কাজের পরিমাণ ও প্রাবল্য মাথা পেতে নিতে।

১৯১৬ থেকে রাশিয়ার কি কঠোর দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে বাইরের লোক তা খুব কমই বোঝে। ঐ দীর্ঘ বছরগুলি কদাচিৎ তাদের স্বাভাবিক ভাবে কেটেছে। এমন কয়েকজন ব্যক্তিও ছিল, একটি মুহূর্ত্তও যাদের স্বাভাবিক ভাবে কাটেনি।

সংখ্যায় নগণ্য কয়েকজন ছাড়া সবাইকেই অবিরাম চাপ সহ্য করতে হয়েছে, অশেষ স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে, স্বল্প রেশনে খুশী থাকতে হয়েছে, আর দাঁড়াতে হয়েছে সুদীর্ঘ লাইনে। আজ সে শ্রান্তির যুগ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে সোভিয়েট জনগণকে পুনর্ব্বার সেই বোঝা কাঁধে নিয়ে দেশের আর্থিক অবস্থাকে তার নিজ পায়ে দাঁড় করাতে হবে। স্বভাবতই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চায় এই পুনর্গঠনের কাল সংক্ষিপ্ত হোক,—সোভিয়েট জনগণের দুর্ভোগেরও লাঘব হোক। কি ভাবে তা সম্ভব? রাশিয়ার আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের আর মাঞ্চুরিয়ার আর্থিক অবস্থার সংযোগ ঘটিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। সেই সংযোগ এভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ওদেশগুলির শিল্প, কাঁচামাল ও জনশক্তি রাশিয়ারই প্রয়োজনে আসে। অষ্ট্রিয়া ও রুমানিয়ার তেল, হাঙ্গেরীর শিল্প ও কৃষি, চেকোশ্লোভাকিয়ার কারখানা এবং সাধারণ ভাবে সোভিয়েট প্রভাবাধীন অঞ্চলের পনের কোটী নরনারী—এসব কিছু ও সকলের উপরেই এজন্যে মস্কো নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ করতে চায়, সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতির এই হল দুনম্বর উদ্দেশ্য।

তিন নম্বর উদ্দেশ্য হল সুবিধা। জাতিসমূহ প্রায়ই অনেক কিছু করতে একান্ত বাধ্য হয়। জার্ম্মানী ও ইটালীর পরাজয় এবং ফ্রান্সের দুর্ব্বলতা এশিয়ায় বিশেষতঃ চীনদেশে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তারপর, প্রকৃতির মত আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিও শূন্যতা সহ্য করেনা। সুতরাং বৃহৎ ত্রিশক্তির প্রত্যেকেই হয় এই শূন্যস্থানের যতটা সম্ভব অধিকার করতে চেষ্টা করে, না হয় অন্ততঃ অন্য শক্তি দুটি যেন শূন্যস্থান দখলে উদ্যোগী না হয়, সে চেষ্টা করে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে সংঘর্ষের মূলই এখানে। উপদেশ দিয়ে এ সংঘর্ষ অসম্ভব করে তোলা যায়না। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এমন এক লোভনীয় বস্তু দেখা যাচ্ছে, যা বহুযুগের মধ্যেও

দেখা যায়নি। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে তীব্র হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পরাজিত ত্রিশক্তি অন্তর্হিত হবার ফলে বিজয়ী ত্রিশক্তির আধিপত্য বিস্তারের অসাধারণ সুযোগ দেখা দিয়েছে। দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির শ্রান্তিও সহায়হীনতা আত্মপুবিপুষ্টি ও প্রভুত্ব বিস্তারের প্রলোভন বাড়িয়েই তোলে।

সোভিয়েট ও তার বিদেশী সমর্থকরা এবং ভারসাম্যে বিশ্বাসী বেশ কিছু সংখ্যক আমেরিকান ও ইংরাজ আশা করেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লুটের মাল বৃহৎ ত্রিশক্তির মধ্যে আপোষে এমনভাবে বন্টিত হবে যার ফলে প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র প্রভাবাধীন অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। তাঁরা আশা করেছিলেন যে বৃহৎ ত্রিশক্তি এই লুটের মালের অংশীদার হলে, তাই হবে যুদ্ধোত্তর মিটমাটের ভিত্তি, আর নিজ নিজ স্বার্থেই তারা সে মিটমাট বজায় রাখবে।

ব্যাপার দাঁড়াল অন্য রকম। ইউরোপের দিকে তাকিয়ে ষ্টালিন দেখলেন যে তাঁকে রুখবার মত কেউ নেই। তাই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাষ্ট্র হাতে নিয়ে নিলেন। তারপর বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা মনে করে যে রাশিয়া ইউরোপের শূন্যস্থানের বড়ো অংশটা তার তাঁবেদারদের দিয়ে পূর্ণ করে ফেলেছেন। সেরূপ রাশিয়া মনে করে যে, আমেরিকা এশিয়ার শূন্যস্থানের অতিরিক্ত বড়ো একটা অংশ কুক্ষিগত করে বসেছে। তবু, আমেরিকা ভেবে পাচ্ছেনা, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্ত্তী জল ও স্থলে রাশিয়ার কি অভিসন্ধি থাকতে পারে। শূন্যস্থানে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। শক্তির ভারসাম্য যেখানে অসম্ভব, প্রত্যেকটি জাতিই সেখানে চরম ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে।

এটা নিশ্চিত যে বৃহৎ ত্রিশক্তি তাদের দ্বন্দ্বের একটা সামঞ্জস্য

বিধান করতে চেষ্টা করবে। তারা যুদ্ধ চায়না। তারা দর-কষাকষি করে মিটমাট করবে। বিশ্ব-শান্তির ভিত্তি হিসাবে এ একেবারে কাঁচা।

এই ত্রিশক্তির মধ্যে সর্ব্বাধিক দুর্ব্বল ইংলণ্ড তার কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার আক্রমণের মুখে ইংলণ্ড নিরুপায়। আমেরিকা ও রাশিয়া এশিয়ার রাজ্যলাভের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছে।

ক্রেমলিনের হাতের কাছে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ উপস্থিত। এই প্রলোভন দমন করা সম্ভব ছিলনা।

অতীতে অন্যান্য দেশ যে সমস্ত অন্যায় কাজ করেছে, রাশিয়া তাদের চেয়ে বেশী কিছু অন্যায় করছেনা। ন্যায়ও বেশি কিছু করছেনা। পোলাণ্ডের অধিবাসিগণ যে পরিমাণ জমি চেয়েছিলেন, আন্তর্জ্জাতিকতা-বাদী লেনিন ১৯২১ সালে তার অধিকই তাদের দেন। স্বেচ্ছায় তিনি ফিনল্যাণ্ড ও বাল্টিকসাগর তীরবর্ত্তী তিনটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। তিনি আফগানিস্থানকে কয়েক টুকরো জমি দেন এবং চীনদেশে রাশিয়ার বিষয়াধিকারও ছেড়ে দেন। জারদের আমল ইরাণের নিকট থেকে তেল ও অন্যান্য যে সকল বিশেষ সুবিধা আদায় করেছিল, তিনি তা ফিরিয়ে দেন। তুরস্ককে তিনি সাহায্য করেন। নিখিল শ্লাভজাতীয়তাবাদ পুষ্টির ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই ছিলনা। তিনি বিপ্লব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সাম্রাজ্য নয়। কিন্তু রাশিয়ার মনোরাজ্যে লেনিনের মূর্ত্তি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার স্মৃতিও ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে।

কোন কিছুর পরিমাণ করতে হলে তার একটা মান থাকা চাই! বৈজ্ঞানিকগণ রেখা, ওজন ও তাপের মান স্থির করে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষ তার ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় মান স্থির করে। তা সে করে তার ধর্ম্মীয় বা রাজনৈতিক প্রবণতা দিয়ে।

তার কাছে ভগবান বা কতকগুলি নীতি স্থির আদর্শ হতে পারে। কিন্তু তার স্থির আদর্শ যদি কোন ব্যক্তি বা গভর্ণমেণ্ট হয়, তাহলে তার পরিমাপ অর্থাৎ ঘটনার ও ধারণার বিচার বিকৃত হতে বাধ্য। কারণ মানুষ বা গভর্ণমেণ্ট প্রায়ই তাদের মৌলিক নীতি বা ভাবাদর্শ থেকে ভিন্ন পথে চলে। কোন রাজনৈতিক যন্ত্র বা মানুষই অপরিবর্ত্তনীয় বা অভ্রান্ত নয়। কাজেই কোন কমিউনিষ্ট যখন বলেন যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বা ষ্টালিন কোনদিনই ভুল করতে পারেন না, এবং সে অনুসারেই প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট বা ব্যক্তিকে বিচার করেন, তার পক্ষে তখন পরিষ্কারভাবে কিছু দেখা, ভাবা বা বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন কোন দেশ, গভর্ণমেণ্ট বা নেতা নেই, যার কোন দিন মারাত্মক বিচারবিভ্রাট ঘটেনা। দৈনন্দিন সংবাদপত্রেই স্পষ্টাক্ষরে এর প্রমাণ থাকে।

১৯৪৫ সালে আর্জেন্টিনাকে যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও তাঁদের দেশান্তরের সমর্থকরা তখন তার প্রকাশ্য নিন্দা করেন। তাঁদের যুক্তি হল এই, ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখা চলেনা।

কিন্তু ১৯৪৩-এর জুন মাসে সোভিয়েট যখন পেরনের একনায়কত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করলেন, তখন কোন কমিউনিষ্টই ক্রেমলিনকে দোষারোপ করেন নি। তাঁদের বিচারের নির্দ্দিষ্ট কোন মানই নেই। এটা হচ্ছে সুবিধাবাদ। এর মানে এই দাঁড়ায় যে সোভিয়েট সরকার যাই করুকনা কেন, তা-ই ভাল—তা হিট্‌লার বা পেরনের সঙ্গে চুক্তিই হোক, জঙ্গীবাদই হোক, বা সন্ত্রাসবাদই হোক। এ ধরণের মানদণ্ডে বিচার করলে সে বিচার অপদার্থ হতে বাধ্য।

বিপ্লবের কি হলো ?

বিপ্লব অতীতকে অস্বীকার করে, বর্ত্তমানের হিসাবনিকাশের কথা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতেব পথে এগিয়ে চলে। বিপ্লব থেকেই নতুনের সৃষ্টি আর অতীতকে অস্বীকার করাই হচ্ছে এর মুল ধর্ম্ম। কুখ্যাত জার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণই ছিল বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য। অবসর, প্রেরণা বা কর্ম্মসূচী সব কিছুই ছিল এর ভেতরে।

কার্লমার্কস্ এবং পিটার দি গ্রেট, কমিউনিজমের ভবিষ্যত এবং রাশিয়ার অতীতের মধ্যে সংগ্রামের ফলে ঘটেছে বল্‌শেভিক্ বিপ্লব। নবচেতনা বাধা পেয়েছে অতীতেব কাছ ছেকে। সময় সময় হয়েছে মার্কস্‌বাদের জয়—এখন হয়েছে পিটার বিজেতা মার্কস্ বন্দী। মূল প্রশ্নে পিটার এবং মার্কস্ উভয়েই একমত: উভয়েই এক-নায়কত্বে বিশ্বাসী। বর্ত্তমান কালে উভয়েই জেনাস্ প্রাণীর মত দুইটি অপরিচিত মুখ নিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। কেউ তাকিয়ে দেখে মার্কস্‌কে আবার কেউ দেখতে পায় পিটারকে। এটাই হচ্ছে সব চেয়ে গোলমেলে।

সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণ ভাবে মার্কস্ কিম্বা পিটার-পন্থী নয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে এক অভিনব এবং অভূতপূর্ব্ব জিনিষের সৃষ্টি হয়েছে আর কোন ব্যাখ্যা করা চলেনা।

দুঃখের বিষয় এইযে পৃথিবীর জনমত সাধারণতঃ সোভিয়েট রাষ্ট্রের ঘটনাবলীর বহু পশ্চাতে, এমনকি, দশবছর পেছনে পড়েছিলো। ১৯২৯ সালের কথা, যখন আমি এবং মস্কোস্থিত অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিক, লিখে পাঠিয়েছিলাম যে রাশিয়া শিল্পোন্নতি

করে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এটাকে নিছক মিথ্যা প্রচার বলে তখন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। প্রচারকার্য্যের ফলে অনেক সময় আমাদের অপ্রস্তুত করে সত্য বেরিয়ে পড়ে। দশ বছর আগে যখন সাংবাদিকেরা লিখে পাঠিয়েছিলেন যে রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠছে তখন এটাকে প্রচার-কার্য্য বলে ধরা হয়েছিলো। আবার যখন ভূতপূর্ব্ব রাজদূত জেসেফ্‌ ই ভেভিস্‌ তাঁর মিসন টু মস্কোতে একথা দশবছর পরে লিখলেন তখন তাঁর বইয়ের কাটতি হয়েছিলো অসম্ভব রকমের।

সোভিয়েট ইউনিয়ানের ভেতরে যে সব অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে যার ফলে সোভিয়েট শাসনের রূপ পর্য্যন্ত বদলে গেছে বেশীর ভাগ লোকই তার আট দশ বছর পিছে পড়ে আছে।

অনেক সময়ই গভর্ণমেণ্ট, নেতৃত্ব এবং দলের রদবদল হয়। নেপোলিয়ান প্রথমে বিপ্লবী যোদ্ধা হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি হয়েছিলেন সম্রাট। মুসোলিনী ছিলেন প্রথমে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী। পরে তিনি হলেন জাতীয়তাবাদী এবং তারই ফলে ফাসিস্ট হবার পথে তিনি অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রপতিরা অনেক সময়েই নিজেদের সুবিধার জন্য আদর্শকে বিসর্জ্জন দেন। বাইরে তাঁদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখাতেও তাঁরা পারেন হয়তো।

সরকারী দপ্তরের মতামতের ওপর নির্ভর করলেই কোন দেশের সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করা যায়না। কার্লমার্কস্‌ এক সময় বলেছিলেন যে গৃহকর্ত্রীরা পর্য্যন্ত দোকানদারের কথায় নির্ভর না করে নিজেরাই মুর্গীর গুণাগুণ বিচার করেন আর ঐতিহাসিক ও সাংবাদিকেরা গভর্ণমেণ্টকে বিচার করেন তারই কথা দিয়ে। মার্কস্‌ বর্ত্তমান কালের সাংবাদিকদের একথাই বলতেন যে গভর্ণমেণ্টরূপ মুর্গীকেও যাচাই করে নিও।

রাশিয়ার নেতাবৃন্দ এবং দেশের বেশীর ভাগ যায়গাই বাইরের লোকের পক্ষে অগম্য। প্রভুত্বের যে একটা আঁচ সেখানে পাওয়া যায় সেটা অজ্ঞতার জন্য নয়, দূরদৃষ্টির অভাবে। এটা এই নয় যে আমরা রাশিয়াকে জানিনা বরং আমরা জানিনা রাশিয়া ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে। এটাই হচ্ছে এ রহস্যের উপাদান। একনায়কত্বমাত্রই রহস্যময় কারণ জনমত সেখানে একনায়ককে বাধা দিতে পারেনা এবং স্বাধীন সংবাদপত্রও তার মুখোস খুলে দেয় না।

রাশিয়া রহস্যাচ্ছন্ন দেশ নয়। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলোতেই খাঁটি বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। কি তারা বলে আর কেমন করে বলে, তার চাইতে কি তারা বলে না তার ওপরই আলোকসম্পাত হয় বেশী। নানাবিধ কার্য্যকলাপের থেকেই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে বিচার করা চলে।

সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য পাওয়া যায় এবং বুঝতেও তাকে তেমন কিছুঁ শক্ত নয়।

রুশদেশে গভর্ণমেণ্টই সমস্ত মুলধনের মালিক। কোন সোভিয়েট প্রজাই জমি বেচাকেনার অধিকারী নয়। গভর্ণমেণ্টই সকল জমির মালিক। সোভিয়েট কৃষকদের হাতে ঘোড়া, বলদ, ট্রাক কিংম্বা ট্রাকটর কিছু নেই। এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান উপাদান বা মূলধন, কাজেই গভর্ণমেণ্টই এসবের অধিকারী। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টই দেশের সব কলকারখানা চালায় এবং তাদের অধিকারী; সমস্ত রেলপথ, তেলের খনি, কয়লার খনি সাধারণ যানবাহন, সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, পাইকারী ও খুচরো দোকান, সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার আস্তানা, নাপিতের দোকান, হোটেল রেস্তোরাঁ, উড়োজাহাজ, যানবাহনের সমস্ত উপাদানঃ এককথায় বলতে গেলে অর্থোপার্জ্জনের সমস্ত কিছুই গভর্ণমেণ্টের হাতে।

একজনের পক্ষে হয়তো একটা ঘড়ি, একপ্রস্থ কিম্বা কয়েক প্রস্থ স্যুট, একটী লাইব্রেরী, একখানা বাড়ী, একটা গ্রীষ্মাবাস অথবা হয়তো একখানা মোটর গাড়ী রাখাই সম্ভব, যদিও রাশিয়া এত গরীব দেশ যে বোধহয় দু'শ লোকের বেশীরই নিজেদের মোটর গাড়ী নেই। কোন লোক গাড়ী রেখে ট্যাকসী হিসাবে যদি তাকে চালায় তাহলে বলা হবে সে অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র হিসাবে তাকে ব্যবহার করছে এবং তখন সেটা হবে মূলধন, অতএব মূলধন হিসাবে তা রাখা বেআইনী হবে। সোভিয়েট নাগরিক তার নিজের কিম্বা পরিজনবর্গের সুখ সুবিধার জন্য ধনসম্পত্তি রাখতে পারে। কিন্তু মূলধন হিসাবে রাখা চল্‌বেনা।

রাশিয়াতে সোভিয়েট রাষ্ট্রই একমাত্র পুঁজিবাদী। রাশিয়া বর্ত্তমানে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে একত্রীকৃত এবং বিমানযোগে ভ্রাম্যমান সপ্তাহান্তিক বিদেশী সংবাদিকদের বিবরণ ছেড়ে দিলেও মূলধনের মালিক হিসাবে গভর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনা।

ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রবাদের সমালোচকেরা এর অনেক দোষত্রুটী যে দেখান তা ঠিকই কিন্তু তা'থেকে এরকমও মনে করা চলেনা যে ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদের পরও নতুন করে কোন বিপদ দেখা দেবেনা।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের দোষত্রুটীর একটা কারণ হচ্ছে কাজের প্রেরণা। জাতির সেবা এবং আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি অনুপ্রেরণাগুলো বলশেভিক্‌রা সাধারণের মধ্যে জাগাতে চেষ্টা করে, এবং এগুলো নিঃসন্দেহে কার্য্যকরী হয়ে দাঁড়ায়। তারা নাগরিক উদ্যমকে পদক, প্রচারকার্য্য এবং পুরস্কার-বিতরণ দ্বারা বলবতী করবার চেষ্টা করে। রাশিয়ায় ত প্রধান অনুপ্রেরণা তিনটী এবং সেগুলো সবই কার্য্যকরী—যেমন, মাইনে, সুখসুবিধা এবং ক্ষমতা।

পরিশ্রমের মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সর্ববদাই বিভিন্ন রকমের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কর্ম্মদক্ষতা, উচ্চশিক্ষা এবং অসাধরণ প্রতিভা সেখানে পুরস্কৃত হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য যার সব চেয়ে বেশী এবং যার সব চেয়ে কম মাইনে তাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশী। ১৯৪৬ সনে সি, আই, ও প্রতিনিধিদলের রাশিয়াভ্রমণ-সংক্রান্ত সোভিয়েটের স্বপক্ষে যে রিপোর্ট আমেরিকার সংবাদপত্রে ১৮ই মার্চ্চ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে কোন সোভিয়েট কারখানাতে, "শ্রমিকের তিন'শ থেকে আরম্ভ করে তিন হাজার রুবল পর্য্যন্ত ব্যয়"।

চাই, আরও চাই,—টাকার চাহিদার ওপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্প-শ্রমিকেরা এবং চাষীরা বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের শ্রমের মূল্য পায়। রাষ্ট্রগত শিল্পের উৎপাদনের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ম্যানেজার ও খনির ডাইরেক্টরেরা পেন্সন পান। যুদ্ধের সময় প্রতি সোভিয়েট প্যারাস্যুট সৈনিক আক্রমণাত্মক লক্ষের জন্য একমাসের মাইনে পেত। উচ্চশ্রেণীর সৈনিক অফিসার মারা গেলে পর তার পরিজনবর্গ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে উচ্চহারে ভাতা পায়। এ কারণে, ১৯৪২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মেজর জেনারেল লিভাশেভের পরিবারবর্গ এবং ১৯৪২ সনের ১২ই মার্চ্চ ভাইস কমিশার কার্টুশেভের পরিবারবর্গ—এগুলো হচ্ছে সোভিয়েট সংবাদপত্র থেকে বাছাই না করে পাওয়া খবর—প্রত্যেকে থোকে বিশহাজার রুবল পেয়েছিলো (যার সঙ্গে কোন কারখানার শ্রমিকের মাসিক পাঁচ'শ রুবল আয়ের তুলনা করা চলে) এবং এছাড়া মৃতের স্ত্রীকে মাসিক পাঁচ'শ রুবল এবং প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে তিন'শ রুবল দেওয়া হয়। ১৯৪২ সনের ১১ই এপ্রিলের খবরে জানা যায় যে একলক্ষ থেকে দু'লক্ষ রুবল "স্টালিন প্রেমিয়াম" কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে দেওয়া হয়েছিলো এবং প্রাভদার পরের

দিনের খবরে প্রকাশ যে পঞ্চাশ হাজার থেকে একলক্ষ রুবল 'প্রিমিয়াম' কয়েকজন আর্টিষ্ট ও গ্রন্থকারকেও দেওয়া হয়।

পুরস্কার হিসাবে অর্থপ্রদানের তীক্ষ্ণ বৈষম্য আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায় নানারকম বিশেষ সুবিধা থেকে—যেমন, ভাল ঘড়বাড়ী, গ্রীষ্মাবাস, ভাল হাসপাতালের বন্দোবস্ত, বিনাভাড়ায় রেলভ্রমণ এবং মোটরগাড়ী প্রভৃতি, যা গভর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট লোকদের দিয়ে থাকে। যেদেশে সুখসুবিধা খবই কম পাওয়া যায় সেখানে ঘরবাড়ী, মোটরগাড়ী কিম্বা ভালভাবে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার ওপর জোর দেওয়া স্বাভাবিকই, ধনতান্ত্রিক দেশের চেয়ে সোভিয়েট রাশিয়াতে গরীব ও বড়লোকের পার্থক্য বেশীভাবে নজরে পড়ে। স্টালিনের রোজগার খুবই কম এবং হয়তো তিনি টাকা পয়সা স্পর্শও করেন না। তাহলেও পার্থিব সুখ সুবিধা যা মানুষের পক্ষে কাম্য সবই তিনি পাচ্ছেন। রুজভেল্ট যেভাবে বাস করতেন স্টালিনও ঠিক সেভাবেই বাস করেন। যেকোন সোভিয়েট শ্রমিক, অপরপক্ষে, আমেরিকার শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম সুখসুবিধা ভোগ করে।

সোভিয়েট জীবনযাত্রাপ্রণালীতে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাকে আকস্মিক ঘটনা বলা চলেনা। এগুলো হচ্ছে ইচ্ছাকৃত। ১৯২০ সনের মাঝামাঝি সোভিয়েট লেখকরা সমতাকে বুর্জ্জোয়া কুসংস্কার এবং গণতান্ত্রিক নির্ব্বুদ্ধি বলে ঠাট্টা করতেন। তখন থেকেই গভর্ণমেণ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ও বাসের ব্যবস্থার অনৈক্য ইচ্ছা করেই চালাচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য কেবল শিল্প ও কৃষিকার্য্যের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করাই নয়; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গণ্য ব্যক্তি এবং সুবিধাবাদীর দল সৃষ্টি করা। সোভিয়েট রাশিয়াতে এখন এ শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান।

দেশের নিকৃষ্ট জীবনযাত্রাপ্রণালীর উন্নতি সাধন করবার অসুবিধা দেখে ষ্টালিন রাশিয়ার নব অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেন।

যেখানে সবাইকে সন্তুষ্ট করা চলে সেখানে মুষ্টিমেয় লোকের সন্তুষ্টি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা কোন দেশেই নেই। কিন্তু যেখানে সুখ সুবিধা যথেষ্ট নয়, যা থেকে দেশের জনসাধারণ সুখী হতে পারে, সেখানেই একনায়কত্ব চায় বিশ্বস্ত ভদ্রশ্রেণীকে। রুশ দেশের এই ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে আছে সামরিক কর্ম্মচারীরা, গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্ত্তারা, শিল্প বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষরা, সামান্য কিছু দক্ষ উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রগত ও দলভুক্ত মুষ্টিমেয় উচ্চ কর্ম্মচারী এবং চিত্রশিল্পী ও লেখক—যাঁরা প্রচারকার্য্য চালাচ্ছেন। এদের সংখ্যা তাদের অশ্রিতদের বাদ দিয়ে চল্লিশ লক্ষের বেশী হবেনা। ইউরোপীয় মানদণ্ডের হিসাবেও এরা ভাল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকের চেয়ে অনেকাংশে ভাল থাকেন।

কোন জাতির জীবনযাত্রাপ্রণালী হচ্ছে কতগুলো জটীল বিষয়ের সমন্বয়। খাদ্য, জামা-কাপড় এবং আশ্রয়ই হচ্ছে প্রধান বিষয়। আর একটি হচ্ছে চাকুরির নিশ্চিন্ততা। সোভিয়েট নাগরিকদের—যাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় আছে এবং রাজনীতিতে যারা মধ্যপন্থী—চাকুরির ভাবনা ভবতে হয়না। এটা মস্ত লাভ।

আগে আমি মনে করতাম, সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের যে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা প্রায় ১৯৩১ সন থেকে আরম্ভ হয়েছিলো তা সমাজতন্ত্রবাদ এবং লভ্যাংশ বন্টনের অভাবের ফল। আমার একথা এখন মনে হয়না। গণতান্ত্রিক জার্ম্মানীও ১৯২২ ও ১৯২৫ সনে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা করেছিলো। নাৎসী জার্ম্মানীও ১৯৩০ সনের পরে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা করেছিলো। যুক্তরাজ্য ইংলণ্ড এবং নাৎসী জার্ম্মানীও সারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা করেছিলো।

সোভিয়েট রাশিয়া, জার্ম্মানী ও যুদ্ধলিপ্ত জাতিগুলোর পূর্ণনিয়োগ

ব্যবস্থার সময়ে এই বিষয়গুলো সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল: রপ্তানি বা বৃহদায়তন শিল্পবিস্তার অথবা যুদ্ধের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ক্রেতার পণ্যের অভাব। উভয়ের ফলে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি।

১৯২৪ সনে মার্কের মূল্য যখন স্থায়ী হয়, তখনই পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার অবসান হয়; জার্ম্মানীতে বেকার-সমস্যা আরম্ভ হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৮ সনের মধ্যে রুবলের মূল্যও স্থায়ী হয়; রাশিয়াতে তখন বেকার-সমস্যা দেখা দেয়; গভর্ণমেণ্ট আন্‌-এম্পলয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জের প্রচলন করে। ১৯২৮ সনে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠা'র নবযুগ সূচনা করে। রুবলের মূল্য কমে যায়, এবং ১৮৩১ সনে জিনিষের মূল্য অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। খাদ্য এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের অভাব দৃষ্ট হয়। তখনই হয় পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা।

আমি একথা বলতে চাইনা যে পূর্ণনিয়োগ-ব্যবস্থা দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি এবং জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতার সময়ই সম্ভবপর। কিন্তু এপর্য্যন্ত দেখা গিয়েছে যে পূর্ণনিয়োগ-ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই একই যোগাযোগের ফলে সম্ভবপর হয়েছে।

পূর্ণনিয়োগ-ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে তখনই আসে যখন যাকিছু তৈরী করা যায় তারই চাহিদা বাজারে থাকে। পূর্ণনিয়োগ-ব্যবস্থা হচ্ছে শ্যামদেশীয় যমজের মত পূর্ণবণ্টন-ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে পূর্ণবণ্টন সম্পূর্ণ হয়েছে গণতান্ত্রিক জার্ম্মানীতে, ১৯৩১ সনের পরে সোভিয়েট রাশিয়াতে এবং যুদ্ধলিপ্ত দেশগুলোতে, যখন সব কিছুরই অভাব বিদ্যমান। প্রশ্ন হচ্ছে: প্রাচুর্য্যের সময়ে কি সম্পূর্ণ বণ্টন সম্ভবপর? সোভিয়েট কার্য্যকলাপের থেকে আমরা এর কোন মীমাংসা খুঁজে পাইনা। বিপ্লবের সময় থেকে আরম্ভ করে কখনই সোভিয়েট ইউনিয়নে যথেষ্ট খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ কিম্বা বাসস্থানের প্রাচুর্য্য দেখা যায়নি। বল্‌শেভিক বিপ্লব চালানো

হয়েছিলো এমন অবস্থার মধ্যে যখন জিনিষপত্রের অভাব যথেষ্ট ছিল।

তাহলে রাশিয়ানরা কি করে যুদ্ধের মধ্যে এত ভাল ভাবে লড়াই করেছিলো? এথেকে এটাই কি প্রমাণিত হয়না যে তারা সুখী ছিল?

ইংরেজরা উইন্স্টন্ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো এবং বাধাও দিয়েছিলো সুন্দরভাবে। তারপর তারা তাঁকে গদী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলো। ইংরেজরা যেমন চার্চ্চিলের জন্য যুদ্ধ করেছিলো এবং আমেরিকানরা রুজভেল্টের জন্য তার চেয়ে বেশী কিছুর জন্য সোভিয়েট নাগরিক স্টালিনের হয়ে যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধের মানে রাজনৈতিক নির্ব্বাচন নয়। ভারতীয় সৈনিকেরা যুদ্ধে যে গৌরব অর্জ্জন করেছিলো তা তাদের বৃটীশ সাম্রজ্যবাদের প্রতি প্রীতির জন্য নয়।

দর্শনচিন্তার জটিলতা, মানসিক দুর্ব্বলতা এবং কার্য্যকরী উত্তেজনার সমাবেশের ফলে মানুষ যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধে প্রাণ দেয়। আমি প্রথম আমেরিকান হয়ে যে 'আন্তর্জ্জাতিক বিগ্রেডে' নাম লিখিয়েছিলাম স্পেনের গৃহযুদ্ধে সবচেয়ে ভাল সৈন্য হিসেবে তারপরই ফ্রাঙ্কোর মুরদের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজপক্ষীয় সোভিয়েট ট্যাঙ্ক চালকেরা আমাকে বলেছিলো, তারা যখন গ্যারেজে ফিরে আসতো তখন তাদেরই মেসিনের তলায় দেখত মুর সৈন্যদের দেহ, যারা অপরিচিত এবং প্রচুর প্রবল যন্ত্রশক্তির সামনেও মুখ তুলে দাঁড়াতে পিছ্‌পা হয় না। তাহলেও মুররা জানতোনা যুদ্ধ কি জিনিষ। এটা হচ্ছে বীরত্ব এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। যুদ্ধে সৈনিকরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করে তা থেকে এমন কিছু মনে করা চলে না যে, তারা যুদ্ধকে সমর্থন করে, কিম্বা সমর্থন করে তাদের যারা তাদের যুদ্ধে পাঠায়।

সেনাবাহিনীর মূল্য সৈন্যাধ্যক্ষদের চাইতে কম নয়, এবং লালফৌজের সেনানায়কেরা সকলেই ছিল কৃতী। তাছাড়া, রাশিয়ানরা বরাবরই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ভাল ভাবে লড়াই করেছে। তারা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার পথ রুদ্ধ করেছিলো। রাশিয়ান সৈনিকেরা তখন এবং এখনও কৃষকশ্রেণীভুক্ত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রাশিয়ার কৃষকেরা দাস-শ্রেণীভুক্ত ছিলো। এ সত্ত্বেও তারা অত্যাচারী জারের সৈন্যদলে থেকে নিজেদের বলি দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। অস্ত্রশস্ত্র বস্তুত কিছুই ছিলো না, তথাপি রাশিয়ানরা প্রথম মহাযুদ্ধেও ভালভাবে যুদ্ধ করেছিলো। এমনও হয়েছে, যে পূর্ব্ববতন সৈনিকের পতন না হওয়া পর্য্যন্ত আর একজন সৈনিককে রাইফেলের জন্য অপেক্ষা করে থাক্তে হয়েছে। তাহলেও তারা কাইজারের পূর্ব্ব সীমান্তের সেনাদলকে মস্কো, পেট্রোগ্রাড, ভলগা এবং ককেসাস থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো।

১৯১৮, ১৯১৯ এবং ১৯২০ সনের অভিজ্ঞতা থেকে লালফৌজ বিদেশী শাসনের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলো। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিলো কিভাবে নাৎসী বর্ব্বরতা শহর, গ্রাম, আর মানুষ ধ্বংস করেছে। সোভিয়েট নাগরিকেরা বিদেশী শাসন মেনে নিতে চায়নি। অনেকেই, বিশেষতঃ অফিসারেরা, বিপ্লব থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলো। বিস্তৃত শিক্ষা ও চাকুরির সুব্যবস্থা, জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থা, পেন্সন, বার্ষিক ছুটী, এবং অন্যান্য সামাজিক সুখসুবিধা প্রাপ্তির ফলে সোভিয়েট নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছিলো। জাতি-বিদ্বেষের অভাব এবং সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংরক্ষণের ব্যবস্থার ফলে সাধারণের গভর্ণমেন্টের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অত্যাচার, মানসিক দুর্যোগ এবং কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ লোকই যুদ্ধের সময় দেশকে সাহায্য করেছিলো।

কিছু লালফৌজ পালিয়ে গিয়ে সারা জীবনের মত বিদেশে থাকা পছন্দ করল। লালফৌজের কিছু সেনাধ্যক্ষও দলত্যাগ করে নাৎসীদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলো। আমি যতদূর জানি কোন আমেরিকান সেনাধ্যক্ষ, কিম্বা বৃটীশ, জার্ম্মান, ফরাসী অথবা যে কোন ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষ কিম্বা কোন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী নিজের দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। কিন্তু মেজর জেনারেল অ্যানড্রেই. এ. ভ্যাসভ, যিনি ১৯৪১ সালে মস্কো রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন, ২রা জানুয়ারী 'রেড ব্যানার' পেয়েছিলেন, ১৯৪২ সনের ৬ই জানুয়ারী মস্কোর প্রভদা কাগজে অতি উচ্চশ্রেণীর সামরিক কর্ম্মচারী বলে যাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিলো, সে ১৯৪২ সনে নাৎসীদের হাতে পড়ে কিম্বা দল ত্যাগ করে। হিটলারের অনুচর হয়ে জার্ম্মানীতে যে সব রাশিয়ান বন্দী-সেনা ছিল তাদের মধ্য থেকে লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সে সেনা সংগ্রহ করেছিলো। ভ্যাসভ অথবা তারই সমশ্রেণীর সামান্য কয়েকজন লোকের কথা না ধরলেও মোটামোটি বলা চলে, লালফৌজ বেশ ভাল এবং বিশ্বস্তভাবে নিজেদের দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলো। বেশীর ভাগ অসামরিক লোকও এদের মত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিলো।

আনুগত্য বজায় রাখার প্রয়োজনে একনায়কত্বের শাসন গোয়েন্দা পুলিশ আর নানা প্রকার ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার করে থাকে। তারপর তার একচেটিয়া প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা অন্যান্যদেরও দলে টেনে আনে। এবং অনেক সময়ই তাতে কৃতকার্য্য হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, যেখানে মানুষ সুবিচার পেতে পারে এবং বিপক্ষীয় দলের কথা শুনতে পারে, সেখানে পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের মন রাষ্ট্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে উঠতে পারেনা। একনায়কত্বের অধীন অতি অল্প লোকই সরকারী বিভাগের আক্রমণের হাত থেকে স্বাধীন চিন্তা এমনকি

সাধারণ চিন্তা করবার ক্ষমতাকে বজায় রাখতে পারে। একনায়কত্বাধীন সাধারণ নাগরিকেরা তাদের প্রভুর প্রতি যে আনুগত্য দেখায় তার ওপর নির্ভর করে বড় বড় সিদ্ধান্ত করেই গণতান্ত্রিক দর্শকগণ ভুল করেন। এ-সমর্থনে কিন্তু একনায়করা ভ্রান্ত হন না। যদি হতেন তাহলে তাঁরা তাঁদের 'জিপিইউ' আর 'গেষ্টাপো', বন্দীশালা, একদলীয় নির্ব্বাচন, কথা বলা, গান করা, ছবি আঁকা, ফটো তোলা এবং দেশের মধ্যে যা কিছু লেখা হচ্ছে সব, আর তাঁদের নিষ্কণ্টক হওয়ার নীতি, কটূক্তি, মানুষকে আয়ত্তে আনার জন্য, অন্তত তাদের মনকে বিকল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বিরামহীন সরকারী আন্দোলন, জনসাধারণ আর নেতৃবর্গের মধ্যেকার চীনের প্রাচীরতুল্য গোপনীয়তার ব্যবধান এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিরাট সতর্কতার ব্যবস্থা—সব কিছুই বাতিল করে দিতেন।

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বিদেশীর প্রতি সন্দেহের ভাব পোষণ করেন। কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নিজেদের নাগরিক এবং সরকারী কর্ম্মচারীর প্রতি আস্থা রাখতে পারেন না। তা'নাহলে বিদেশী সংবাদপত্রের দেশে প্রবেশ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা কেন প্রচার করা হয়? দ্বিতীয় দশকে জার্ম্মান ও ইংরেজী ধনতান্ত্রিক সংবাদপত্র মস্কো ও দেশের নানাস্থানে বিক্রী করা হতো। আমি নিজেও নিয়মিতভাবে উক্রেন ও ককেসাসের ষ্টেশনে বার্লিনের বুর্জ্জোয়া দৈনিক 'ট্যজিব্লাট' কিনতাম। কয়েক বছর হলো এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেকয়টি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে বিদেশী সংবাদপত্র রাখা হয় সেখানে কেবল বাছা বাছা লোকেরাই যেতে পারে। ট্রট্স্কী কিম্বা বুখারিনের বই অথবা স্টালিনের সঙ্গে যাদের মতানৈক্য হয়েছে তাদের বই কিনতে কিম্বা ধার করে পড়তে দেওয়া হয়না। অনেক বাধা নিষেধ পার না হয়ে আর সরকারী কাজ ছাড়া কোন সোভিয়েট

লেখক, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পবিদরা ভ্রমণ করতে পারেন না এবং তখনও কেন তাঁদের চারদিকে থাকে কড়া পাহারা? সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কেন দেশের লোককে বিদেশে যেতে দিতে চাননা আর কেনই বা বিদেশ থেকে আগত আশ্রিতদের গ্রহণ করতে চাননা? রাশিয়াতে বাছা বাছা খুব অল্প সংখ্যক লোককেই কেন বিদেশীদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হয়? ক্রেমলিনের কি ভয় পাছে বিদেশীরা দেশের লোকদের খারাপ করে দেয়? এদের কি দেশের লোকের ওপর আস্থা এতই কম? বিদেশীদের মতামতের ওপর দেশের লোকের প্রভাব পড়ুক তাই বা কেন তারা ভাবতে পারে না?-

১৯৪৫ সনের ৬ই জুন তারিখে বৃটীশ পার্লামেণ্টের সদস্য কমাণ্ডার কিং-হল তাঁর গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন সপ্তাহে ক'বার রাশিয়া থেকে ইংরেজীতে বৃটেনের জন্য বেতার-বার্ত্তা প্রচার করা হয়: এবং রাশিয়ান ভাষাতে রাশিয়ার জন্য কতবারই বা বেতার-বার্ত্তা প্রচার করা হয়ে থাকে। মিঃ লয়েড বৃটীশ প্রচার বিভাগের হয়ে জবাব দিতে গিয়ে হাউস অব কমন্সে বলেছিলেন, "সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সপ্তাহে তেপ্পান্ন বার ইংরেজীতে বেতার-বার্ত্তা প্রচার করা হয়েছিলো। অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য বি বি সি থেকে রাশিয়ান ভাষাতে কোন বেতার-বার্ত্তা প্রচার করা হয়নি।"

সব দেশের জন্য সব ভাষাতে 'বি বি সি' থেকে বেতার যন্ত্রে সংবাদ প্রচার করা হয়। রাশিয়ার জন্য কোন ঘোষণার ব্যবস্থা নেই তার কারণ এই যে ক্রেমলিন তার নাগরিকদের বিদেশী বেতারবার্ত্তা শুনতে দিতে চায়না। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ছাড়া অন্যান্য লোকদের শক্তিশালী বেতারযন্ত্র রাখতে দেওয়া হয়না যা দিয়ে তারা বিদেশী খবর শুনতে পারে, এবং সোভিয়েট বেতার কেন্দ্রগুলো 'বি বি সি'র খবর ঘোষণা করতে চায়না। ইংরেজরা

সোভিয়েটের তেপ্পান্নটি বেতারবার্ত্তা শুনতে পারে আর স্টালিন তাঁর লোকদের বিশ্বাস করে বৃটিশ বেতারবার্ত্তা শুনতে দিতে চাননা।

রাশিয়ার একনায়কত্ব লোকের মনে যতদূর সম্ভব এ বিশ্বাস জন্মাতে দিতে চান যে বিদেশী গভর্ণমেন্টগুলো সোভিয়েটের বিপক্ষে। এজন্যই এরা কোন সময়ই বৃটেন ও আমেরিকার ঋণ-ও-ইজারার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেনি: বিদেশী গভর্ণমেন্টগুলো যদি মিত্রই হয়ে থাকে তাহলে রাশিয়াতে এত চাপাচাপি, ভীতি, সন্দিগ্ধতাই বা কেন ?

একনায়কত্ব অতি দুর্ব্বল শ্রেণীর গভর্ণমেন্ট। স্বাভাবিক শান্ত অবস্থাতে গণবিপ্লব দ্বারা বর্ত্তমান যুগের কোন গভর্ণমেন্টকেই কাবু করা যায়না। এ সত্ত্বেও একনায়কত্ব শঙ্কাগ্রস্থ। একনায়ককে গদিচ্যুত করতে চায় এমন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃ যদি না থাকে তা'হলে জনসাধারণের কাছ থেকে একনায়কের ভয় পাবার কিছু নেই। সেজন্যই স্টালিনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে নেতৃত্বের। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে ফেলে স্টালিন সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসেছেন, এবং যারা তাঁর কাজে বাঁধা জন্মাতে পারে কিম্বা তাঁকে সরিয়ে ফেলতে পারে এধরণের লোক—যারা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে—তাদের তিনি সমানে কয়েক বছর ধরে ধ্বংস করে যাচ্ছেন। সে সঙ্গে তিনি তাঁর নিম্নপদস্থ লোকদের কাছ থেকে আনুগত্য এবং নিষ্ঠা পাবার জন্য অনেক কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করেছেন।

রাশিয়ার মত দেশে যেখানে বহু বছর কঠিন জীবনযাত্রা চলে এসেছে, যেখানে ভবিষ্যতেও এরকমই থাকবার সম্ভাবনা আছে প্রচুর, সেখানে অর্থপুষ্ট উচ্চশ্রেণীর ম্যানেজার, সামরিক কর্ম্মচারী, গুপ্তচর এবং নির্বীর্য্য বুদ্ধিজীবি শ্রেণী, যারা উপকার পেয়েছে এবং পাবার প্রতিশ্রুতিতে গভর্ণমেন্টের প্রতি আসক্ত, তারাই আত্মপ্রত্যয়হীন সর্ব্বেসর্ব্বা শাসকের সান্ত্বনা ও গৌরব।

জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের প্রতি মানুষ তখনই অনাসক্ত হতে পারে যখন তাদের কাছ থেকে সে দূরে থাকে। সোভিয়েটে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যে সুখ সুবিধা ভোগ করে তার ফলে দু'রকম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—একটা হচ্ছে তাদের জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে রাখা আর একটা হচ্ছে সামরিক নিয়ম কানুনের প্রতি তাদের আসক্ত করা।

উচ্চ জীবনযাত্রাপ্রণালী গণতন্ত্রের সহায়তা করে। নিম্নশ্রেণীব জীবনযাত্রাপ্রণালী চিরকালই অল্পসংখ্যক লোকের ও কুলীন সম্প্রদায়ের শাসন এবং একনায়কত্বের সহায়তা করেছে। চীন, আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাশিয়া সম্বন্ধেও একথা খাটে।

রাশিয়ার নব্য কুলীন সম্প্রদায়ের কি করে সৃষ্টি হয়েছিলো তা' জানতে পারা যায় সেখানকার সামরিক শ্রেণীর সৃষ্টির ইতিহাস থেকে। প্রতি সেনাদলেই সামরিক কর্ম্মচারী আছে এবং লালফৌজেও প্রথম থেকেই ছিল। লালফৌজে অফিসাব ও সাধারণ সৈনিকের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, বোধহয় ১৯৩৫ সনের আগে পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে কোন সেনাদলের তুলনায় সব চেয়ে কম পার্থক্য ছিল। আমূল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় তারপর।

লালফৌজের অফিসারের শ্রেণীবিভাগ তার কার্য্যকরিতা থেকে নির্ণিত হতো; যেমন পল্টনের দলপতি কিম্বা রেজিমেন্টের দলপতি কিম্বা আর কিছু। ১৯৩৫ সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে লালফৌজের অফিসারদের পদবী দেওয়া হয়: যেমন লেফটেনেণ্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্ণেল, কিন্তু বিশেষ করে জেনারেল-এর পদ কাউকে দেওয়া হয়নি। এর তাৎপর্য্য বোঝা কঠিন নয়। যেদিন এ পরিবর্ত্তন ঘোষণা করা হয়েছিলো সেদিন বহু বিপ্লবাত্মক গ্রন্থ-প্রণেতা ও 'রোর

চায়না' 'চাইনিজ টেষ্টামেণ্ট'এর সোভিয়েট লেখক সার্জি ট্রিটিয়াকোভের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়েছিলো। ট্রিটিয়াকোভ এ পরিবর্ত্তন সমর্থন করেছিলেন কিন্তু এর কার্য্যকরিতা সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারেননি। সরকারী দপ্তর থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছিলো তা নেহাতই সোজা কথায় বলা হয়েছিলো; কোন কারণ দেখানো হয়নি। শান্তিপ্রিয় নাগরিক টিট্রিয়াকোভ (যদিও গুলিতে তিনি নিহত হয়েছিলেন) কিছু অনুধাবন করতে না পেরেও, তা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অফিসারদের পদবী সম্বন্ধে তিনি একথাই শুধু বলতে পেরেছিলেন যে সমস্ত বিদেশী সৈন্যদলেই তা আছে।

মস্কোর মেট্রোপোল হোটেলের রাস্তায় হাটতে হাটতে আমি তাঁকে বলেছিলাম, "এটা তো ১৯১৮ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাবরই চলে আসছে, তাহলে এখন কি জন্য এ পবিবর্ত্তন? হঠাৎ কেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণ করার প্রয়োজন হলো?"

আমি বলেছিলাম, অফিসারদের পদবী বিশেষ করে কর্ণেল-পদবীব বিশেষ একটা তাৎপর্য্য আছে রাশিয়ায়। তা রাশিয়ার প্রাচীন সাম্রাজ্যিক ধারাবাহী জারতন্ত্রকে ইঙ্গিত করে, আব বোঝায় প্রাক্-বিপ্লবেব কর্ম্মকর্ত্তাদের যারা ছিলো সাধারণ সৈনিকের সর্ব্বেসর্ব্বা, প্রভু।

"লালফৌজে তা সম্ভব হবেনা কখনও", ট্রিটিয়াকোভ জোর দিয়ে একথা বলেছিলেন।

তিনি বুঝতে পারেননি, সামান্যতম ব্যাপারও কতদূব পর্য্যন্ত গড়াতে পারে।

১৯৪০ সনের ৭ই মে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ 'জেনারেল' ও 'অ্যাডমিরাল' পদবীর ব্যবস্থা করলেন। স্টালিন ধীরে ধীরে কাজ গুছিয়ে নিতে সিদ্ধহস্ত; তিনি ধারাবাহিকভাবে কার্য্যপ্রণালী

চালু করেন। ১৯৩৫ সনে কর্ণেল পদবী পর্য্যন্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছিলো। তারপর সাধারণের প্রতিক্রিয়া যাতে ধীরে ধীরে কমে যায় সে উদ্দেশ্যে তিনি কিছু সময় নিয়েছিলেন। ১৯৪০ সনে 'জেনারেল' ও 'অ্যাডমিরাল'এর পদবী সৃষ্ট হলো।

১৯৪০ সনের ২১শে জুলাই যে আদেশ জারী হলো তাতে জেনারেলের জন্য ব্যবস্থা হলো সুন্দর সোনার বোতাম, সোনা ও রূপোর বেণী আর স্কন্ধবদ্ধ সুন্দর পোষাকের।

১৯৩৬ সনে নৌবিভাগীয় বড়কর্ত্তা নিকোলাই কুজ্‌নেৎশভের সঙ্গে আমি স্পেনে পরিচিত হয়েছিলাম, তখন তাঁকে আমি জানতাম নিতান্তই একজন সাধাসিধে, গণতান্ত্রিক ভদ্রলোক বলে; ১৯৪০ সনের ১০ই আগষ্ট তিনি এক আদেশ জারি করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিলো যে নাবিকেরা আর এখন সরাসরি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে কথা বলবেনা, নিম্নপদস্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে যারা তাদের উচ্চে, তাদের কাছেই যা কিছু বলবার বলবে। লাল নৌফৌজের মধ্যে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী যে বন্ধুত্বের ভাব ছিলো, যে সমতা ছিলো, তা অন্তর্হিত হয়ে গেলো। কাজের সময় কিম্বা প্যারেডের সময়ের বাইরে, সবসময় একটা নতুন অনমনীয়ভাব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সাধারণ কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাকৃত নিয়মানুবর্ত্তিতা এখন অন্তর্হিত।

১৯৪০ সনের ১২ই অক্টোবর দেশরক্ষা বিভাগের কমিশার টিমোসেঙ্কো "লালফৌজের জন্য নতুন নিয়মানুবর্ত্তিতা আইন" জারি করেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই আইন মস্কোর প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'প্রাভদা', অথবা 'ইজভেস্তিয়া' প্রকাশ করেনি। কিন্তু চার দিন পরে লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল কুর্দ্দিউমোভ 'প্রাভদা'তে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "এ আইন নিম্নতন কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে সেনানায়কের প্রতি অপত্তিহীন বাধ্যতা দাবী

করে। নিম্নতন কর্ম্মচারীর কাছে তার সেনানায়কের আদেশই আইন।....কোন অসুবিধা কিম্বা দুঃখ কষ্টকেই সেনানায়কের আদেশ অনুসারে কাজ না করবার কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারেনা। নিয়মানুবর্ত্তিতা যেখানে নিন্দনীয়ভাবে ব্যাহত হয়েছে সেখানে সেনানায়ক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে এবং প্রয়োজন হলে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য নিতেও ইতস্তত করবেনা।...অধিকন্তু, কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা এ অপরাধ দমন করতে গিয়ে ফলাফলের জন্য সেনানায়কের কোন দায়িত্ব নেই।" লালফৌজের সেনানায়কেরা প্রহারের সাহায্যে কিম্বা গুলি করেও নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করতে পারে।

১৯৪০ সনের ১৬ই অক্টোবরের "প্রাভদা"তে জেনারেল কুর্দ্দিউমোভ আরো লিখেছিলেন—"নরম হওয়া অথবা সেনাবিভাগীয় আইন-অমান্য করাকে সহৃদয়তার সঙ্গে দেখা—কোনোটিতেই সেনানায়কের অধিকার নেই......নিম্নতম কর্ম্মচারী সম্বন্ধে মিথ্যা গণতান্ত্রিকতাকে উৎসাহের সঙ্গে সমূল উচ্ছেদ করতে হবে।"

এই "মিথ্যা গণতান্ত্রিকতা"কেই চিরকাল খাঁটি গণতান্ত্রিকতা বলে মনে করা হতো; বলশেভিক এবং তাদের বিদেশী প্রশংসাকারীরা একেই কয়েক বছর পর্য্যন্ত তাদের বিপ্লবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছে। এমনকি আমি নিজেও কিছুদিন তা করেছি। বাস্তবিকই এটা গর্ব্বের বিষয় ছিল। কিন্তু সে বিপ্লব অতীত জারতন্ত্রের কাছে নিজকে বিকিয়ে ফেলেছে।

১৯৪৩ সনের ৭ই জানুয়ারী সোনা ও রূপোর কাজ করা স্কন্ধবন্ধ পোষাকই সোভিয়েট উচ্চ কর্ম্মচারীদের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। লালফৌজের দৈনিক সংবাদপত্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলো—"আমাদের পিতা এবং পিতামহরে যা সামরিক এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা বৃদ্ধি করতো, আমরা, রাশিয়ার সামরিক গৌরবের উত্তরাধিকারীরা, তাঁদের কাছ থেকে যা ভাল তার সব কিছুই নিচ্ছি।"

১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে স্টালিন "রাশিয়ার সামরিক গৌরব" সম্বন্ধে ঠাট্টা করে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। "রাশিয়ার অতীত ইতিহাস" তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "এ কথাই বলে যে আমাদের দেশ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়েছিলো পিছিয়ে পরে থাকার জন্যই। আমরা মোগল খাঁদের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলাম; তুরস্কের নায়করা আমাদের পরাজিত করেছিলো, পরাজিত করেছিলো সুইডেনের জায়গীরদাররা; পোলাণ্ড ও লিথুয়েনিয়ার জমিদারদের দ্বারাও পরাজিত হয়েছিলাম আমরা; ইংরেজ ও ফরাসী ধনতান্ত্রিকরা আমাদের পরাজিত করেছিলো; আর পরাজিত হয়েছিলাম জাপানী উচ্চশ্রেণীর দ্বারাও।"

বার বছর পরে জারের রাশিয়ার ত্রুটি বিচ্যুতিই এসে দাঁড়িয়েছিলো "গৌরবে"। একনায়কের হাতে ইতিহাস বাস্তবিকই খেলার সামগ্রী।

১৯৪৩ সনের ৬ই জুন তারিখে সাইরাস, এল, সাল্‌ৎস্‌বার্জ্জার মস্কো থেকে "নিউ ইয়র্ক টাইমস্"-এ খবর পাঠিয়েছিলো: "বেল ষ্টেশনের কাছাকাছি ছাড়া উচ্চ কর্ম্মচারীদের এখন আর জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে যেতে হয়না। এখন উচ্চ কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ বাঁ হাতে ছোট সামান্য রকমের পুঁটলী ছাড়া আর কিছুই বয়ে নিয়ে যায়না।" কিপ্‌লিংয়ের ভারতবর্ষেও উচ্চ কর্ম্মচারীরা বোঝা বয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের সম্মানের হানি করেনি।

সাল্‌ৎস্‌বার্জ্জার আরও লিখে পাঠিয়েছিলো, "বয়োজ্যেষ্ঠ উচ্চ কর্ম্মচারীরা যখন সাধারণ যানবাহনে চলা ফেরা করে তখন যদি তারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের বিনা অনুমতিতে অল্পবয়সের উচ্চ কর্ম্মচারীরা তখন বসতে পারেনা।....শেষ পর্য্যন্ত, দলনায়কের থেকে আরম্ভ করে সকল উচ্চ কর্ম্মচারীর জন্য সমানভাবে আর্দ্দালীর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সরকারীভাবে এটাকে এভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছিলো যে

'পিটার দি গ্রেট'ই প্রথম আর্দ্দালী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন—যার কাজ হচ্ছে উচ্চ কর্ম্মচারীদের পোষাকপরিচ্ছদ ও খাওয়া-পরার তত্ত্বাবধান করা।...”

তারপর এ নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল ফলে : ১৯৪৩ সনের ২৪শে জুলাই তারিখে, সরকারী এক ঘোষণাতে বলা হয় যে পদোন্নতির জন্য কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শনকেই একমাত্র কারণ বলে গণ্য করা হবেনা। এখন থেকে বিশেষ সামরিক বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদেরই পদোন্নতি হবে।

১৯৪৩ সনে সোভিয়েট সরকার জার আমলের ফিল্ড মার্শাল কাউণ্ট সুভোরভের (১৭২৯-১৮০০) নামে স্কুল স্থাপন করলেন, যেখান থেকে ছেলেরা সেনানায়কের জীবন সুরু করবে। ১৯৪৩ সনের ৭ই নভেম্বর র‍্যাল্‌ফ্‌ পার্কার "নিউ ইয়র্ক টাইমস" কাগজে লিখেছিলেন "জারের আমলের সামরিক স্কুলের পদ্ধতিতে এদের গঠন করা হয়েছিলো"...."যুদ্ধে যে সব সামরিক কর্ম্মচারী মারা গিয়েছে তাদেরই বংশধরেরা এসব স্কুলে স্থান পাবে।..." উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারীর বংশধরেরাই স্থান পাবে, সাধারণ সৈনিকের বংশধরেরা নয়। এভাবেই সামরিক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। ১৯৪৫ সনের ৭ই নভেম্বর, সুভোরভের অনূর্দ্ধ বারো বছরের ছাত্ররা সোভিয়েট ইতিহাসে প্রথমবারের মত লালফৌজের সঙ্গে রেড স্কোয়ারে কুচকাওয়াজ করেছিলো।

ক্যালিলিন সহরের কাছে এক সুভোরভ স্কুল পরিদর্শন করে মরিস্‌ হিণ্ডাস্‌ ১৯৪৩ সনের ১৬ই মে তারিখে হেরাল্ড-ট্রিবিউন্‌ পত্রিকার জন্য লিখে পাঠিয়েছিলেন, "নাচ, বলরুম, এবং সামাজিক নৃত্য খেলাধুলার মতই তাদের স্কুল-জীবনের একটি অঙ্গ।" র‍্যাল্‌ফ্‌ পার্কারও ঠিক এ ভাবেই লিখেছিলেন যে সোভিয়েট নৌবিভাগীয় দৈনিক সংবাদপত্র রেড ফ্লিট "সম্প্রতি এই বলে পরামর্শ দিয়েছিলো

যে ভবিষ্যকালের নৌবিভাগীয় কর্ম্মচারীদের নাচ শেখা উচিত।... তারাই হবে ভবিষ্যৎ সোভিয়েটের মননশীল শ্রেণীর প্রতিভূ, সুতরাং সমাজে কিভাবে চল্‌তে হবে তা তাদের জেনে রাখা উচিত।" কিন্তু কোন "সমাজে ?"

পার্কার আরও লিখেছিলেন, "রেড স্টারের উক্তি অনুসারে সোভিয়েট উচ্চ কর্ম্মচারীরা "রাশিয়ার অফিসারদের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে অনেক কিছুই দেখতে পায় যা থেকে তারা তাদের সামরিক শক্তির উৎস এবং প্রসার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। রাশিয়ানদের আজকাল মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, উচ্চ কর্ম্মচারীর 'প্রকৃত সম্মান' সম্বন্ধে প্রথম ধারণা জন্মেছিলো" পিটারের সময়েই। বর্ত্তমান রাশিয়াতে প্রাচীন রাশিয়ানদের মধ্যে লেনিনকে বাদ দিলে বোধ হয় পিটারের প্রভাবই সব চেয়ে বেশী।" যে পিটার দি গ্রেট ১৬৯৪ থেকে ১৭৭৫ সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করে, নগর আর সৌধ তৈরী করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন হনন করেছিলেন, আজ তাঁরই কাছ থেকে কমিউনিষ্ট রাশিয়া 'প্রকৃত সম্মান' সম্বন্ধে ধারণা করে নিচ্ছে।

১৯৪৫ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর ব্রুক্‌স্ অ্যাট্‌কিন্‌সন্ মস্কো থেকে "নিউইয়র্ক টাইমস"-এ তারযোগে খবর পাঠিয়েছিলেন, "লালফৌজের ক্লাব এখন উচ্চ কর্ম্মচারীদের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য থাকবে।" সকলেই ক্লাবের সুবিধা ভোগ করতে পারতো। লালফৌজের অনেকগুলো ক্লাবই সুন্দরভাবে তৈরী এবং সুসজ্জিত, এগুলো সোভিয়েট রাজ্যের অসংখ্য সহরে অবস্থিত এবং পূর্ব্বে উচ্চ কর্ম্মচারী ও সাধারণ সৈনিকেরা এর সুবিধা সমান ভাবেই ভোগ করতে পারতো। কিন্তু লালফৌজের সৈনিকেরা, যারা নোংরা পোষাক পরিচ্ছদ ও অল্পদামের জুতো পড়ে এবং সামান্য খেতে পড়তে পারে, তারাই হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর "শ্রমসর্ব্বস্বের দল", তারাই বঞ্চিত।

'রেড ষ্টার' লিখেছিলো : "গভর্ণমেণ্ট এবং পার্টি জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীদের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন।"

যে হলে সোভিয়েট-আমেরিকার চেস্ খেলাতে সোভিয়েটপক্ষীয় খেলোয়ারেরা যোগদান করেছিলো সে হলের বিবরণ দিতে গিয়ে ১৯৪৫ সনের ২রা জুন তারিখে "ইস্‌ভেস্তিয়া" লিখেছিলো : "দর্শকদের মধ্যে অনেক উচ্চ কর্ম্মচারীও ছিলেন।" সাধারণ সৈনিকদের কথা বলা হয়নি। দশবছর আগে এটা হয়তো সোভিয়েট সংবাদপত্রের পক্ষে অসম্ভব ছিলো। এবং তাকে সোভিয়েট-বিরোধী বলেই গণ্য করা হতো। এ-ই হলো খাঁটি সত্য কথা।

মেজর জেনারেল জন, আর, ডীন্, যিনি যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মিশনের প্রধান কর্ত্তা হিসাবে দু'বছর মস্কোতে ছিলেন, মস্কো থেকে ফিরে এসে ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে নিউইয়র্কের এক সভাতে বলেছিলেন : "উচ্চ কর্ম্মচারী এবং সাধারণ সৈনিক, এমনকি সকল শ্রেণীর সামরিক কর্ম্মচারীর মধ্যে (লালফৌজে) যে পার্থক্য তা বোধহয় পৃথিবীর যে কোন সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত পার্থক্যের চেয়ে বেশী।

সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার, দলের নেতা, উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী এবং কারখানার ডিরেক্টার সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার চেয়ে অনেক উন্নত জীবন যাপন করে। 'লাইফ' পত্রিকাতে জন্ হেরেসি লেনিনগ্রাডে পুটিলভ্ লৌহ কারখানার ম্যানেজার নিকোলাই পুজিরেভের সঙ্গে সাক্ষাতের এক বর্ণনা দিয়েছিলেন। পুজিরেভ জনবহুল শহরে চারখানা ঘর নিয়েছিলেন। চারজনের এক একটি পরিবার তখন এক একটি ঘরের মধ্যে বসবাস করত। তাঁর ব্যবহারের জন্য ছিল একটা সৌখিন মোটর গাড়ি, একজন মোটর চালক আর একটা বড়

ডগ্‌লাস্‌ডিসি (তিন) উড়োজাহাজ। বিলাস-ভ্রমণের জন্য নৌকো, একটি পল্লীগৃহ, ছু'জন চাকর, যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় পেতেন তিনি। তাছাড়া থিয়েটার ও অপেরায় সব চাইতে ভালো সীটের ব্যবস্থা থাকতো তাঁর জন্য।

১৯৩২ সনে আমি এক সপ্তাহের জন্য পুটিলভ কারখানাতে ছিলাম, এবং ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত প্রতিবছরই গ্রীষ্মকালে কি কি পরিবর্ত্তন হয়েছে তা দেখতে যেতাম। আমি সেখানকার ডিরেকটার, ইঞ্জিনিয়ার, পার্টির কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের সবাইকে চিনতাম। ১৯৪৪ সনে রুশ-জার্ম্মানের ভয়াবহ যুদ্ধের সময়ে পুজিরেভের যে সৌখিন জীবন-যাপন প্রণালী ছিল শান্তির সময়েও তা পাওয়া অসাধ্য।

পুঁজিবাদ দারিদ্র্যের পাশে পাশে সৌখিন জীবন যাপনের সাহায্য করে। রাশিয়াতে উচ্চ ও নীচের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অনৈক্য আরও বেশী অর্থহীন, কারণ সেখানে উপরের শ্রেণীর লোকদের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বন্ধু হিসাবে ধরা হয়। ঐক্য হয়তো অবাস্তব কিম্বা অশোভন কিন্তু যেখানে বলশেভিবাদ-জাত শাসন-ব্যবস্থা দরিদ্র এবং ধনীর মধ্যে সমানে পার্থক্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছে সেখানে মনে করতে হবে যে বিপ্লব অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে।

যাহোক, সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একনায়কের সঙ্গে সাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবিহীন লোকের যে পার্থক্য তার তুলনায় উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছুই নয়। বলশেভিক রাশিয়ার মত কোন দেশেই সরকারী-ক্ষমতা এমনভাবে কেন্দ্রীভূত নয়।

স্বৈরাচার জনপ্রিয়ও হতে পারে। জনসাধারণ তা তৈরী করতে পারে, তৈরী করতে পারে জনসাধারণের জন্যই। জনসাধারণ শুধু গণতন্ত্রই সৃষ্টি করতে পারে। সমাজতন্ত্র অর্থহীন হয় যদি রাষ্ট্র-পরিচালনায় জনগণের কোন হাত না থাকে। লেনিন বলেছিলেন, "প্রত্যেক পাচকই

গভর্ণমেণ্টকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা রাখবে।" প্রত্যেক পাচক, প্রত্যেক খনির শ্রমিক, প্রত্যেক ছ্যাকড়া গাড়ীর চালক, প্রত্যেক কৃষকই বলশেভিক বিপ্লবে সহায়তা করেছিলো, কারণ তারা মনে করেছিলো যে এটা তাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট এবং এর পরিচালনায় তাদেরও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। শাসনক্ষমতাযুক্ত সোভিয়েট, স্থানীয় কমিটী অথবা কাউন্সিলগুলোকে রাষ্ট্রের প্রধান সদস্য সংখ্যার নিমিত্ত বলে মনে করা হতো। অন্য সব কিছুর চেয়ে এমনকি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের চেয়েও সোভিয়েটই বিপ্লবের জন্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলো বেশী। স্বাভাবিকভাবেই লোকেরা বুঝতে পেরেছিলো, গভর্ণমেণ্ট তাদের যা দিচ্ছে সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় লাভ নয়, লাভ বরং তাদের গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করবার অধিকারটাই।

১৯২৩ সনে আমি মস্কোর কাছে একটা ছোট শহর দেখতে গিয়ে স্থানীয় বিচারকের বাড়ীতে কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলাম। বলশেভিবাদে শ্রদ্ধাহীনা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিপ্লবের ফলে কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

"লোকেরা বেশী কথা বলে", তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন।

এটাই হচ্ছে তাদের প্রধান সাফল্য। আলোচনায় কাজ হবে মনে করে লোকেরা তাদের সমস্যার আলোচনা করতো।

বিপ্লবের গোড়ার দিকে প্রেরণার বস্তু ছিলো একটা বিরাট অনুভূতি।

অতীতকে ধ্বংস করাই ছিলো এ প্রেরণার উৎস। আশাই একে বড় করে রেখেছিলো। প্রধানতঃ আমার মনে হয়, সমাজের সঙ্গে মানুষের একত্ববোধের অনুভূতি থেকে তার জন্ম এবং এজন্য সে সমাজের হয়েই বাস করতো আর তাইতেই সে তার আপন সত্তার ঊর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলো।

১৯১৭ সনের পরে কয়েক বছরের মধ্যে কমিউনিষ্টরা সোভিয়েটকে সম্পূর্ণ অধিকারে নিয়ে আসে এবং প্রাদেশিক রাজধানী এবং মস্কোর আদেশ অনুসারে কাজ চলতে থাকে। সোভিয়েট আজ ক্রেমলিনের ক্রীড়নক এবং এজন্যই ,সাধারণের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বড় বেশী সম্পর্কচ্যুত। সোভিয়েটের নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা এখন নিতান্তই সাধারণ ব্যাপাব এবং কমিউনিষ্টদের কেউ বাধাও দেয়না।

কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েটের ভাগ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ শুরু হল।

বিপ্লবের গোড়ার দিকে কমিউনিষ্ট পার্টিতে কমিউনিষ্টদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিলো। ১৯১৮ সনে কাইজারের জার্ম্মানীর সঙ্গে নবীন সোভিয়েট-শাসনের ব্রেষ্টা-লিটোভস্ক-চুক্তি আলোচনাকালে সোভিয়েট সরকার খুবই দুর্ব্বল ছিল। বিপদ ভেতরেই ছিল এবং জার্ম্মান শক্তি রাশিয়া আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুতও ছিল। তাছাড়া তখনকার সেই জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে একদল কমিউনিষ্ট নেতা, বিশেষ করে রাডেক কলোনটাই এবং ওসিনস্কি, সাম্রাজ্যবাদী জার্ম্মানীর সঙ্গে লেনিনের শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ কাববাব জন্য মস্কো থেকে 'দি কমিউনিষ্ট' নামে একটা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলো।

কয়েকবছর বাদে বুখারিন ও অন্যান্যদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট বৈঠকে লেনিনের প্রবল বাগবিতণ্ডা হয়। কিন্তু বুখারিনকে মতানৈক্যের জন্য আক্রমণ করেও তিনি স্নেহের সঙ্গে তার গলায় হাত দিতে পারতেন, 'বুখাস্কা' বলে ডাকতে পারতেন। লেনিন ও ট্রট্স্কি বিপ্লবের আগে অনেক সময়ই মতবাদ ও কার্য্যপন্থা নিয়ে ঝগড়া করেছেন। বিপ্লবের পরে তাঁরা দুজন একত্র হয়েই আবার কাজে লিপ্ত থেকেছেন।

লেনিন বিরুদ্ধবাদী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তর্ক করতেন এবং আলোচনা কালে তাদের হারিয়েও দিতেন। এমন কতগুলো স্বকীয় গুণ ছিল তাঁর যার জোরে তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গেও একত্র কাজ করতে পারতেন। স্টালিন কখনও ট্রট্স্কি আর জিনোভিয়েভকে তর্কে হারাতে পারেননি, পেরেছেন বন্দী করতে।

১৯১৭ সন থেকে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত 'জিপিইউ'-এর প্রধান কাজ ছিলো বিপ্লবের যারা শত্রুতা করেছে তাদের ধ্বংস করা। ১৯২৭ সনে স্টালিনের আদেশ অনুসারে 'জিপিইউ' এমন কাজ করতে আরম্ভ করলো যা বলশেভিক-ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। কমিউনিষ্টদের ধ্বংস করার কাজেও তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিলো। ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে যখন 'জিপিইউ'র অনুচরেরা ট্রট্স্কিকে তাঁর মস্কোর বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো (হেঁটে যেতে তিনি আপত্তি করেছিলেন) তখন স্টালিন-পরিচালিত কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মতবাদের বৈষম্য ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কেউ আন্‌তে পারেন নি। পার্টির গোলযোগের ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজে লাগানোর কথা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনা। কিন্তু এর পর থেকে এটা সাধারণ ব্যাপারই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির ভেতরে আলোচনা এখন অনাবশ্যক বলে গণ্য হয়। স্টালিনের রাশিয়াতে 'জিপিইউ' অনুচরদের পিস্তলকেই এখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলে মনে করা হয়ে থাকে।

ট্রট্স্কি, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের মত বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের মতবাদ প্রচার করবার জন্য আগে একবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। তাঁরা বই এবং প্রবন্ধ লিখে সোভিয়েট নেতা এবং তাদের কার্য্যাবলীকে আক্রমণ করতে পারতেন। কমিউনিষ্ট পার্টির সভা সমিতির আগে, পার্টির মুখপত্র মস্কোর 'প্রাভদা' একটা বিশেষ 'আলোচনা পত্র' ছাপাতো, যেখানে বিরুদ্ধবাদীরা

তাদের মতবাদ প্রচার করতে পারতো। এখন কোন পার্টি-সভ্যই নিজেকে বিরুদ্ধবাদী বলে প্রচার করতে সাহস পায়না এবং গভর্ণমেণ্টকে সমালোচনা করবাব অধিকাবও পেতে চায়না।

কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা কয়েক লক্ষের ওপব এবং ইচ্ছা করলে সে সংখ্যা আরও বেশী কবা যেতে পাবে, কাবণ এটা হচ্ছে সোভিয়েট যন্ত্র, কিন্তু সভ্যসংখ্যা কমিয়ে বাখা হয়েছে। সাধাবণ সভ্যরা কোনো বড় যন্ত্রের বিশেষ এক একটা অংশেব মত। স্টালিন নিজেও পার্টিকে বিছু জানাতে কিম্বা কোন বিছু তাদেব সঙ্গে আলোচনা করতে চাননা। ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত যুদ্ধ এবং গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও পার্টি বছবে একবাব কবে জাতীয় মহাসভা আহ্বান কবেছে। তারপব স্টালিন একনায়ক হযে বসেন। দুই বৎসবেব ব্যবধানেব পর ১৯২৭ সনে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয, ষষ্ঠদশ ১৯৩০ সনে, সপ্তদশ ১৯৩৪ সনে এবং অষ্টাদশ ১৯৩৯ সনে। বহিষ্কবণ নীতিব ফলে সোভিয়েটে কমিউনিস্ট পার্টিব প্রভাব ও প্রতিপত্তি ব্যাহত হয়েছিলো। যেহেতু প্রধান প্রধান কমিউনিষ্টরা "ফাসিষ্ট" অথবা "বিদেশী সবকাবেব অনুচব" হতে পাবে সেহেতু লোকেবা ভাবতো, যাদেব গায়ে আঁচড় লাগেনি তাবাই যে ভালো এ কথা বা কি করে মনে করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে যাবা একবছর পার্টি সংশোধনেব কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলো তাদেরই আবাব বহুবকাল পরে বিচার হয় এবং তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি এখন একনায়কেব স্বেচ্ছাধীন যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নগুলোও আগে বিনা বাধায় আলোচনা করতে পারতো। বহুল প্রচারিত খনির শ্রমিকদের ফেডারেশন এবং কাপড়েব কলের শ্রমিকদের এবং আরও অনেকের বার্ষিক অধিবেশন হতো এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও বার্ষিক

অধিবেশন হতো। ১৯৩২ সনে শেষবারের মত সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গিয়েছে।

প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যরা কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে খোলাখুলি ভাবে একটা আপোষ নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা করতো যা পরের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চলতো, আবার পরে আর এক দফা মীমাংসা হতো। ১৯৩১ সনে শ্রমিক নিযুক্ত করা কর্ত্তৃপক্ষেরই একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে এসে গিয়েছিলো। ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী মাসে সামান্য কয়েকটা আপোষ নিষ্পত্তির রফা আবাব চালু করা হয়েছিলো; ১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে আরও কম হয়েছিলো, ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে তা খুবই সামান্য ছিলো। ১৯৩৬ সনে একেবারেই ছিলনা। ১৯৩৬ সনের আপোষ নিষ্পত্তির পরে আর সোভিয়েট রাশিয়াতে কোন রকম আপোষ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। সবকারের কাজের জন্য ট্রেড ইউনিয়নে আমলাতন্ত্রই রয়েছে। এ আমলাতন্ত্র বিদেশী ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনেও যোগ দিতে পারে। কমিউনিষ্ট, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সোভিয়েট শাসনের সুহৃদদের স্বাধীনতা ধ্বংস করার কাবণ বিদেশী আক্রমণের ভীতি নয়। এখন সোভিয়েট সরকার বিরাট শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তার চেয়ে বেশী ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল ১৯১৮ সনে, যখন সোভিয়েট সরকারের শৈশবাবস্থা।

ভেতরের খবর সম্বন্ধে অজ্ঞ সোভিয়েট গুণগ্রাহীরা বলেন যে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত যে বহিষ্করণ ও বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিলো তার সাহায্যে স্টালিন "পঞ্চম বাহিনী"কেই ধ্বংস করেছিলেন। এজন্যই বলা হয় যুদ্ধের সময় রাশিয়ায় কোন ধ্বংসকারী ছিলো না। তাহলে, দেশের শত্রুদের ধ্বংস করার পর এখনও কেন সাধারণকে ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে? সর্ব্বব্যাপী শক্তিশালী গুপ্তচর বাহিনী এখনও কেন রয়েছে?

একথা ঠিক নয়। সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়নের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাহরণ একনায়কত্বের ফলেই ঘটেছিলো (ইটালী এবং নাৎসী জার্ম্মানীতেও ঠিক একই ঘটনার পুনরভিনয় হয়েছে)।

সোভিয়েট রাজনৈতিক ব্যবস্থা পিরামিডের মত বিস্তৃত ছিলো। পিরামিডের মত উচু এবং নীচু আয়তন ছিলো সোভিয়েটের; এর ওপরে ট্রেড ইউনিয়ন; তারপর নীচের দিকে পার্টি; তারপর পার্টির নেতৃত্ব; এবং তারপর পিরামিডের মাথায় আছেন নেতা। ক্রমশঃ স্টালিন পিরামিডকে উল্টো করে ফেলে তার মাথায় চেপে বসেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রশস্ত স্তরগুলো থেকে বেরিয়ে গিয়ে একনায়কত্বে মিশেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, পার্টি এবং পার্টির নেতৃত্ব ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তি, উৎসাহ এবং বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তারা এখন ভীত রবটের মত।

স্টালিনের রাশিয়ায় কেন শ্রেষ্ঠ বক্তা নেই তার যথেষ্ট কারণ আছে। কমিউনিষ্ট পার্টিতে বেশ নামজাদা বক্তা ছিলো। তারা এখন সকলেই গতায়ু এবং দেশের নতুন বক্তারও আর প্রয়োজন নেই। এখন আর কোন রাজনৈতিক আলোচনাও হয়না। সমস্ত রাজনৈতিক বাদানুবাদ আগে থাকতেই পার্টিতে তৈরী হয়ে বক্তাদের কাছে ধরা দেয়। এথেকেই যা বলবার তাই তারা বলে যায় এবং এর বাইরে যায়না কারণ বাইরে যাওয়ার ভয় আছে।

সোভিয়েট নাগরিকেরা যদিও বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক জ্ঞানে পরিপক্ক, তবু তাদের অনেকগুলো "সামাজিক বোঝা" বইতে হয়। তারা লিখন-পঠন অক্ষমতা দূর করে, এশিয়ার মেয়েদের পর্দ্দা তুলে দিতে সাহায্য করে, ছোটদের 'পায়ওনীয়ার'এ (ছেলে এবং মেয়েদের স্কাউট) এ ভর্ত্তি করায়। কারখানা ও অন্যান্য সভাসমিতিতে নানা বিষয়ে আলোচনা করে, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান প্রভৃতি

পরিদর্শন করতে যায়। কমিউনিষ্টরা আমার কাছে আমার মস্কোর বাড়ীতে বসে স্বীকার করেছে যে সোভিয়েটে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের উত্তেজনা মোটেই নেই কারণ প্রত্যেকেই জানে যে সে নিজের ব্যক্তিগত মত কিম্বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ না করে তাকে দিয়ে যা বলান হচ্ছে তাই বলছে কিম্বা 'প্রাভদা'র মতামতই সে প্রচার করে যাচ্ছে।

সোভিয়েট নাগরিকদের, বাস্তবিকই, অন্যান্য উত্তেজনা রয়েছে, যেমন স্টালিনগ্রাডের জয়ের উন্মাদনা, লেনিনগ্রাডের নাগরিকদের বীরত্বের সঙ্গে বাধা প্রদান এবং হিটলারের পরাজয়। এগুলো সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক আদর্শের চাইতে দেশ, নদনদী এবং শহরের প্রতি আকর্ষণের মত মানসিক উত্তেজনা মাত্র। এথেকেই বোঝা যায় বলশেভিক বিপ্লবের কি হয়েছে। যেহেতু তাকে রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি সেইহেতু তাকে জাতীয়করণ করা হয়েছিলো। সাধারণের জন্য রাজনীতি নয়। এই বিপ্লব নবীন সমাজের আদর্শের চেয়ে মানুষের আদিম অনুভূতিকেই বেশী করে আকর্ষণ করেছিলো। জার এবং জারতন্ত্রের সেনানায়কেরাই এখন সমাজসংস্কারক বিপ্লবীদের যায়গায় স্থান পাচ্ছে। এবং সমাজতত্ত্ববিদদের আসর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করছে। পিটার দি গ্রেট কার্ল মার্কসের প্রভাব অনেক কমিয়ে দিয়েছে। স্টালিন দেখলেন যে নতুন আন্তর্জ্জাতিক সমাজব্যবস্থার জন্য মার্কসের মানসিক প্রভাবের চেয়ে পিটারের আদিম রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যই বেশী কার্য্যকরী।

সোভিয়েট জনসাধারণকে পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্য, পোষক পরিচ্ছদ এবং আশ্রয় দিতে অসামর্থ্য হেতু এবং গভর্ণমেন্ট পরিচালনায় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অনিচ্ছুক হয়ে স্টালিন তাদের দিলেন জাতীয়তা এবং যারা চায় ধর্ম্ম তাদের দিলেন ধর্ম্ম। তারপর যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের আনুগত্য তিনি ক্রয় করতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য

তিনি মাদকতাপূর্ণ বিলাস দ্রব্য এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করলেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা এখনও বহাল আছে। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা এখনও বলবৎ আছে। এটা হচ্ছে ওপরের বাধ্যতা, সাধারণের গণ্ডির বাইরে। সাধারণ লোক হচ্ছে একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র লাভ।

সমাজতন্ত্রবাদের কাঠামোই হচ্ছে এর আবরণ কিন্তু আত্মা হয়েছে অন্তর্হিত কারণ স্বাধীনতা এবং আন্তর্জ্জাতিকতা চলে গিয়েছে।

গণতন্ত্রবিহীন সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রীয় একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। আন্তর্জ্জাতিকতা ছাড়া কোন একটি বিশেষ জাতির মধ্যেকার সমাজতন্ত্রবাদকে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ বলা যেতে পারে। এটা হিটলারবাদ নয়। প্রত্যেক দেশেই পৃথক পৃথক জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে ওঠে।

একই দেশে সমাজতন্ত্রবাদের উল্টো সুরে রাশিয়া আজ আটকা পড়ে গেছে। স্টালিন এ সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৩৬ সনের শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ণ করে তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় কারণ তিনি একনায়কত্ব ব্যাহত হতে দিতে চান না এবং গুপ্তচর বিভাগও রহিত করতে প্রস্তুত নন। স্টালিন একনায়ক হওয়ার পর থেকে প্রতিবছরই গণতন্ত্র ম্লানতর হয়ে আসছে। স্টালিন হয়তো মনে করেন যে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমান্ত বিস্তৃত করে এবং অন্যান্য দেশকে সোভিয়েট প্রভাবের মধ্যে টেনে এনে আন্তর্জ্জাতিকতারই বিস্তার করছেন। কিন্তু ছোট ছোট দেশকে ত্রাণ করা, স্বস্তি-পরিষদে ভিটো'র দাবী করা এবং ত্রিশক্তি প্রভুত্ব, এগুলো আন্তর্জ্জাতিকতা নয়, এ হচ্ছে অতি-জাতীয়তাবাদ, যা সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর।

আন্তর্জ্জাতিকতা এবং গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদী একনায়কত্বে টিকতে

পারেনা। সেজন্যই স্টালিনের প্রভাবে সমাজতন্ত্রবাদ থাকতে পারেনা। সমাজতন্ত্রবাদ সেখানে নামমাত্র রয়েছে। জীবনীশক্তি তার ফুরিয়ে গেছে। যারা বন্দীশালায় প্রাণ দিয়েছে এবং যাদের গুলি করে মারা হয়েছে তাদের আত্মাহুতির ফলে প্রাণ গিয়েছে শুকিয়ে।

ল্যাসকিতত্ত্ব

বৃটিশ শ্রমিকনেতা ও প্রচারবিদ হ্যারল্ড, জে, ল্যাস্কি মার্কসীয় জড়বাদে বিশেষ আস্থাবান। সেজন্যই তিনি রাশিয়াকে বুঝতে পারেন না। ল্যাস্কি মনে করেন যে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত দোকানদারীর উচ্ছেদ হলেই সমাজতন্ত্রের স্বর্গীয় সুষমা পাওয়া দেবে। এটা মস্ত ভুল। ব্যক্তিস্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা। ধনতান্ত্রের অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেলেও রাষ্ট্রগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা থাকতে পারে।

ল্যাস্কি মনে করেন যে সরকারের হস্তগত ধনোৎপাদন শক্তি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে রাশিয়ার সব দোষ কেটে গিয়েছে। কিন্তু ভীতিপ্রদ সরকারী অধিকার প্রশংসনীয় নয়।

ল্যাস্কি মানুষকে ভুলে যান। সোভিয়েট যন্ত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি সোভিয়েটের মানুষকেই ভুলে গিয়েছেন।

ধনতন্ত্রবাদের বুদ্ধিমান অগ্রাহ্যকারী যারা ধনতন্ত্রবাদ যাতে ধ্বংস হয় তার সব কিছুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত তাদের মধ্যে ল্যাস্কি হচ্ছেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান। ১৯৪৫ সনের ৩রা ডিসেম্বর নিউইয়র্কে 'দি নেশন' ভোজ সভায় ল্যাস্কি বলেছিলেন, "এটা অর্থপূর্ণ যে কেবল মাত্র নবীন পৃথিবী রাশিয়াতেই ব্যবসায়ীর স্থান নেই।" ঠিক কথা কিন্তু আসলকথা তা নয়। একমাত্র একনায়কেরই সেখানে স্থান আছে, অনেকেরই সেখানে স্থান নেই।

শীর্ণকায় তীক্ষ্ণবক্তা ল্যাস্কি নিজেকে "গোবেচারা পণ্ডিত" বলে ঘোষণা করেন। তিনি কলম পেশতে এমনি পারদর্শী যে সকল

লেখকেরই তিনি ঈর্ষার বস্তু এবং তাঁকে অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। তিনি খুবই উৎসাহের সঙ্গে কর্ম্মপ্রণালী স্থির করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের অতি সহজেই কাৎ করতে পারেন। ফ্যাবিয়ান স্সোসাইটী ও শ্রমিক সভাতে নির্ব্বাচন উপলক্ষে তাঁর মুখরোচক একটি বক্তৃতা আমি শুনেছিলাম। হ্যারল্ড, জে, ল্যাস্কির কমপক্ষে দুটি সত্তা আছে এবং তারা কেউ কারো বন্ধু নয়। দ্রষ্টা ল্যাস্কি যেটা দেখবার সেটা দেখে যান, বিশ্বাসী ল্যাস্কি জটিল তর্ক তুলে 'দ্রষ্টা ল্যাস্কি'কে বুঝিয়ে দেন যে তিনি যা দেখেছেন তা মোটেই ঠিক নয়।

১৯৪৩ সনে ল্যাস্কি "আধুনিক বিপ্লব সম্বন্ধে চিন্তাধারা" নামে একখানা মূল্যবান বই প্রকাশ করেন। এই বইতে সোভিয়েট একনায়কত্বের উগ্রতা ও স্টালিনভীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখেন। ১৯৪৪ সনে ল্যাস্কি "বিশ্বাস, যুক্তি ও সভ্যতা" সম্বন্ধে আর একখানা বই লেখেন এবং তাতে তিনি ঘোষণা করেন রাশিয়ার মতবাদই পৃথিবীর একমাত্র ভরসা যা খৃষ্টধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করবে।

১৯৪৪ সনের আগষ্ট সংখ্যায় "কমন সেন্স" পত্রিকাতে আমি "বিশ্বাস, যুক্তি ও সভ্যতা"র সমালোচনা করেছিলাম। সমালোচনার বিষয় ছিল—"ল্যাস্কির আরও জানা দরকার"। সম্পাদকেরা সমালোচনার এক কপি ল্যাস্কির কাছে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে এর জবাব দিতে বলেছিলেন। তিনি এর জবাবে লিখলেন—"লুই ফিশারের সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব বিনা প্রতিবাদে এ বেত্রাঘাত সে নম্রভাবে স্বীকার করে নেবে।"

হ্যারল্ড ল্যাস্কির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি এবং একথাও নিশ্চয় জানি যে তাঁর রাজনীতির নির্দ্দোষ সমালোচনাতে এ বন্ধুত্বের কোন ক্ষতি হবেনা।

"ল্যাস্কি সামাজিক চিন্তাবিদ্ হিসাবে গোড়াতেই মস্ত ভুল

করেছেন।"—আমি তাঁর বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে একথা লিখেছিলাম। "তিনি পৃথিবীকে রাশিয়াব নতুন শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য বলছেন যখন রাশিয়া নিজেই এগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বেশী করে বুর্জ্জোয়া দেশের পুরাতন শিক্ষাকেই গ্রহণ করছে।"

ল্যাস্‌কি তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন, "পৌত্তলিকতার ওপর খৃষ্টধর্ম্মের জয়ে মানবমনের নবচেতনাই প্রকাশ পেয়েছিলো।...আমার ধারণায় আসেনা যে কেউ আমাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে বিচার করতে পারে যে আমরা আরও কিছু আস্থা চাই যা মানব-মনে আবার নবচেতনা এনে দেবে।" একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এ নতুন আস্থা এত বেশী প্রয়োজনীয় যে প্রত্যেককেই খুবই হিসাব করে একে গ্রহণ করতে হবে। ল্যাস্‌কি নিজেই সাবধান করে দিয়েছেন যে এই নতুন আস্থা জাতীয়তাবাদী হবেনা। তিনি ঘোষণা করেন, "জাতীয়তাবাদের জন্য নতুন প্রেরণা হয়তো আমাদের সম্পূর্ণ বিলোপের পথেই নিয়ে যাবে।" মুখ্যত এজন্যই রাজনৈতিক একনায়কত্ব, অর্থনৈতিক জড়ত্ব এবং রুশ দেশীয় জাতীয়তাবাদের অদ্ভুত সমাবেশে গড়া নব "রাশিয়ার ভাবধারা"তে আমার আপত্তি।

ল্যাস্‌কি খৃষ্টধর্ম্মের বাস্তবতার সঙ্গে কমিউনিজ্‌মের তুলনা করেছেন। কমিউনিজ্‌ম্ অবশ্য জয়ী হয়েছে। উচিত ছিল রুশ দেশের বাস্তবতার সঙ্গে কমিউনিজ্‌মের তুলনা করা।

আমি লিখেছিলাম, "নতুন আস্থা খুঁজে বের করবার জন্য ল্যাস্‌কি আমাদের রাশিয়াতে পাঠাতে চান, কিন্তু স্টালিন, যিনি ব্রিটিশ শ্রমিক বন্ধুর চেয়ে রাশিয়া সম্বন্ধে বেশী জানেন, তিনিই কয়েক বছর আগে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তাঁকে মধ্যযুগের রাশিয়া এবং অতীত জারতন্ত্রের কাছ থেকেই এক নতুন ভাবধারা সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন উপাস্য হচ্ছে মধ্যযুগীয় যোদ্ধা এবং পুরোহিত আলেক্‌জাণ্ডার নেভেস্কি, অষ্টাদশ

শতাব্দীর দস্যুনেতা সুভোরোভ, জারতন্ত্রের সমসাময়িক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি নেপোলিয়ান—যার সামরিক বিজয় রাশিয়া থেকে ফরাসী বিপ্লবকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, যার ফলে রাশিয়ার অগ্রগতি এক'শ বছর পিছিয়ে পড়ে, এবং অন্যান্য পৌরাণিক ব্যক্তি যাদের লেনিন এবং অন্যান্য বলশেভিক গালাগালি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।”

রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঐতিহ্য আছে। কিন্তু স্টালিন প্রেরণা পাচ্ছেন *প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্যের* কাছ থেকে। সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মান হচ্ছে সুভোরোভ পদক। তারপর হচ্ছে কুটুজোভ পদক। তৃতীয়টি হচ্ছে বোদজান খেমেলনিৎস্কি পদক যা ১৯৪৩ সনের ১০ই অক্টোবর থেকে সুরু হয়। খেমেলনিৎস্কি একজন সপ্তদশ শতাব্দীর উক্রেনীয়ান্ নেতা, তিনি গ্যালিসিয়াতে জেসুইটদের স্কুলে শিক্ষা লাভ করে পোলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, ইহুদী ধ্বংস করেছিলেন—এবং তাঁর সম্বন্ধে সোভিয়েট সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল, স্বাধীন উক্রেনদেশকে মস্কোর জারতন্ত্রের সঙ্গে একত্র করবার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

ল্যাস্কির বই সমালোচনা করতে গিয়ে আমি একথাও লিখেছিলাম, “রাশিয়া থেকে যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তা শ্লাভজাতীয় এবং জাতীয়তাবাদী। এ-ই হচ্ছে স্টালিনের নতুন বিশ্বাস। তাছাড়া, সমস্ত প্রকার মঙ্গলেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ল্যাস্কি তাঁর প্রখর দৃষ্টি নিয়ে এবিষয়টা এড়িয়ে যেতে চান যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুকূল্যে রাশিয়াতে খৃষ্টধর্ম্মের পুনরুদ্ধার—বলকান্ রাষ্ট্রের গোঁড়া গ্রীক্ অধিবাসী এবং রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এথেকেই বোঝা যায় যে রাশিয়ার ভিতরে বিশ্বাস নিয়ে একটা বড় রকমের গোলযোগ দেখা দিয়েছে; স্টালিনের হাতে পড়ে বৈপ্লবিক শিখা নির্ব্বাণোন্মুখ হয়ে পড়েছে, আর সোভিয়েটবাসীদের তা আর প্রেরণাও জোগায়না।”

বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীতে বিশ্বাস নিয়ে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে তার ফলে রাশিয়াতে বৃহত্তর গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। ল্যাস্‌কি খৃষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তে নতুন "কাহিনী" অথবা নতুন "ভাবধারা" বলে রাশিয়াকে চালাতে পারেন, কারণ যারা তাঁর বই পড়েছে তারা রাশিয়াকে জানেনা, এবং ধর্ম্মের আবরণে অজানাকে প্রকাশ করা সব সময়েই সহজ। কিন্তু রাশিয়ানরা রাশিয়াকে চেনে; তাদের কাছে স্টালিন অতীত থেকে এক নকল "বিশ্বাসের" সৃষ্টি করেছেন।

আমি আমার "কমনসেন্স" পত্রিকার সমালোচনায় এই অনুযোগ দিয়েছিলাম, "ল্যাস্‌কি একবারের জন্যও 'রাশিয়ার ভাবধারা' পরিবর্ত্তন করার জন্য স্টালিনের এই নতুন বিশ্বাস খুঁজে পাবার চেষ্টার কথা উল্লেখ করেন নি।"

আমি লিখেছিলাম, ল্যাস্‌কি তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র একটি যুক্তিকে স্বীকার করেন: তা হলো এর ক্ষতির কথা। তিনি স্বীকার করেন যে স্টালিনের গভর্ণমেণ্ট 'যুক্তিহীন অত্যাচার করেছে'। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে ফাঁসি, বন্দীশালার ব্যবস্থা, বহিষ্করণ, বিচার প্রভৃতির প্রয়োজন হয়েছিল বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল এবং এজন্যই আমি বলতে বাধ্য হয়েছি যে এ কারণেই আমি ল্যাস্‌কির সোভিয়েট ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধিকে সন্দেহ করি। বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য আগে যে অত্যাচার চলেছিল তা নিয়ে আমার ঝগড়া নয়। আমার ঝগড়া হচ্ছে স্টালিনের অত্যাচার নিয়ে যার সাহায্যে বিপ্লব নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। বহিষ্করণ নীতির কারণ সম্বন্ধে আমাদের এখন স্পষ্ট ধারণা হওয়া উচিত। বিপ্লব ধ্বংস করার জন্যই স্টালিন বিপ্লবীদের সরিয়ে ফেলেছিলেন।

ল্যাস্‌কি যুদ্ধের সময় এবং বিখ্যাত স্টালিনগ্রাড বিজয়ে

প্রভাবান্বিত হয়ে লিখেছিলেন—"হিটলারবাদের বিরুদ্ধে দু'বছরব্যপী রাশিয়ার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পৃথিবীর সাধারণ লোকের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করেছে যে ১৯১৭ সনের বিপ্লবের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য।" কিন্তু অন্যত্র "বিশ্বাস, যুক্তি ও সভ্যতা"তে একথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেরই সমালোচনা করে বলেন: "যারা ভাবধারাকে সাহস মনে করে ভুল করে তাদের নিয়ে আমাদের যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে।"

স্টালিনগ্রাডের বীরত্ব?—হাঁ, এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। ডানকার্ক, এল আলামিন্, টারাওয়া, আইয়ো জীমা, ওয়ারস, লণ্ডন ও কভেণ্টরীর রাস্তাতেও এরকম বীরত্বই দেখা গিয়েছে। নাৎসী আর জাপানীরাও যথেষ্ট বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করেছিল। সেজন্য নাৎসীদের জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করতে পারিনা, কিম্বা জাপানীদের বিশ্বাসকেও স্বীকার করিনা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদি মানুষকে ভাবধারা গ্রহণ করতে হয়, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য্য। এবং এ কোন যুদ্ধক্ষেত্র? গ্রেটবৃটেন এবং আমেরিকাও যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

স্টালিনগ্রাড-বিজয় সম্ভবপর হয়েছিল—কারণ, জার্ম্মানীর সরবরাহের পথ ছিল সুবিস্তৃত এবং রাশিয়ার রিজার্ভ-সৈন্য ছিল খুবই কাছে, স্টালিন তখন নগর রক্ষার জন্য যে কোন সংখ্যক সৈন্যের জীবন দান করতে প্রস্তুত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ হয়েছিল। স্টালিনের দৃঢ়তা এবং লালফৌজের বীরত্ব কবি এবং ঐতিহাসিকের কাছ থেকে সবরকম সম্মান পাবার যোগ্য। কিন্তু স্টালিনগ্রাড ছিল শক্তির 'খেলা'। এটাকে কোন ক্রমেই "রুশীয় ভাবধারা"র শ্রেষ্ঠত্ব বলে গ্রহণ করা যায়না, যেমন বৃটিশ ও আমেরিকান বৈমানিক, সাবমেরিন চালক, প্যারাসুট সৈন্য, সামরিক কর্ম্মচারী, বৈজ্ঞানিক, এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো 'অ্যাংলো-স্যাক্সন' ভাবধারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেনা।

কোন 'ভাবাধারা'কেই কামানের গর্জ্জন এবং বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে পাওয়া যাবেনা বরং পাওয়া যাবে ছোট একটি শান্ত কণ্ঠের ভিতর দিয়ে।

স্টালিনগ্রাড এবং অন্যান্য যায়গার যুদ্ধের চিত্তাকর্ষক বীরত্ব, এটাই প্রমাণ করে যে মানুষ বেঁচে থাকার চেয়ে মরতেই বেশী জানে। এ সভ্যতার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ রয়েছে যেখানে মানুষ কি করে মরে সেটাই বেশী করে প্রকাশ।

ল্যাস্‌কির বিপদ হচ্ছে যে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তাগুলো পৃথক ভাবে রয়েছে এবং এগুলো একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত হতে পারছেনা। সেজন্যই খৃষ্টীয় ইতিহাস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ল্যাস্‌কি লিখলেন, "আমার মনে হয় অত্যাচারের ফল অত্যাচারীকে নির্দ্দয় ও হঠকারী করে ফেলে।" রাশিয়াতে যা ঘটছে এ হচ্ছে তারই পরিষ্কার বিবরণ কিন্তু ল্যাস্‌কি তা স্বীকার করেননা।

সোভিয়েট বিপ্লব এক নূতন ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং নূতন ধরণের মানুষ সৃষ্টি করেছে এই মোহই ল্যাস্‌কির রুশ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার মূলে বর্ত্তমান।

১৯৪৪ সনের আগষ্ট মাসে ল্যাস্‌কির বই সমালোচনা করতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম, "রুশ রাষ্ট্র" বর্ত্তমানকালে ঐতিহাসিক অন্যান্য রাষ্ট্রের মত শক্তিশালী রাজনৈতিক চাল চালছে। আমি সোভিয়েটের বৈদেশিক কূটনীতির মধ্যে এমন কিছুই দেখতে পাইনা যাকে "রুশীয় ভাবধারা"র বিকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। এর ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় সুবিধার উপরে। ক্রেমলিন্ "ফ্যাসিষ্ট, একনায়ক, রাজতন্ত্রবাদী, প্রতিক্রিয়া-পন্থী, বামপন্থী, এবং গণতন্ত্রবাদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে চলেছে।" রাশিয়ার রাষ্ট্রগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের পরিপন্থী নয়।

সেজন্যই রাশিয়ার রাষ্ট্রগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নতুন ধরণের

সমাজতন্ত্রবাদী অথবা নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শেরও সৃষ্টি করে নি। ল্যাস্কি মনে করেন সোভিয়েট ব্যবস্থা "সাধারণের জীবনে এমন পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে যা আর কোন সমাজ-ব্যবস্থায় পাওয়া সম্ভবপর নয়।" তিনি বলেন, রুশীয় বিপ্লব, সাধারণ মানুষের "মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক সম্ভ্রম" অক্ষয় করে রাখার দাবী করেছে। তিনি দাবী করেন, বলশেভিক রাশিয়ায় "পৃথিবীর অন্য কোন দেশের চেয়ে অধিকসংখ্যক স্ত্রীপুরুষ আত্ম-উন্নতির সুযোগ পেয়েছে।"

আমি ল্যাস্কিকে জিজ্ঞেস করতে চাই ভীতির সঙ্গে সম্ভ্রম কি করে থাকতে পারে? স্বাধীনতা ব্যতীত আত্ম-উন্নতি কি করে সম্ভবপর হয়? রাশিয়াতে কর্ম্মসংক্রান্ত আত্ম-উন্নতি যথেষ্ট ঘটেছে। তথাকথিত "নিম্নশ্রেণীর" লোকেরা, পূর্ব্বেকার জাতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং মেয়েরা বলশেভিক বিপ্লবের ফলে নতুন ধরণের উন্নতির সুযোগ পেয়েছে। রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনীতি নিয়োগ ব্যবস্থা এবং শিক্ষার উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা করে দিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত, রাশিয়ার বর্ত্তমান জীবনযাত্রা প্রণালীরও যথেষ্ট উন্নতি হবে।

যে সকল সোভিয়েট নাগরিক এবং বিদেশীরা এ অবস্থায় তলিয়ে যান তাদের আমি বুঝতে পারি কারণ বহু বছর আমার অবস্থাও এরকমই হয়েছিলো। সোভিয়েট উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধির পরিমাণ এবং শিল্প নির্ম্মাণের উন্নতি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। তাছাড়া স্কুলের ব্যবস্থা, বই এবং সংবাদপত্রের বহুল প্রচার দেখে আমি প্রশংসা না করে থাকতে পারি নি। জাতীয় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, স্ত্রীজাতি, ছেলেমেয়ে, সাম্রাজ্যবাদী দেশ, সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং উদ্ধত ফ্যাসিস্টবাদ—এসব বিষয়ে সোভিয়েট সরকারের নীতি আমাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের একজন প্রধান ভক্ত করে

তুলেছিলো। সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার প্রতি বন্ধুত্বের ভাব আমি অনেকদিন পোষণ করেছিলাম।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে আমার ধারণার পরিবর্ত্তন হলো কেন?

রাশিয়ার পরিবর্ত্তন দেখে আমারও মতের পরিবর্ত্তন হয়। এ পরিবর্ত্তনের মূলে কোন ব্যক্তিগত নিজস্ব অথবা কর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার নেই। স্টালিনের রাশিয়ার নবনীতি এবং নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আমার বিরোধ। উৎকট জাতীয়তাবাদ, নিষ্ঠুর দমননীতি, বিরাট অনৈক্য, নতুন শাসক সম্প্রদায়, হৃদয়হীনতার প্রসার, (সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তিই হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ) এবং নানা দোষযুক্ত ব্যক্তিগত একনায়কত্বের বিরুদ্ধেই আমার আপত্তি।

বর্ত্তমান সোভিয়েট সরকারের জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং গণতন্ত্রবিরোধী নীতিরই আমি বিরোধিতা করছি। বিশেষ করে আমি রাশিয়ার নতুন জাতীয়তাবাদের নিন্দা করি। মস্কোর আন্তর্জ্জাতিকতাই আমার কাছে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণের বস্তু ছিল। চৌদ্দ বছর আমি সোভিয়েট ইউনিয়নে কাটিয়েছি। কিন্তু সে দেশের মাটি, নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত কিম্বা বনউপবনের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিলনা। রাশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে বহুবিধ পরিবর্ত্তন ঘটছে যার ফলে সে দেশ এবং অন্যান্য দেশও যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। রাশিয়ার প্রতি আমার আকর্ষণের এটাই মূল কারণ। এবং আমি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম সোভিয়েট আন্তর্জ্জাতিকতার জন্য, কারণ আমি জাতীয়তাবাদকে সবচেয়ে বড় শত্রু, মানবজাতির অভিসম্পাত এবং যুদ্ধের প্রধান কারণ বলে মনে করি। মস্কো কর্ত্তৃক জাতীয়তাবাদ গ্রহণকে আমি আমার জীবনের শোচনীয় ঘটনা বলেই মনে করি। আন্তর্জ্জাতিকতা, সাম্রাজ্যবিরোধী-নীতি, এবং গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্যের জন্য আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর যথেষ্ট ভরসা রেখেছিলাম।

তা'হলে, আমি যখন একমত হতে পারিনা, তখন কি চুপ করে থাকবো ? সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা হচ্ছে একনায়কত্বের লক্ষণ। সমালোচনাই হচ্ছে গণতন্ত্র। যে সব গণতন্ত্রবাদী সোভিয়েট সরকার সম্বন্ধে কোন সমালোচনাই সহ্য করতে পারেনা তারা একনায়কত্বেরই সেবা করছে। যে যুগে সর্ব্বত্রই গভর্ণমেণ্ট এত ভুল করছে এবং মানুষের এত দুঃখের কারণ হচ্ছে, সে যুগে যে কোন গভর্ণমেণ্টের সমালোচনায় বাধা দেওয়া ক্ষতিকর। যারা একথা বলতে চায় তারা কি সোভিয়েট সরকার ছাড়া আর অন্যান্য সরকারের বিরুদ্ধে অক্রমণ বন্ধ রাখবে ? কারও পক্ষে, বেভিন, ট্রুম্যান, ছগল, পোপ, চিয়াং কাইসেকের সমালোচনা অতি স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। স্টালিনের সমালোচনার বেলা তা হয় "লালভীতি।" রাশিয়াতে স্টালিনের কোন সমালোচনাই হয়না। বিদেশী একনায়কেরা যারা এটা পছন্দ করেন তাঁরা রাশিয়ার বাইরেও স্টালিনের সমালোচনা বন্ধ রাখতে চায়। সমালোচনার থেকে রেহাই পাওয়ার ভাল উপায় সমালোচনা দমন করা নয় বরং যার ফলে সমালোচনা হয় তা দূর করা কিম্বা তার প্রতিকার করা।

"দি নেশ্যন্" পত্রিকা থেকে আমার সম্পাদকের কাজে ইস্তফা দেবার এক কারণ হচ্ছে যখন রাশিয়া সম্বন্ধে ভাল কিছু বলতে পারবেনা তখন এ পত্রিকা কিছুই বলবেনা। তার ফল হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিবাদকারী দেশের বহু ঘটনা সম্বন্ধে চুপ করে থাকা।

ঘটনা চেপে রাখলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে খাঁটি বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায়না। মিথ্যার দ্বারা বন্ধুত্ব স্থাপন ক্ষণস্থায়ী হয় এবং প্রথম চাপেই তা ভেঙ্গে পড়বে।

কোন গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণতা আশা করিনা। কোন সামাজিক ব্যবস্থা কিম্বা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কবিচার করতে

হয় ভাল-মন্দের অনুপাতে। আপাতঃদৃষ্টিতে যা ভাল এবং ভবিষ্যৎও যার ভাল তা যদি খারাপের চেয়ে অনেকাংশে বেশী ভাল হয় তা'হলে মানুষ সেটা পছন্দ করে। ঠিক সেরকমই খারাপ যদি ভালকে অনেকাংশে ছাড়িয়ে যায় এবং ভালকেও খারাপ করতে চায় তাহলে মানুষ তা পরিত্যাগ করে।

যারা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করে তাদের কাছে সোভিয়েট ব্যবস্থার চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে তারা অনেক সময়ই একনায়কত্ব যে কত খারাপ হতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণাই করতে পারেনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে কোন কোন আমেরিকাবাসী ফ্রাঙ্কলিন্ ডি রুজভেল্টকে একনায়ক বলে আক্রমণ করেছিলো এবং তাদের মতে 'নিউডিল্' একনায়কত্বের সামিল মাত্র। যে কেউ একনায়কের অধীনে বাস করেছে তার কাছেই একথা কেবল হাস্যাস্পদ বলেই মনে হবেনা, এথেকে মনে হবে যে আক্রমণকারীরা জানেনা একনায়কত্ব কি জিনিষ। ঠিক একই কারণে চিয়াং-কাই-সেককেও একনায়ক বলা হয়ে থাকে। আমি নিজেও তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির জন্য সমালোচনা করেছি। কিন্তু কিছুদিন আগে কুনমিং শহরের কয়েকজন অধ্যাপক একখানা চিঠি লিখে চিয়াং-কাই-সেক এবং কমিউনিষ্ট নেতা মাও-সেতুংয়ের কাছে পাঠান। তাঁরা সেটা তাঁদের বিদেশের বন্ধুবান্ধবদের কাছেও পাঠান এবং তাঁদের মধ্যে একজন ১৯৪৫ সনের ১৮ই ডিসেম্বর 'নিউইয়র্ক হ্যারলড্ ট্রিবিউনে' ছাপেন। চিঠিখানায় বলা হয়েছিলো, "একদলীয় একনায়কত্বের অবসান ঘটান খুবই উচিত।" তাছাড়াও তাঁরা লিখেছিলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে ক্ষমতা একত্রীকরণও বন্ধ করতে হবে।"......রাশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে তিনিই জানেন যে এরকম ব্যাপার সেখানে ঘটতেই পারেনা। আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত না থাকলে কোন

অধ্যাপক কিম্বা কোন লোকই এসব বিষয় কাগজে লিখে স্টালিনের কাছে পাঠাতে কিম্বা বিদেশে পাঠাতে সাহস পাবেনা।

আমি সবসময়েই সোভিয়েট রাশিয়ার গুপ্তচর-ভীতিকে ঘৃণা করে এসেছি। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে এটা কমে আসবে এবং দ্বিতীয়তঃ আমি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কৃতিত্বের দিক থেকে এর তুলনা করেছিলাম। কিছুকাল পরে দেখতে পেলাম যে এই ভীতি প্রতি বছরই ক্রমশঃ সাঙ্ঘাতিক হয়ে পড়ছে, শত্রুদের ধ্বংস করে বিপ্লব তার হোতাদেরই গ্রাস করতে আরম্ভ করেছে। তারপর আমি দেখতে পেলাম যে বলশেভিবাদের অনেক ভাল জিনিষ ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাবে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সোভিয়েট গণতন্ত্র জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিয়েছে। কাগজে-কলমে জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গণতন্ত্র, জর্জিয়া, উক্রেন এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্যান্য গণতন্ত্রগুলো ইচ্ছা করলেই স্বাধীন হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে তাদের এরকম কিছু করতে দেওয়া হবেনা। কাগজে-কলমে এ গণতন্ত্রগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে; কমিউনিষ্টপন্থী যারা এ দেশগুলোর অধিনায়ক হয়ে বসে আছে তারা মস্কোর আদেশ মতই চলে। ১৯৪১ সন থেকে মস্কো অনেকগুলো জাতীয় গণতন্ত্র দমন করে সাধারণের স্বাধীনতা হরণ করেছে। কোনরকম সরকারী ঘোষণা না করেই একাজ করা হয়েছিলো (জেলাগুলোর নির্ব্বাচন কেন্দ্রের তালিকা বেরিয়ে যাওয়ার পর একথা জানতে পারা গিয়েছিলো)। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র নাকচ করে দিয়ে তা করা হয়েছিলো। কিন্তু কৃষ্টির ব্যাপারে, মস্কো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের জাতীয় রুচি এবং ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে দেয়, কেবল হালে রাশিয়ার ইতিহাস ও ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, আর তাছাড়া বর্ত্তমানকালে

সোভিয়েট সংবাদপত্রের ভাষণ হিসাবে, মস্কো কয়েকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে তাতার এবং অন্যান্য শ্ল্যাভগোষ্ঠি বহির্ভূত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবোধকে দমন করবার চেষ্টা করেছিলো।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জাতিগত ভেদনীতি অসভ্যতা এবং অসৌজন্যের পরিচায়ক। একদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব অন্যদিকে জাতীয় সম্প্রদায়গুলোর কৃষ্টিগত স্বাধীনতা — রাশিয়াতে দুই-ই বর্ত্তমান। সোভিয়েট ইউনিয়নে আর্মেনিয়ান জাতির স্বাধীনতা আছে। কিন্তু কোন .সোভিয়েট আর্মেনিয়ানের কোন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই। উজবেক উক্রেনিয়ান এবং তাজিকদের স্বাধীনতা নাই। এই ব্যাপারে সকলেই সমান।

কোন উক্রেনিয়ান এবং রাশিয়ান উজবেকের উপর অত্যাচার করেনা। কিন্তু কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে গুপ্তচর বাহিনী তাকে আটক করে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখতে পারে। সে কমিউনিষ্ট বিরোধী কাউকেই ভোট দিতে পারেনা যেমন একজন আমেরিকাবাসী পুঁজিবাদবিরোধীকে ভোট দিতে পারে। ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্ভাবনা ছাড়া সে সরকারের নীতির এবং নেতাদের সমালোচনা করতে পারেনা। সে কেবল ঘাড় নেড়ে কথা শুনে যায়; এমনকি যখন মতানৈক্য হয় তখনও সে জানে মতামত জানালে কি হবে।

সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা সকল জাতির পক্ষে সুসভ্য এবং সাধারণের পক্ষে বর্ব্বরোচিত।

বিজ্ঞানের প্রতি সোভিয়েট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই আধুনিক। বহুল পরিমাণে সাহায্য এবং সুখ সুবিধার বিধান করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা সোভিয়েট সরকার করে থাকেন। বৈজ্ঞানিকেরা সোভিয়েট আভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। বিজ্ঞান স্বাধীন

হলেও বৈজ্ঞানিক স্বাধীন নন। বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তিনি বিনা বাধায় পত্রালাপ করতে পারেন না। ‘জিপিইউ’ই-এর তত্ত্বাবধান থাকবে তাঁদের ওপর। খুব অল্প সংখ্যক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকই আন্তর্জ্জাতিক অধিবেশনে যোগদান করেন; দরকার হলে পরেও তাঁরা বিদেশ-ভ্রমণে যেতে পারেন না। সোভিয়েট পদার্থবিদ, প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিককে খুবই সতর্কতার সঙ্গে চলতে হয় — যেন তাঁরা এমন কোন গবেষণামূলক সিদ্ধান্তে না পৌছান যা মার্কসবাদ এবং জড়বাদের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যায়, কারণ তাঁরা জানেন যে তাঁদের সহকর্ম্মীদের অনেককেই প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিলো।

প্রফেসর ল্যাস্কির বন্ধু, বিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক, জুলিয়ান হাক্সলি, ১৯৪৫ সনে রাশিয়া পরিদর্শন করে “নেচ্যর” পত্রিকাতে লিখেছিলেন, “রাশিয়ার কোন কোন বিজ্ঞান শাখাতে বৈজ্ঞানিক জাতীয়তাবাদ পরিলক্ষিত হয়।” যাঁরা আপত্তি করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রফেসর পিটার কাপিৎসা পৃথিবীর বিখ্যাত পদার্থবিদ। ১৯২২ সনে যখন রাশিয়া থেকে কিছু লোক বাইরে চলে আসে তখন কাপিৎসা রাশিয়া ছেড়ে কেমব্রিজে চলে আসেন। ১৯২৬ সনে বিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ড কেমব্রিজে এমন এক বিশেষ গবেষণাগারের ব্যবস্থা করেছিলেন যেখানে কাপিৎসা তড়িৎ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষণা চালাতে পারেন। ১৯৩৫ সনে তিনি রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সোভিয়েট সরকার তাঁর নিজের অনিচ্ছা, এবং বৃটিশ সরকার, লর্ড রাদারফোর্ড ও অন্যান্য সকলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁকে আটকে রেখেছিলো। তারপর লণ্ডনের সোভিয়েট দূতাবাস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয় যে সোভিয়েট

ইউনিয়নে বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার এবং বৈজ্ঞানিদের অভাব। সুতরাং যে সব বৈজ্ঞানিক বিদেশে কাজ করছেন রাশিয়া তাঁদের দিয়ে দেশের কাজে করাতে বাধ্য হচ্ছে। আরও বলা হয় যে প্রফেসর কাপিৎসাকে উচ্চ বেতনে যোগ্য স্থানে নিযুক্ত করা হয়েছে। কথাটা ঠিকই। কিন্তু কাপিৎসা যদিও পরমাণু মুক্ত করবার স্বাধীনতা পেয়েছেন কিন্তু নিজে তিনি স্বাধীন হন নি।

কিছুদিন হ'ল, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের উৎসাহী সোভিয়েট সুহৃদগণ সাধারণ লোকের মনে এ ধারণা জন্মাতে চেষ্টা করছে যে পশ্চিম ইউরোপ ও সোভিয়েট গণতন্ত্রের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, এবং সোভিয়েট নাগরিকদের স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু তা অন্য ধরণের। অনেক সোভিয়েট নাগরিকই এ অদ্ভুত কথা মানতে চাইবেনা। দু' রকমের সোভিয়েট নাগরিক আছে; একপক্ষ মনে করে যে তার কোন স্বাধীনতা নেই এবং সেজন্য সে বিরক্তও বটে; অন্যপক্ষও এসব জানে কিন্তু সে এত মাথা ঘামায়না কারণ তার স্বাধীনতার স্পৃহাই মরে গিয়েছে।

যারা ১৯২৭ সনে ১৬ বছর কিম্বা তার ঊর্দ্ধে ছিল কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার কথা তাদের মনে আছে। অনেক শ্রমিকেরও স্মরণ আছে যে একত্র হয়ে তারা আগে যে রকম আদায় করতো এখন আর তা পারেনা। বাড়ীর সকলেই এখন জানে ভোর তিনটে নাগাদ কোন এক সময় 'জিপিইউ' বাড়ীতে আসে এবং বাড়ীর এক বা একাধিক লোককে নিয়ে যায়। দিনের বেলায় যখন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরবাট্ ষ্ট্রীট থেকে লোকজন সরিয়ে ফেলা হয় তখন জনতা বুঝতে পারে যে স্টালিনের গাড়ী এপথে যাবে এবং তারা এই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলে কি এমন ক্ষতি হতে পারে। স্ত্রীর শবযাত্রার সঙ্গে স্টালিন যখন পথ অতিক্রম করছিলেন, জিপিইউ তখন সে পথের

সব বাড়ী খানাতাল্লাস করে যাচ্ছিল, বাসিন্দাদের আর বুঝবার বাকী ছিলো না যে, তাদের বিশ্বাস করা হচ্ছে না।

সোভিয়েট নাগরিকেরা যদি মনে করে থাকে যে তারা স্বাধীন তাহ'লে এত কানাঘুষার প্রয়োজন ছিল না। তারা ঘাড় বেকিয়ে দেখতোনা অন্য কেউ তাদের কথা শুনতে পেল কিনা। পুরণো বন্ধুর আত্মীয় পুলিশের হাতে বন্দী হলে, তার সঙ্গে তারা যোগাযোগ নষ্ট করতো না। সোভিয়েট নাগরিকেরা পুলিশের রাজত্বে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং কিছুকাল পরে ব্যাপারটা এমনই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় যে তাদের আর এ সম্বন্ধে কোন চেতনাই থাকেনা।

সোভিয়েট সংবাদপত্র গণতান্ত্রিক দেশের হরতালের বিবরণ খুব লেখে; সোভিয়েট শ্রমিকেরা জানে যে তারা মাঝে মাঝে চাইলেও কাজ বন্ধ রাখতে পারেনা। প্রমাণ, ১৯৩৫ সনে যখন স্ট্যাখানোভ উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক কয়লার খনি এবং কলের শ্রমিকের কাছ থেকে তাদের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী করা হয়, তখন কয়েকজন স্ট্যাখানোভ আন্দোলনকারীকে মেরে ফেলা হয়েছিল; সোভিয়েট সংবাদপত্র এ ঘটনা এবং শাস্তি বিধানের কথা উল্লেখ করেছিল।

সোভিয়েট নাগরিকেরা জানে যে একদলীয় নির্ব্বাচনে তাদের ভোটের কোন মূল্য নেই। আমাদের পরিচারিকাটির মত জনকয়েক নির্ব্বোধ জিজ্ঞেস করতে পারে একজন প্রার্থীর জন্য ভোট দেবার কি সার্থকতা আছে। রাশিয়াতে বেশীর ভাগ লোকই এখন আর কোন প্রশ্ন করেনা; তাদের কাছ থেকে যেরকম চাওয়া হয় তারা সেরকমই করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিবাসীরা বোকা নয়। বস্তুতঃ তারা জানে যে তারা একনায়কত্বে বাস করছে।

গুপ্তচর-বাহিনী কর্ত্তৃক ধরপাকড় সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াই

সোভিয়েট জীবনে সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য বিষয়। যখন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন সাধারণের মনে এই প্রতিক্রিয়া হয় যে সে দোষীর চেয়ে হতভাগ্যই বেশী। যারা 'জিপিইউ'এর হাতে পড়েছে এমন লোকের সঙ্গে সোভিয়েট নাগরিকদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং তারা জানে যে এ সব ব্যাপার সাধাবণের দোষত্রুটির ফল নয় বরং সাধারণ বহিষ্করণ নীতির ফল; ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে গ্রেপ্তার হতে পারে অথবা সরকার বিরোধী কাজের জন্য দোষী লোকের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্বের "অপরাধের" জন্যও হতে পাবে।

আলেকজাণ্ডার আফিনোজিনোভ একজন কৃতী তরুণ নাট্যকার, তাঁর নাটক মস্কো আর্ট থিয়েটার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যগৃহে অভিনীত হয়েছিলো। অন্যান্য আর্টিষ্ট এবং লেখকের মত তিনিও 'জিপিইউ' অধিনায়ক গেন্‌রিখ য়াগোডার বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। গেনরিখ য়াগোডা নিজেকে একজন শিল্পকলার সমঝদার বলেই মনে করতেন। বাস্তবিক পক্ষে আফিনোজিনোভ য়াগোডার খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং 'জিপিইউ' কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মস্কোতে থাকবার জন্য একটা বড় বাড়ীও পেয়েছিলেন। তারপর যে সময় য়াগোডা অন্যান্য সোভিয়েট নেতৃবর্গকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার, বিচার এবং গুলি করে মেরে ফেলছিলেন সে সময় দেশদ্রোহী বলে তাঁকেই গ্রেপ্তার করা হয়, তারপর হয় বিচার এবং মৃত্যুদণ্ড। য়াগোডার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আফিনোজিনোভও তাঁর বাড়ী থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁকে কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর, সমগ্র সমালোচকেরা তাঁকে আক্রমণ করে বলতে থাকে যে তাঁর নাটক কোনদিনই ভাল ছিলনা; সব থিয়েটারেই তাঁর নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যসভাতে "বিপ্লব-বিরোধী অভিসন্ধি" এবং "বলশেভিক বিরোধী মতবাদের" জন্য তাঁকে আক্রমণ করা হতে লাগলো। এ সব তাঁকে গ্রেপ্তার করার

পূর্ব্বলক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ আফিনোজিনোভকে আবার পূর্ব্বস্থানে বসান হলো, পার্টিতে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হলো এবং যে সব ক্ষুদে সমালোচক তাঁর নিন্দা করতে আরম্ভ করেছিলো তারাই আবার তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। অনেকেই মনে করে যে স্টালিন নিজে হস্তক্ষেপ করাতেই তাঁর লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার হওয়া সম্ভবপর হয়েছিলো। আফিনোজিনোভ বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েট জীবনের হঠকারিতা সম্বন্ধে একটা নাটক লিখেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন "মিথ্যাচার"। একদিন তিনি স্টালিনের অফিস থেকে আহূত হন। নাটকের পাণ্ডুলিপি স্টালিনের পড়বার জন্য পাঠান হয়েছিলো। স্টালিন আফিনোজিনোভকে বলেছিলেন যে নাটক ভাল হয়েছে কিন্তু তা অভিনীত হতে পারে না। তিনি আফিনোজিনোভকে নাটকটির প্রচার বন্ধ রাখার জন্য বলেছিলেন এবং তিনি তা করেও ছিলেন।

আফিনোজিনোভের রাজনৈতিক পুনোরুদ্ধারের পর তিনি আমার স্ত্রী মারকুসা এবং আমাকে তাঁর নিজের ফোর্ড গাড়ীতে করে পল্লীগৃহে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে সামনে বসেছিলাম এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে একসময় বলেছিলাম, "সুরা, তুমি জান যে তোমার বিরুদ্ধে যে সব ভীষণ অভিযোগ করা হয়েছিলো তার সবই মিথ্যা। এ থেকেই কি মনে করা যায়না যে তুমি যখন অন্যের সম্বন্ধে এ ধরণের অভিযোগ শুনবে তুমিও সে সব কথা মিথ্যা বলে মনে করবে?"

তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসেছিলেন। কথাটা মেনে নিয়েছিলেন।

(মস্কোতে জার্ম্মান বোমা বর্ষণের ফলে আফিনোজিনোভ মারা যান।)

ল্যাসকি কি বলেছিলেন? অত্যাচার "অত্যাচারিতের মধ্যে কপটাচার এবং দাসমনোভাবের সৃষ্টি করে।" অত্যাচারিত এবং যারা

অত্যাচারের কথা শোনে অত্যাচার তাদের উন্নাসিক করে তোলে। সোভিয়েট নাগরিকেরা অপরাধের জন্য যে কেউ শাস্তি পাচ্ছে তা মনে করেনা। অত্যাচারীর কোন একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি সাধনোদ্দেশ্যেই এ অত্যাচার সংঘটিত হয় বলে তারা জেনে নেয়। বলশেভিক বিপ্লবের ফলে লোকের মনে আইন সম্বন্ধে একটা ভয় এসেছে কিন্তু আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আসেনি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তার কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নে বাস্তবিক পক্ষে কোন আইনই নেই; একনায়কত্বই হচ্ছে আইন; পূর্ব্বেকার আইনকে কখনও শোধন করে, কখনও একেবারেই নাকচ করে দিয়ে সে নিতান্তই অবহেলায় নতুন নতুন আইন তৈরী করে চলে—যার ফলে আইনের ওপরেই তার অশ্রদ্ধা প্রকটিত হয়ে প্রকাশ পায়। রাশিয়াতে আইনের প্রতি ভয় মানে আইনের স্রষ্টিকারীকে ভয়। আইন সেখানেই থাকতে পারে যেখানে গভর্ণমেণ্ট, তার অনুগত এবং নাগরিকদের কাছ থেকেও আইনের প্রতি অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা আশা করা যায়।

১৯৩৬ সনের 'স্টালিন- শাসন-ব্যবস্থার' ১২১ ধারাতে বলা হয়েছে, "সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদের শিক্ষালাভে অধিকার আছে। এই অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা, অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা, এমনকি উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সরকারী বৃত্তির দ্বারা।..."

এ-সবই ভাল। কিন্তু ১৯৪০ সনের ২রা অক্টোবর গণপরিষদ এবং সোভিয়েট মন্ত্রীসভার আইনজারির ফলে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট উচ্চবিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা রহিত করেন। একই সময়ে সরকারীবৃত্তি-গুলিকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শাসনব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করা হয়নি। জনমতও আলোচিত হয়নি। গভর্ণমেণ্ট কেবল শাসনব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে কাজ

করে চলেছে। কেউ একটা কথা বলেও আপত্তি জানায়নি। কেই বা সাহস করবে? কেই বা ছাপবে? ছাপাখানা সরকারের।

সোভিয়েট সরকারের এই শাসনব্যবস্থা-বিরোধী কার্য্যের ফলে কৃষক এবং শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কলেজে পড়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং বড়লোকদের ছেলেমেয়েদের সুবিধা বেশী হয়। স্টালিন এক নতুন ভদ্রশ্রেণী তৈরী করছেন।

শাসনব্যবস্থার ১২১ ধারা নাকচ করার দিনই একটা হুকুমজারি হয় যে, উচ্চ বিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী ফ্যাক্টরী এবং যানবাহনবিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে এমন ছয় শ' লোককে নিতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থার নতুন আইনের ফলে যারা উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজে যেতে অসমর্থ।

এভাবেই সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, শিল্পবিদ, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করে; এদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের ছেলেমেয়েরা তাদের কর্ম্মজীবন আরম্ভ করে কলকব্জার শ্রমিক, মিস্ত্রী, ট্র্যাক্টর চালক, এবং রেলগাড়ীর শ্রমিক হিসাবে।

১৯৬৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শাসন ব্যবস্থায় যে রদবদল হল, তার ফলে একদিকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার অধিকার পেল, অন্যদিকে অসম্ভ্রান্ত যারা তাদের ছেলেরা ভবিষ্যৎকে খুঁজে নিলো যন্ত্রশিল্প আর কৃষিকর্ম্মের মধ্যে; তারপরই হঠাৎ একসময় একনায়কত্ব কোনো কৈফিয়ৎ না দিয়েই ১২১ ধারার পুনঃপ্রবর্ত্তন করে বসলো. মাইনে দিয়ে পড়ার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল, বৃত্তিদানের প্রচলন হলো আবার।

এথেকেই বুঝতে পারা যায় গভর্ণমেন্ট কি ভাবে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করে, একনায়কত্ব কিভাবে শিক্ষার সম্বন্ধে ভাবে এবং নেতৃবৃন্দ সাধারণ লোকের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করে। নেতারা

সব বিষয়েই অচল অটল। সাধারণ লোকেরাও সব বিষয়ে উৎসাহের অভাব দেখাতে শেখে : যদি তুমি ঘটনার গতি পাল্টাতেই না পার তাহলে আর ভাববার কি আছে ?

মেক্সিকো শহরে সোভিয়েট রাজদূত আমার মস্কোর 'পুরোনো বন্ধু কনস্টানটাইন্ ওউমেনস্কি, যিনি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান, তাঁর সম্মানার্থে আহুত সভাতে সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে বলেছিলেন।

"হ্যাঁ", একজন মহিলা বলেছিলেন, "আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, যদি আপনার দেশে কথা বলার স্বাধীনতাই না থাকে তাহলে এ সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্য কি ?"

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমিলি ব্যারেট ব্ল্যান্‌চার্ড তাঁর ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের "স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট"এর প্রবন্ধে লিখলেন,এ প্রশ্নের উত্তরে ওউমেনস্কি উত্তবে বলেছিলেন, "আমি এটাকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রশ্ন বলে মনে করি এবং আমি এর জবাব দিতে পারিনা।"

আজকালকার দিনে তুমি যাকে পছন্দ করনা সেই ।হবে "প্রতিক্রিয়াশীল", বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সে একজন "ফাসিস্ট"। কিন্তু কুটনীতিজ্ঞের প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বলতে হবে ভদ্রমহিলার প্রশ্ন খুবই ঠিক হয়েছে, বিদ্যাশিক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় স্বীকার করি। কিন্তু মনন এবং কলাবিদ্যা হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষার চাইতে স্বাধীনতারই অবদান। ১৯৩৬ সনের শাসন ব্যবস্থা অনুসারে কাগজে কলমে নির্দ্দেশাবলী থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট নাগরিকেদের জন্য যতটুকু স্বাধীনতা বরাদ্দ করতে রাজী, বাচনেই হোক কি রচনাতেই হোক, কিংবা হোক এসেম্বলী সভায় তারা তার বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না, আর গভর্ণমেণ্টের বরাদ্দের বারতি উদ্দেশ্যও তাদের থাকতে পারে না।

স্টালিন, মলোটভ, লিটভিনোভ প্রভৃতি ত্রিশজন নেতা ১৯৩৬

সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ক্রেমলিনে খুব জাকজমকের সঙ্গে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থাকে সাক্ষরিত করেন। ১৯৩৯ সনে ত্রিশজনের মধ্যে পনের জনকে বিনা বিচারে বহিষ্কৃত করা হয়। পনের জনের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককেই গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল। এই পনের জনের মধ্যে পূর্ব্ব সীমান্তের সেনাধ্যক্ষ মার্শাল ব্লুয়েকার; সুপ্রিম পলিট ব্যুরোর সভ্য কশিয়র; পলিট ব্যুরোর ডেপুটী-সভ্য রুদ্‌সুতাক; উক্রেনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা পস্‌টিশেভ; য়াগোডার অনুসারী 'জিপিইউ'-এর অধিনায়ক য়েজহোভ; উক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ল্যুবশেঙ্কো এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ার কমিউনিষ্ট দলপতি ঈচে প্রভৃতি ছিলেন। এই ভাবেই স্টালিন রাশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের কেন সড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো এসম্বন্ধে কোন ঘোষণা করা হয়নি। তারা কেবল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন আর ফিরে আসেন নি।

দীর্ঘদিন স্থায়ী কঠোর শক্তিশালী একনায়কত্ব সমালোচনা করবার ক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলে, কারণ এতে ভয়ের কারণ রয়েছে; মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে সে রাজনৈতিক সাহসিকতার বিলোপ ঘটায়; এর ফলে মানুষ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে কারণ পিরামিডের শিখরে বসে আছে যে দু'একজন চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে শুধু তাদেরই। আর সকলে তো পুনরাবৃত্তি, প্রতিধ্বনি আব অঙ্গ ভঙ্গিই কেবল করে। রাশিয়ার শিক্ষা কেবল কাজ করবার জন্য চিন্তা করবার জন্য নয়।

বলশেভিকদের ধুরন্ধরেরা মনে করেছিলেন যে সমাজতন্ত্রবাদের আওতায় রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে। বাস্তবিকপক্ষে রাশিয়াতে সমাজ-তন্ত্রবাদের বিলোপ ঘটেছে, এবং ন্যায়, নীতি এবং চিন্তাশক্তির অবসান হয়েছে সেখানে।

এই রাশিয়াতেই ল্যাস্‌কি আমাদের নতুন অবস্থা খুঁজে বের করতে বলছেন।

হ্যারল্ড জে ল্যাস্‌কি এবং যাঁরা তাঁর মত রাশিয়ার বিষয়ে একমত তাঁদের এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবেঃ আধুনিক সোভিয়েট জনসাধারণের বেশীর ভাগ, যাদের মধ্যে ত্রিশ বছর এবং তার কম বয়সের লোকেরা রয়েছে, তারা সকলেই সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী। তাদের অশিক্ষিত পিতামাতারা যখন ঘৃণ্যজীবন যাপন করছে, তারা তখন শিক্ষক, সৈন্য-বিভাগীয় কর্ম্মচারী প্রভৃতি হতে পারে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে; কাজেই সোভিয়েট শাসনই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা। এবং স্বাধীনতা? তারা জবাব দেয়, "স্বাধীনতা? স্বাধীনতা কি? ধনতান্ত্রিক দেশে কি তোমরা এটা পেয়েছ? সামনের বছর আমরা আর একটা কলের লাঙ্গল এবং জুতোর জন্য চামড়া পাব।" সোভিয়েট রাশিয়াতে আমার সঙ্গে এ ধরনের সব কথাবার্ত্তা হয়েছে।

১৯৩১ সনে ভি কেভারিন লিখিত "অজানা শিল্পী" নামক সোভিয়েট উপন্যাসের নায়ক বলছে, "নীতি? একথা সম্বন্ধে ভাববার পর্য্যন্ত আমার অবসর নেই। আমি ব্যস্ত আছি। আমি সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে তুলছি। যদি আমাকে নীতি এবং এক জোড়া পেন্টুলুন বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আমি পেন্টুলুন বেছে নেব।" বহু আগে থেকেই শিল্পীরা ভবিষ্যৎ সোভিয়েট ভাবধারা বুঝতে পেরেছিলেন। কেভারিনের অনেক পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একনায়কত্ব আদর্শকে নষ্ট করে ফেলে।

সোভিয়েট জীবনের বড় বেশী ঝোঁক দেখা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভারের উপর। এসব জিনিষ সেখানে খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং বেশীর ভাগ রাশিয়ানদের ভাগ্যে জোটেনা। এগুলো পাওয়া, আরও আরাম-দায়ক জীবন যাপন করবার আশা এবং কাজে উন্নতির সম্ভাবনাকেই মানুষের সকল চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়। কোন একনায়কত্ব যদি এ-উদ্দেশ্য সাধন করবার চেষ্টা করে, তাহলে এক-

নায়কত্ব সম্বন্ধে বলবার কিছু থাকেনা, যতই কেন না এর উপায় নীতি বহির্ভূত, গণতন্ত্রবিরোধী এবং কৃষ্টিগত আর নৈতিক অনুশাসনের বিরোধী হোক।

বর্ত্তমান রাশিয়াতে এটাই হচ্ছে প্রধান জিনিষ।

তর্কের খাতিরে একথা হয়তো বলা চলে যে রাশিয়ার জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন আসবে। কিন্তু সে উন্নতি সুদূর-পরাহত। ইতিমধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা-লোপ, দলে দলে লোকের প্রাণনাশ করা, বিরাট বন্দীশালা, একঘেয়ে একনায়কত্বের প্রচার এবং অন্যান্য গর্হিত ব্যবস্থা—এ সমস্তকে কতগুলি মুদীর দোকান, স্কুল বই, শিশু এবং বন্দুকের আওতায় এনে বিরাট দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে যা পশ্চিম দেশীয় মধ্যপন্থী এবং সমাজতন্ত্রবাদীরা পর্য্যন্ত এড়াতে পারেনা। ইতিমধ্যে সোভিয়েট জনসাধারণকে একনায়কত্ব একথা বুঝিয়েছে যে প্রথমতঃ তাদের সমস্ত স্বাধীনতাই আছে, দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার পাবার তুলনায় এ কিছুই নয় এবং তৃতীয়তঃ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন স্বাধীনতাই নেই। যেমন স্বাধীনতার ব্যবহার দ্বারাই স্বাধীনতার ব্যবহার অর্জ্জন করবার ক্ষমতা শেখা যায় সেরকম বহুদিন স্বাধীনতার ব্যবহার না করার ফলে এর ব্যবহারের স্পৃহাই মরে যায়। ১৯১৭ সনের কয়েকমাস ছাড়া, রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা কোনদিনই ছিলনা, এবং সেজন্য বেশীরভাগ সোভিয়েট নাগরিকদের এ ধারণাই নাই যে এ জিনিষ কত সুখপ্রদ।

অনেক সোভিয়েট নাগরিকের স্বাধীনতা বুঝবার মানসিক বৃত্তিরই অভাব হয়েছে। এজন্য পার্লবাকের “মাসা স্কটের সঙ্গে রাশিয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা” বইয়ে মিসেস স্কট (সোভিয়েট ফ্যাক্টরীর জনৈক প্রক্তনা কর্ম্মী সম্প্রতি আমেরিকার নিয়ারিং স্কটের পুত্র সাহিত্যিক জন স্কটের সহধর্ম্মিণী) পার্লবাককে একথা বলছেন— “আমি একথা বলতে চাই যে, আমি স্বীকার করিনা, আপনাদের ব্যবস্থাই জনসাধারণকে

শিক্ষা দেবার পক্ষে ভাল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আমরা আমাদের দেশে (রাশিয়াতে) সংবাদপত্রে দুরকমের মতবাদ দেখতে পাইনা, যাতে একজন বলতে পারে এটা ঠিক আর-একজন বলতে পারে ওটা ঠিক। লোকে কি করে জানবে কোনটা ঠিক ?”

মাসা স্কট এবং তাঁর সমসাময়িক রুশবাসীরা অন্যের বিচারের ওপর নির্ভর করেই সত্যকে জানতে শেখে। সোভিয়েট গভর্ণমেন্টই তাঁদের কাছে সে-সত্য প্রকাশ করে।

আমার বড় ছেলে জর্জ্জ একুশ বছর বয়সে আমেরিকার সেনা বিভাগে ক্যাপ্টেনের কাজ করেছিল। যুদ্ধের সময় একবছর সে সোভিয়েট উক্রেনের পলটাভাতে আমেরিকার বিমান ঘাঁটিতে ছিল। যখন আমি সেখানে বিদেশী সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করছিলাম তখন সে রাশিয়ায় নীত হয় ; চমৎকার রাশিয়ান বলতে পারে সে। ১৯৪৪ সনের হেমন্তকালে আমেরিকার ছেলেরা যখন সেখানে কাজ করছিল তখন তারা প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে ভোট দেয়। ভোট দেবার আগে স্বভাবতঃ তাদের মধ্যে প্রার্থীদের গুণাগুণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিলো। সোভিয়েট সামরিক কর্ম্মচারী, যারা এ ঘাঁটিতে আমেরিকানদের সঙ্গে ছিল, এ অস্বাভাবিক রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা লক্ষ্য করে তাদের এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলো।

জর্জ্জ বলেছিলো “প্রতি চার বছর” আমরা একজন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন করি। এ বছরে রুজভেল্ট, যিনি বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্টের কাজ করছেন, তিনিই ডেমোক্রেটিক দলেব প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন এবং রিপাব্লিক দলের প্রার্থী হচ্ছেন ডিউই। আমরা প্রত্যেকে হয় রুজভেল্টের পক্ষে না হয় ডিউই-র পক্ষে ভোট দেব।”

একজন লালফৌজের লেফটেনান্ট বলেছিলো, “আমি বুঝতে পারিনা রুজভেল্ট কি করে একজন ডেমোক্রেট হলেন এবং কি করে তিনি কয়েক

বছরকাল ধরে প্রেসিডেন্টের কাজ করলেন, আর এখনও আমেরিকার সৈন্য বিভাগে কি করে রিপাব্লিক দলের লোক থাকতে পারে ?”

স্টালিন তাদের নিশ্চয়ই সড়িয়ে ফেলতেন।

ল্যাস্কি কি সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষের অতি আধুনিক মনের খুব নিকটতম ফটোগ্রাফ দেখেছেন ? একনায়কত্ব মানে কেবল জেল আর ফাঁসি নয়। একনায়কত্ব মানুষকে শুধু হত্যাই করে না তার ফল প্রতিক্রিয়ার চরমে পোঁছয়, ধ্বংসের চেয়েও খারাপ কিছু করে। যারা বেঁচে থাকে তাদের মন ও ইচ্ছাশক্তি এ দুয়েরই ধ্বংস সাধন করে।

সকলের জন্য নিয়োগব্যবস্থা এবং জনসাধারণের জন্য উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ—এই অজুহাতের জন্য কঠোর একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা কেবল রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্যা, সম্ভবত আধুনিক মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা। একনায়কত্ব যদি প্রাচুর্য্য এবং শান্তির পন্থা হয়ে থাকে তাহলেও রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত হয়না যে এটা নিছক প্রচারকারীদের এটা দাবী যার কারণ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকার দেড় কোটি লোক যারা বহু বছর ধরে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছে তারা সহজেই রাশিয়ার জীবনযাত্রা এবং রাশিয়ার বিস্তারের সমর্থক হয়ে উঠে রাশিয়াই যদি শান্তির একমাত্র আশা হয়ে থাকে তাহলে রাশিয়ার পররাজ্য আক্রমণ সেটা প্রমাণ করেনা কিন্তু সাদাসিদে, অশিক্ষিত এবং শয়তান লোকেরা এটা দাবী করে—তাহলে গণতন্ত্র মুছে ফেলে স্টালিনবাদ চালু করা হয়না কেন ?

আগামী দশ বছরের মধ্যে এশিয়ায় এক কোটি লোক এবং ইউরোপের দশলক্ষ লোককে রাশিয়া এবং আমেরিকার জীবনযাত্রার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। আমেরিকার কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের রাশিয়ার পন্থা অনুসরণ করতে বলেছেন। হ্যারল্ড ল্যাস্কিও একথাই বলেছেন।

এ সকল ক্ষেত্রে ল্যাস্‌কির মত লোকের দায়িত্ব খুবই বেশী। গণতন্ত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও টিকে গিয়েছিলো কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে যে চিন্তার লড়াই চলেছে তাতে হয়তো গণতন্ত্র টিকবেনা (সেখানে সৌভাগ্যক্রমে গভর্ণমেন্টই এটা হতে দিচ্ছে) যদিনা সোঁভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বলা হয়।' এ-লড়াইয়ের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যে উদারনৈতিকরা, যারা ন্যায়সঙ্গতভাবে স্যাকো এবং ভেনজেটি অত্যাচার, স্কটস্‌ বরো মোকদ্দমা, কোন নিগ্রোর প্রতি অত্যাচার, অথবা খাঁটি আপত্তিকারীর প্রতি অসদ্ব্যবহার, অথবা কোন বই অথবা নাটক বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন তারাই আবার রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা সমর্থন করেন যেখানে নিষ্ঠুর হত্যা, বিতাড়ন, নিষ্ঠুর দমন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এবং আর্টিষ্ট ও লেখকের স্বাধীনতা দমন দৈনন্দিন ব্যাপার। তাদের এই অদ্ভুত আচরণের খানিকটা কারণ হচ্ছে, তাদের এই আশার জন্য যে রাশিয়ার ব্যবস্থা বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক গোলযোগের অবসান ঘটাবে।

ইতিমধ্যে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত কেনাবেচা বন্ধরাখা সত্ত্বেও রাশিয়াতে স্বর্গরাজ্য হয়নি। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে অত্যাচারীকে গদিতে বসিয়ে যে একনায়ক রাষ্ট্রের এবং পুঁজিবাদীর সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে সেটা সৌজন্য, প্রাচুর্য্য অথবা শান্তির অভিগামী নয়। আর একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে।

জোসেফ স্টালিন

একদিন বিকেলের দিকে মারকুসা আমাকে অবাক করে দিয়েছিলো। যদিও সে রাশিয়া সম্বন্ধে একটি উপন্যাস লিখছিলো (১৯৪৪ সনে "রাশিয়াতে আমার জীবন" লেখার পরে) তবু আমার রিসার্চের কাজে সাহায্য করতে তার সময়ের অভাব হয়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে লাইব্রেরীতে সে পেয়ে গেল ১৯২৫ সনের জুনমাসে 'কারেণ্ট হিস্ট্রি'তে প্রকাশিত আমার একটা প্রবন্ধ যার কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। যে পরিমাণ উৎসাহে মানুষ পুরাণো চিঠি কিম্বা ডায়েরী পড়ে যা অতীত জীবনের হারানো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয় সেই পরিমাণ উৎসাহের সঙ্গে আমি ও লেখাটা পড়েছিলাম।

স্টালিন সম্বন্ধে একথাটা লেখা ছিল • "কমিউনিষ্টপার্টির সেক্রেটারী স্টালিন, জিনোভিয়েভের চেয়ে বলিষ্ঠ এবং ক্ষমতাশালী, অনেকেরই মতে তিনজনেব মধ্যে তিনিই প্রধান ব্যক্তি (জিনোভিয়েভ—কামেনেভ—স্টালিন, তিনজন যারা ১৯২৪ সনে লেনিনেব মৃত্যুর পর রাশিয়ার শাসন-কর্ত্তা হয়েছিলেন। যুগোশিভিলি পরিবারে জন্ম, ধর্ম্মযাজকের কাজের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিপ্লবী কাজের জন্য পাঁচবার ধৃত, সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত পাঁচবার এবং পাঁচবার পলাতক, স্টালিন, স্বভাবতঃ নির্ব্বাক এবং লাজুক কিন্তু বলশেভিক রাষ্ট্রের পিছনে তিনিই রহস্যময় শক্তি। তিনি একজন ভাল কর্ম্মী এবং বক্তা। তর্কের সময় তিনি খাতির করে কথা বলেন না বরং নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে পড়েন এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন যা অনেক সময়ে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যায়। তিনি ভাবপ্রবনতাহীন, বিপ্লবী ইস্পাতের মত তাঁর ইচ্ছাশক্তি, জেস্যুইটের মত তিনি কঠোর, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সকল রকম বাধা

অতিক্রম করতে প্রস্তুত। যে সামান্য কথা তিনি বলেন তার থেকেই অসাধারণ শক্তির সৃষ্টি হয়। তাঁর অফিস, যেখানে তিনি রাতদিন বসে কাজ করেন, সেটা হচ্ছে অসাধারণ শক্তির উৎস এবং এর থেকেই বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় যা সমস্ত পার্টিকে অনবরত কার্য্যে ব্যাপৃত রাখে। তিনি হচ্ছেন এর সেক্রেটারী এবং সেজন্য প্রধান ম্যানেজার।

"লেনিন স্টালিনকে বিশ্বাস করতেন। স্টালিন কাউকেই বিশ্বাস করেননা" এইভাবে লোকেরা রাশিয়াতে স্টালিন সম্বন্ধে আলোচনা করে। এটা সত্যি কিম্বা মিথ্যা যাই হোক, এথেকেই বোঝা যায় সাধারণ লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবে। তাঁর ছবি একথাটা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর চোখের কোণে যে কুঞ্চনরেখা আছে তা তাঁর দূরদর্শিতা এবং প্রাচ্যদেশীয় ধূর্ত্তামির পরিচয়।

বর্ত্তমানকালে স্টালিন পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে খুবই পরিচিত, কারণ তিনি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তার কারণ এই নয় যে তাঁর দেশই পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী দেশ, তার কারণ তিনি ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার করেন।

স্টালিন শক্তিমান ব্যক্তি। তিনি ক্ষমতা খাটাবার নিয়ম জানেন। তিনি নিজের দেশের মধ্যে ক্ষমতাবান হতে চেয়েছিলেন এবং তা পেরেছেন। তিনি বিদেশেও তাঁর ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন এবং তা পাবার জন্য চেষ্টা করছেন।

"স্টালিন" হচ্ছে জোসেফ ভিসারিওনভিচ যুগোশিভিলি নামক ব্যক্তিটির ছদ্মনাম, তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৮৭০ সনে কোন এক মুচির ঘরে। তাঁর বাবা কেবল মদ খেতেন আর তাঁর মা ছিলেন ধর্ম্মশীলা এবং তাঁকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন লেখাপড়া শিখতে কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন স্টালিন।

স্টালিন মানে হচ্ছে ইস্পাত। ইস্পাত লম্বা এবং শক্ত হতে পারে। একে আবার পাতলা স্প্রিং এবং ঘুরিয়ে লাগাবার স্ক্রুতে পরিণত

করা যায়। স্টালিন শক্ত এবং কঠোর, নমনীয় এবং পরিবর্ত্তনশীল। তিনি খুব তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করতে পারেন আবার অসামান্য ধৈর্য্যেরও পরিচয় দিতে পারেন। তখন পারেন তিনি লক্ষ্য স্থির করে বসে থাকতে যখন অন্যেরা অধৈর্য্য হয়ে কাজ করে ফেলে এবং বিফল মনোরথ হয়। তিনি যেটা করেন ভালভাবে করেন, তিনি গতিশীল এবং শুষ্ক। যারা তাঁকে মেনে চলে তাদের তিনি আবৃত করেন কিন্তু যারা তাঁর বিরুদ্ধবাদী তাদের তিনি কখনো ক্ষমা করেন না। তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রখর।

সোভিয়েট নেতারা আত্মজীবনী রচনা করেননা। আমরা স্টালিনকে বিচার করি তাঁর লেখা এবং বক্তৃতা থেকে কিন্তু প্রধানতঃ রাশিয়া কি তা থেকে, কারণ ১৯২৬ সন থেকে তিনিই রাশিয়াকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করছেন। সোভিয়েট রাশিয়াকে জানতে হলে স্টালিন সম্বন্ধেও কিছু জানতে হবে, এবং স্টালিনকে জানতে হলে সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধেও কিছু না কিছু জানা হয়ে যাবে।

ইউরোপে সম্মিলিত শক্তির বিজয়ের পর, জেনারেল ডুইট ডি আইসেনহাওয়ার ফ্রাঙ্কফোর্টে মস্কোর বীর, বার্লিন বিজেতা এবং লালফৌজের অধিনায়ক মার্শাল জুকভকে এক ভোজসভাতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তুই সামরিক নেতার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হয়েছিলো। ১৯৪৫ সনের ১৮ই জুন তারিখের 'নিউইয়র্ক হ্যারলড্ ট্রিবিউন' পত্রিকাতে এবং জার্ম্মানীতে আমেরিকার সেনাবিভাগের সরকারী দলিলে এটা প্রকাশিত হয়েছিলো।

জুকভ—আমাদের অধিকৃত অঞ্চলে কতগুলো জার্ম্মান তেলের কারখানা রয়েছে। আমরা এগুলো ঠিক করে ফেলেছি কিন্তু এখন পর্য্যন্ত চালু করতে পারছিনা। শুনেছি আপনার এলাকায় কারখানাগুলো চালু করে ফেলেছেন। আমার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ

গিয়ে দেখে আসতে পারে আপনি এগুলো কেমন করে চালু করলেন ?”

আইসেনহাওয়ার—“নিশ্চয়ই, তাদের পাঠিয়ে দেবেন। কি করে চালু করতে হয় আমরা তাদের দেখিয়ে দেব।”

জুকোভ—“(আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে) আপনি কি বলতে চান যে আপনার গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এ বিষয়ে অনুমতি নিতে হবেনা ?”

আইসেনহাওয়ার—“নিশ্চয়ই না, আপনি তাদেব পাঠিয়ে দেবেন।”

জুকভ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি গুপ্তচর বিভাগের কিম্বা স্টালিনের অনুমতি ব্যতীত এমন কিছু করতে সাহস পেতেন না। এমন কি অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদেরও কোন সিদ্ধান্ত করবার স্বাধীনতা নেই; তারা কেবল আদেশ গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে স্টালিনের গড়া সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থা।

এথেকেই আমরা রাশিয়া এবং স্টালিন সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি।

১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাসের ‘রিডারস্ ডাইজেষ্ট’ যুক্তরাষ্ট্রের চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট এরিক, এ, জনষ্টনের “জোসেফ স্টালিনের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা” নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন। মিঃ জন্ষ্টন্ আমাকে বলেছিলেন যে প্রবন্ধের মধ্যে যে কথাবার্ত্তার উল্লেখ করা হয়েছে তা স্টালিনের অফিস থেকে এ সম্বন্ধে যে সরকারী-দলিল প্রকাশিত হয়েছিলো তারই হুবহু অনুবাদ।

এরিক জন্ষ্টন্ সাইবেরিয়া ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। তিনি স্টালিনকে বলেছিলেন, “আমি আমার সঙ্গে চারজন আমেরিকান সংবাদদাতা উরেল পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।”

“কেন নেবেননা,” স্টালিন বলেছিলেন।

“তার মানে কি আমি তাদের নিয়ে যেতে পারব ?”

“নিশ্চয়ই এর মানে তাই।”

“আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ,” মার্শাল স্টালিনকে জন্ষ্টন্ বলেছিলেন;

"কিন্তু আমি জানিনা মিঃ মলোটভ সমর্থন করবেন কিনা। তাঁর অফিস (পররাষ্ট্র বিভাগ) এখন পর্য্যন্ত সম্মতি জানায় নি।"

"মলোটভ," জন্‌ষ্টন্ লিখেছিলেন, "যিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, স্টালিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাড়াতাড়ি জোরের সঙ্গে বললেন, "আমি সবসময় মার্শাল স্টালিনের মতে মত দিই।"

মার্শাল একদিকে মাথাটা খাড়া করে দিলেন। একটা প্রশস্ত ভয়ঙ্করতা তার মুখটাকে উজ্জ্বল করে তুলল। "মিঃ জন্‌ষ্টন্ আপনি নিশ্চয় আশা করেন নি যে মিঃ মলোটভ আমার সঙ্গে একমত হবেন না, আপনি কি এ আশা করেছিলেন ?"

এথেকেই একনায়ক স্টালিন, মানুষ স্টালিন এবং রাশিয়াকে বোঝা যায়।

ইউনাইটেড প্রেসের ফ্রেডরিক কু এবং আমি দেশরক্ষা সচিব আর খুব সম্ভব মস্কোর তৃতীয় নম্বর সোভিয়েট নেতা মার্শাল ভরোশিলভের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বিদেশে সংবাদ প্রেরণের আগে কু'র সংবাদগুলোর উপর কাঁচি চালাবার দরকার ছিল। ভরোশিলভ নিজে এ কাজটা করতে সাহস পাননি। তিনি এটা স্টালিনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথমতঃ অধিনায়ক নিম্নতন কর্ম্মচারীদের কোনরকম জটীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। তারপর কিছুদিন পরে তারাও তা চায়না। এটা সোজা এবং নিরাপদও বটে। সোভিয়েট কর্ম্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ব্যাপার হচ্ছে সমস্ত দায়িত্ব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর হাতে ছেড়ে দেওয়া। একবার টোকিয়োর সোভিয়েট দূতাবাস থেকে মস্কোতে তার মারফৎ জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে তারা কোন টি-পার্টি দিতে পারে কিনা। আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সব সময়েই দেরী করে ফেলে কারণ তাদের ভোট কিম্বা কোন প্রশ্নের জবাব দেবার আগে ক্রেমলিনের

কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতে হয়। যখন স্টালিন মিঃ মলোটভকে এরিক জন্‌ষ্টনের সামনে মাথা নীচু করেছিলেন তখন নিশ্চয়ই মলোটভের নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিল। এভাবেই সমস্ত সোভিয়েট কর্ম্মচারীরা নিজেদের ছোট মনে করে এবং তার পর তারা ছোট হয়ে যায়। এতে স্টালিনের চেয়ে আর কেউ বোধহয় বেশী সুখী হয়নি।

এই নীতির ফলে সোভিয়েটের প্রতিটি সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মনে স্টালিনের নাম যুক্ত হয়। সোভিয়েট-নাৎসী যুদ্ধের প্রথম কয়েকমাস যখন লালফৌজ ক্রমাগত হটে যাচ্ছিল, তখন স্টালিনের নাম সংবাদপত্র এবং রেডিওতে খুব কমই শোনা যেত। প্রথম পর্য্যায়ের মনস্তত্ত্ব হলেও, স্টালিন সত্যিই চমৎকার মনস্তাত্বিক; যখন সাধারণ লোকেরা পরাজয়ের কথা ভাবছিলো তখন তাঁর নিজের কথা তিনি তাদের মনে করতে দেননি। যে মুহূর্ত্তে লালফৌজ ভাল ফল দেখাতে লাগলো, স্টালিনের নাম আবার শোনা গেল, এবং বিজয়ের গৌরব তিনিই দাবী করতে লাগলেন।

অনবরত প্রচারের ফলে স্টালিনকে নিয়ে যে গল্প রচনা করা হয়েছে তাতে তাঁকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এটা ঠিক কিনা আমি জানিনা; ভিতরের কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া একথা আর কেউ জানেনা। সে গোষ্ঠীর কেউ প্রচারের জন্য কোন কথা বলেনা। মস্কো—ওয়াশিংটন, লণ্ডন কিম্বা প্যারিস নয় যেখানে প্রত্যেকটি ব্যাপারই আগে কিম্বা পরে হলেও প্রকাশিত হয়। কে বলতে পারে স্টালিন নিজে যুদ্ধ চালাবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন না কোন সেনাধ্যক্ষ কিম্বা সেনাধ্যক্ষ-মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রস্তুত সে পরিকল্পনায় তাঁর কেবলই মাত্র অনুমোদন ছিল?

চার্চ্চিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক লর্ড মরেন বলেছিলেন, "স্টালিনের

মন বুঝতে পারা সোজা নয়।” চার্চ্চিল তাঁকে একথা বলেছিলেন। চার্চ্চিল উদার রুজভেল্টকে সঙ্গে নিতে পারতেন, কিন্তু ককেশাস পর্ব্বতের আত্মপ্রতিষ্ঠ লোকটি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীর সমানেও তাঁর নিথর মৌনতাকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

স্টালিন তাঁর স্বাভাবিক প্রকৃতি নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁর কার্য্যকলাপ, কথাবার্ত্তা, প্রকাশভঙ্গী, নিস্তব্ধতা এবং অনুপস্থিতি সব কিছুই একটা যত্নকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়। সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের সময় যে হাসি তিনি হেসেছিলেন, সে হাসিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যজাত ছিল; হিটলারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সে হাসি।

স্টালিন চার্চ্চিলকে তাঁর মনের খবর দিতে চাননি।

১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর বলশেভিকরা স্টালিনকে “খোজ্যাইন” অথবা “বড়কর্ত্তা” বলতো। হঠাৎ নির্দ্দেশ পাওয়ামাত্র তারা তাঁকে অধিকতর আদরের ডাক“স্টারিক” অথবা “বুড়ো” বলে সম্বোধন করতে থাকে। একনায়কত্বে সমস্ত জিনিষ এমনকি ডাকনাম পর্য্যন্ত হিসাব করে বেঁধে ধরে দেওয়া হয়।

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ স্টালিনকে লোকের মনের কোনে স্থান করে দেবার চেষ্টা করেছে।

১৯৪৫ সনে হোয়াইট রাশিয়ার প্রজাতন্ত্রের ২,৫৪৭,৩৬০ সংখ্যক অধিবাসী নিজেরা স্বাক্ষর করে স্টালিনের কাছে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা জানিয়ে এক দরখাস্ত পাঠায়। ১৯৪৫ সনের ১৮ই নবেম্বর জোসেফ বারনস্ মস্কো থেকে ‘নিউইয়র্ক হ্যারলড্ ট্রিবিউনে’ এ সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন যে “কজাক সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পঞ্চবিংশতিতম উৎসব আজ সকালে স্টালিনের কাছে পঁচিশ লক্ষেরও অধিক লোকদ্বারা স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ ক’রে অনুষ্ঠিত হয়।” কজাক প্রজাতন্ত্র হচ্ছে সামান্য বসতিপূর্ণ মধ্য

এশিয়াতে বিস্তৃত যায়গা যার লোকসংখ্যা মাত্র প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে চারজন। স্টালিন জানেন যে যুদ্ধক্লান্ত দেশে, পরিশ্রান্ত কর্ম্মচারীদের এসব দরখাস্ত (যা বর্ত্তমানে রাশিয়াতে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে) যোগাড় করতে কত সময় পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করতে হয়েছিলো।

(১৯৪৬ সনের ৬ই এপ্রিল তারিখে জেনারেলসিমো ফ্রাঙ্কোকে ৭০০০,০০০ লোক আনুগত্য জানিয়ে স্বাক্ষরযুক্ত পঞ্চাশখানা বাঁধানো বই উপহার দিয়েছিল। শ্রমিকমন্ত্রী গিরোন, যিনি এই উপহার প্রদান করেছিলেন, ফ্রাঙ্কোকে বলেছিলেন, "আপনি হচ্ছেন স্পেনের একমাত্র অধিবাসী যাঁকে আমরা সকল অবস্থায়ই অনুসরণ করে চলবো।")

জোর করে পাওয়া আনুগত্য কখনও শক্তিমানকে ঠকাতে পারে না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ লোককে এবং সরল বিদেশীকে বোকা বানান। একটা জিনিষকে বারবার বলার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি রয়েছে।

"আমাদের প্রিয় পিতা, বন্ধু, এবং শিক্ষক, আমাদের গর্ব্ব, আমাদের সম্ভ্রম, বিশ্ববিশ্রুত স্টালিন", মস্কোর দৈনিক "ট্রাড" ১৯৩৯ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে একথা লিখেছিলো এবং একই ভাষা সমস্ত সোভিয়েট প্রকাশিত পত্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসের 'বলশেভিক' পত্রিকাতে সোভিয়েট ইতিহাস, দর্শন এবং ন্যায়নীতি সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে স্টালিনকে "বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক" বলা হয়েছে। লক্ষ গুণবিশিষ্ট প্রতিভাশালী স্টালিন যিনি সকল আশীর্ব্বাদের উৎস, প্রতিদিন তাঁর স্তুতি স্তাবকতার নূতন নূতন ফন্দী আবিষ্কৃত হচ্ছে আর সোভিয়েট সংবাদ-পত্রগুলোতে তা-ই উত্তরোত্তর বেশী করে স্থান অধিকার করছে।

শ্রেষ্ঠ একনায়কের জন্য "ফুরার" নীতি, যা বলশেভিকরা হিটলারের

আগে গ্রহণ করেছিলো, তার লক্ষণ কয়েকবছর আগে যখন দেখা দিয়েছিলো তখন আমার অসহ্য লাগছিলো। মস্কোর বিদেশী সংবাদদাতা কর্তৃক স্টালিনকে আক্রমণ করা যদিও পররাষ্ট্র বিভাগ পছন্দ করেনা তাহলেও আমি ১৯৩০ সনের ১৩ই আগস্টের "দি নেশ্যন" পত্রিকাতে নিন্দা করে লিখেছিলাম, "স্টালিনের ব্যক্তি-পূজার পাগলামি যা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে তারই বলে তিনি বড়রকমের প্রশংসা, খোসামোদ এবং সম্মানের পাত্র হয়ে পড়েছেন।...লেনিন কখনও এরকম অসঙ্গত ব্যাপার ঘটতে দিতেননা এবং তিনি এত বেশী সকলের প্রিয় ছিলেন যে স্টালিন সে লোকপ্রিয়তার কথা কখনও কল্পনা করতে পারেননা...এটা বলশেভিকবাদের পরিপন্থী এবং রাজনীতির দিক থেকে যুক্তিসঙ্গতও নয়। স্টালিন যদি এর জন্য দায়ী না হন তাহলে বলতে হবে তিনি এটা পছন্দ করেন। ইচ্ছা করলে সহজেই তিনি এটা বন্ধ করতে পারতেন।"

তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি এখনও এসব পছন্দ করেন। তিনি এসব বিষয়ে উৎসাহও দিয়ে থাকেন। যতই দিন যাচ্ছে ততই আকর্ষণহীন হয়ে পড়ছেন এবং অসৌজন্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। স্টালিনের নামে আটটা শহরের নামকরণ করা হয়েছে: স্টালিনগ্রাদ, স্টালিনো গোর্কস্ক, স্টালিনবাদ, স্টালিন, স্টালিনো, স্টালিনির, স্টালিনিসি এবং স্টালিনাউল। তাছাড়া বহু গ্রাম, কারখানা সমবায় কৃষিক্ষেত্র এবং স্কুলের নাম তো আছেই। দেবতার স্থানে মানুষকে তুলে দেবার এই প্রাচ্যদেশীয় মনোভাবের মধ্য দিয়ে বোধহয় স্টালিন "পিতা" হবার মানসিক ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে চান। তাছাড়া এটা একটা নিশ্চিত পন্থা যার সাহায্যে একনায়ক সাধারণের কাছ থেকে বাধ্যতা এবং ভালবাসা আদায় করতে পারেন। হয়তো স্টালিন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্ম্ম বঞ্চিত পীড়িত জাতি, গভর্ণমেণ্টকে দুঃখের কারণ বলে মনে করবে এবং সে গভর্ণমেণ্টের প্রতি বেশী করে

অনুগত হবে যদি একজন "পিতা" গভর্ণমেন্টের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হয়ে বসেন। সোভিয়েট নাগরিকেরা যে দেয়ালে ঘেরা দূর ক্রেমলিনে অবস্থিত তাদের পিতাকে ভালবাসে আমি তার কোন প্রমাণ দেখতে পাইনি। লেনিনকে স্নেহ করে "ইলিচ" বলে ডাকা হোতো। ভূতপূর্ব্ব দেশরক্ষামন্ত্রী মার্শাল ক্লেমেন্টি ই ভরোশিলোভকে সাধারণ লোক এবং শিশুরা সম্মান দেখিয়ে "ক্লিম" বলে ডাকে, (তার নামে নামকরা ভরোশিলোভ শহরটির নাম বদলে আবার পূর্ব্বের স্টাভ্রোপোল নাম দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু স্টালিন শতচেষ্টা সত্ত্বেও "স্টালিনই" (ইস্পাত) রয়ে গেছেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার জন্য তাঁকে সম্মান দেখান হয়, সাফল্যের জন্য প্রশংসা করা হয় এবং তাঁর দৃঢ় কার্য্যপদ্ধতির জন্য তাঁকে সকলে ভয় করে। তিনি এমন লোক নন যাকে ভালবাসা যায়। তিনি নিস্পন্দ। তাঁর মুখ দেখে মনে হয় যে তার ভিতরে সব কিছুই যায় কিন্তু বাইরে কিছুই প্রকাশ পায়না। হিটলার লক্ষ লক্ষ লোককে উন্মাদনা দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। চার্চ্চিল ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের বাইরের বহুলোককে মোহিত করেছিলেন। রুজভেল্ট তাঁর কণ্ঠস্বর, স্বভাবের মাধুর্য্য এবং উদাবরতার জন্য বন্ধুত্ব এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু স্টালিনেব মোহিনীশক্তিতে মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য অথবা উদারতা খুব অল্পই আছে। আমি একবার তাঁর পাশে বসে সওয়া ছ' ঘণ্টা কথাবার্ত্তা বলেছিলাম। তাতে আমি তাঁর শান্তশক্তি, শুষ্ক দৃঢ়তা, সজাগ কর্ম্মপরিচালনা এবং একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম। এগুলোর সঙ্গে তাঁর পাকা রাজনৈতিক দক্ষতা এবং উৎকৃষ্টতর সংগঠন নৈপুণ্য যুক্ত হয়ে তাঁকে ক্ষমতার অধিকার দিয়েছিলো কিন্তু পৃথিবীব অন্যান্য বিখ্যাত নেতারা সধারণের কাছে আবেদন করে তা পেয়েছেন। এই শক্তি তিনি বিশ বছর রক্ষা করে আসছেন—এটা কম শারীরিক

এবং রাজনৈতিক সাফল্য নয়। এরকম করতে গিয়ে তাঁকে প্রতিদিন অসংখ্য কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়েছে সকল গভর্ণমেণ্টকেই যার সম্মুখীন হতে হয়, বিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো দমন করতে হয়েছে তাঁকে এবং যেসমস্ত লোক একনায়কের ইচ্ছার সমালোচনা করে বা বাধাদেয় তাদের বিফল করতে চেয়েছেন, তাদের ধ্বংস করতে চেয়েছেন।

স্টালিনের সংগঠন-নীতি সামরিক কৌশলের মত। তাঁর নিজের শক্তি বাড়িয়ে তুলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর শত্রুর শক্তি খর্ব্ব করেন। তিনি এ নীতি অন্তর্জ্জাতিক কার্য্যক্ষেত্রে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় প্রয়োগ করেন। এই দু'ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর বিপক্ষ দলকে জব্দ করতে, বিভক্ত করতে, অক্ষম এবং পঙ্গু করতে অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করেন।

স্টালিন সোভিয়েট ব্যবস্থাকে এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন যে সেখানে একনায়ককে বাধা দান করবার কোন সুযোগই নেই। কৃষকেরা, যারা দেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা রাষ্ট্রের অধীনে সমবায় ব্যবস্থাতে বাস করে এবং তাদের দল সৃষ্টি করতে দেওয়া হয়না; গভর্ণমেণ্ট জমি কলকব্জা এবং সমবায় কৃষিক্ষেত্রের কলকব্জার মালিক এবং তাদের প্রধান খদ্দের। কাজেই কৃষকদের রাজনৈতিক একতা কিম্বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা নেই। ঠিক একই ভাবে শ্রমিকরাও গভর্ণমেণ্টের দাস; তারা কাজ বন্ধ রাখতে পারেনা; ট্রেডইউনিয়ান—যা মালিকদের কাছে দাবী জানায়, তার কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই। কয়েক লক্ষ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং সরকারী শিল্পের কর্ম্মাধ্যক্ষদেরও একনায়কের বিরাট শক্তিকে বাধা দান করবার ক্ষমতা নাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এ আমলাতন্ত্র ছাড়া সেখানে আর নেই কিছুই। কিন্তু রাশিয়াতে যে কাজ করে না সে খেতে পায়না এবং যে বাধা দিতে চায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার এই আমলতন্ত্রী শাসনপদ্ধতিই সৎ শাসনের বিরোধিতার পরিচয় দেয়,

সেখানে কোন লোক যেমন চাকুরিও পেতে পারে তেমনি আবার জেলেও যেতে পারে। মলোটভ থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে কারণ না দেখিয়ে কর্ম্মচ্যুত করা যেতে পারে। আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি যন্ত্রশক্তি যার বিদ্যুৎ সরবরাহ করে স্বয়ং একনায়ক। কমিউনিষ্ট পার্টি পর্য্যন্ত স্টালিনের বিরুদ্ধে কোন স্বাধীন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেনা। এক সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে রাজনৈতিক সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিল এই পার্টি কিন্তু বহিঃষ্করণের ফলে পার্টির সকল নেতারা অপসারিত হয়েছেন এবং যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও ভীতিগ্রস্থ হয়ে আছেন। কমিউনিষ্ট পার্টির বাইবে কোন রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ নেই এবং সেখানে রয়েছে নিস্তব্ধতা। এমনকি কারও প্রতিবাদ কিম্বা বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। গুপ্তচর বাহিনী গ্রেপ্তার কোরতে স্থির কবেনি সেজন্য স্বাধীনতা আছে। এ স্বাধীনতা স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেজন্য স্টালিনের রাশিয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের মত প্রকাশ কববাব কোন পথ নেই। যে ক্ষমতা সংবাদপত্র, ট্রেডইউনিয়ান, কৃষি-সমবায় এবং গভর্ণমেন্ট দপ্তবে থাকতো তা একনায়ক দখল করে বসে আছে। কাজেই জনসাধারণেব অসন্তোষ থাকলে পবেও এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতব দিয়ে তা প্রকাশ করবার উপায় নেই। লোকেরা কেবল ইচ্ছা করলে দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং ভারতবর্ষের মত অহিংস অসহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু উপরের দিকে পুলিশের কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা খুবই কম। একরকম অসম্ভব। 'জিপিইউ' সোভিয়েট জনসাধারণের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছে এবং সেজন্য তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট কবে ফেলেছে।

একজাতীয় প্রজাতন্ত্র, যেমন ধরা যাক ককেসাসে জর্জ্জিয়া, মস্কোর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে যদি

এর স্থানীয় কর্ম্মচারীরা বিদ্রোহে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। কিন্তু জাতীয় প্রজাতন্ত্রের গভর্ণমেন্টগুলো, যা নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ান গড়ে তোলা হয়েছে, সেগুলো রাশিয়ান এবং কমিউনিষ্টদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এবং তারা ক্রেমলিনের কাছ থেকেই আদেশ গ্রহণ করে। লালফৌজের সাহায্য ছাড়া কোন বিদ্রোহই কৃতকার্য্য হতে পারেনা।

লালফৌজ এবং গুপ্তচর বিভাগ এ দুই প্রতিষ্ঠানই কেবল স্টালিনের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারে। যেভাবে স্টালিন তাদের পরিচালিত করেন তা থেকেই তার প্রতিভা এবং প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সোভিয়েট গুপ্তচর বিভাগ অথবা 'এন্ কে ভি ডি' (আন্তর্জ্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত জন প্রতিষ্ঠান) যাকে লোকেরা এখনও 'জিপিইউ' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে, তাদের লোক সমস্ত শহরে, গ্রামে, কারখানা এবং অফিসে রয়েছে। রাশিয়াতে শহরের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাড়ীগুলো 'জিপিইউ'এর হেডকোয়ার্টার এবং জেলহিসাবে ব্যবহার করা হয়। নিজের শক্তি লুকিয়ে রাখা 'জিপিইউ'এর ধাতের বাইরে। এর কার্য্যকলাপ গোপনীয় কিন্তু এরা যে কাজ করে যাচ্ছে তা গোপন রাখা যায়না।

জিপিইউ অসংখ্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করে। আমি বিদেশী শ্রমিকের সাহায্যে এদের খাল এবং রেলরাস্তা প্রস্তুত করতে দেখেছি। তাছাড়া 'জিপিইউ'র সশস্ত্রবাহিনী আছে যাদের কাজ হচ্ছে সীমান্তে যাতায়াত ব্যবস্থা করা এবং বিখ্যাত বাড়ী-ঘর রক্ষা করা।

আমি অনেক জিপিইউ কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছি, তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ উভয়েই আছে। কেউ কেউ সামরিক

পোষাক পরিহিত এবং কেউবা অসামরিক পরিচ্ছদ পরিহিত। কেউ রয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নে আর কেউ রয়েছে বিদেশে সোভিয়েট দূতাবাসে তাদের নিজেদের এবং বিদেশী রাষ্ট্র নায়কদের দেখবার জন্য। কেউ আদর্শবাদী এবং মনে করে যে তাদের কাজ যদিও আনন্দদায়ক নয় তা'হলেও প্রয়োজনীয়। কেউ বা বিলাসী, প্রদত্ত মর্য্যাদায় সুখী। কঠোর পরিশ্রম, গোপনীয়তা এবং ভীতির জন্য এরা সকলেই প্রসিদ্ধ কারণ জিপিইউ তাদের নিজেদের দলের লোকের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য যে শাস্তি বিধান করে তার তুলনায় অন্যের প্রতি শাস্তি বিধান এত কঠোর নয়। সকলেই একটা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের কাজের জন্য গর্ববানুভব, "আর্টের জন্যই আর্ট" এরকম একটা অনুভূতি সকলের মধ্যে রয়েছে। জিপিইউ অতীতের একটা ভ্রাতৃগোষ্ঠির মত; যেখানে নিস্তব্ধতার প্রতিজ্ঞা, প্রধান কর্ত্তব্যের জন্য আত্মোৎসর্গ, বিশেষ মর্য্যাদা ও সুখ সুবিধা এবং পরাজয়ের ভীতি, সেখানে তাদের সকলকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে।

জিপিইউ হচ্ছে স্টালিনের আধ্যাত্মিক শিশু।

কয়েক বছর জিপিইউ এরকম মনে করতো যে তাদের সংখ্যা, অস্ত্রশক্তি, যাবতীয় প্রধান কাজের সমন্বয় এবং একনায়কের পক্ষে তাদের প্রয়েজনীয়তা তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছে। একনায়ক যে ব্যবস্থা অবলম্বনে শক্তি বৃদ্ধি এবং শত্রু পক্ষের ধ্বংস করেছিলো (যা সবগুলিই খারাপ ছিলনা), সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকার জন্য তারা এভুল করেছিলো যে তারা রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

১৯৩১ সনে জিপিইউ স্টালিনকে অমান্য করেছিলো। আমি 'দি নেশ্যনে' একথা লিখেছিলাম এবং পরে ১৯৩৩ সনের ৯ই আগষ্টের 'দি নেশ্যন'এ এর পরিণতি সম্বন্ধে লিখেছিলাম। উভয় প্রবন্ধই মস্কো থেকে পাঠিয়েছিলাম।

আমি ১৯৩৩ সনের 'দি নেশ্যনে' একথা পরিষ্কার করে লিখেছিলাম, "দুবছর আগে আকুলোভ জিপিইউ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং একারণে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা য়াগোডার প্রাক্তন স্থান অধিকার করে বসেন। বাহ্যতঃ আকুলোভ ও স্থায়ী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় এবং অতি সত্বরই তাঁকে তাঁর সংস্কারমূলক ইচ্ছা নিয়ে একটি নিম্নতর চাকুরিতে ডনেৎস কয়লাব ক্ষেত্রে যেতে হয়েছিলো।"

য়াগোডা, যিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত জিপিইউ এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন, আকুলোভের সঙ্গে একত্র কাজ করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে আকুলোভকে স্টালিন সরাতে বাধ্য হন এবং য়াগোডাকে পূর্ব্বস্থানে বসান। জিপিইউ স্টালিনের বিরুদ্ধে একদফা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলো।

কিন্তু স্টালিন সহজে পরাজয় স্বীকার করবার লোক নন। স্বাভাবিকভাবে, তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন এবং আবার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় বার তিনি আকুলোভকে জিপিইউ এর কাজের জন্য নির্ব্বাচন করেননি। তিনি তাকে এর বাইরে এবং উপরে স্থান দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

আমি 'দি নেশ্যনে' লিখেছিলাম "আকুলোভ একজন পুরাণো বলশেভিক এবং লেনিনের সহকর্ম্মী, তাঁকে সোভিয়েট ইউনিয়ানের এটর্নী জেনারেল নিযুক্ত করা হয়েছে। এটা একটা নতুন কাজ... আকুলোভের সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক কাজ হবে জিপিইউ এর কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখার অধিকার রক্ষা করা। এটর্নী জেনারেলের কাজের মধ্যে একটা কর্ত্তব্য হচ্ছে, "জিপিইউ এর কার্য্যকলাপ আইনসঙ্গত এবং নিয়মমত কিনা তার দেখাশুনা করা।"

এই পরিবর্ত্তনের ফলে বলশেভিক ভীতি অনেকটা কমে গিয়েছিলো। আমি দেখেছি য়াগোডা কর্ত্তৃক সোভিয়েট নাগরিক গ্রেপ্তার হয়েও

আকুলোভের হাতে ছাড়া পেতো। তিনি অবশ্য মৃতের জীবন দান করতে পারতেননা তবে তিনি মিথ্যা আসামীদের কাউকে কাউকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

১৯৩৩ সনের শেষের দিকে এবং সারা ১৯৩৪ সনে দেশের অবস্থা বেশ শান্ত ছিল। সোভিয়েট ইতিহাসে এই প্রথম, যে গুপ্তচর বিভাগ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ছাড়া কোন ইঞ্জিনিয়ার কিম্বা লালফৌজের কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করতে পারতোনা।

১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে জিপিইউএর কতোগুলো বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপার সোভিয়েট বিচারালয়ে হস্তান্তরিত করা হয়েছিলো এবং জিপিইউএর নাম পরিবর্ত্তন করে রাখা হয়েছিলো স্বরাষ্ট্র কমিসোরিয়েট। সাতমাস এ কমিসোরিয়েট কমিসার ছাড়াই চলেছিলো। এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। স্টালিনের য়াগোডাকে এ কাজে নিযুক্ত করতে আপত্তি ছিল। শেষে, ১৯৩৪ সনের জুলাই মাসে য়াগোডা কমিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। য়াগোডার যদিও খানিকটা ক্ষমতা লোপ পেয়েছিলো তাহলেও তিনি আবার জয়লাভ করেছিলেন।

১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে সার্জি কিরোভের হত্যার ফলে কিছু ফাঁসি এবং দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হয়েছিলো কিন্তু তাতে সরকারের উদারনীতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ১৯৩৬ সনে স্টালিন পন্থায় শাসন ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে।

শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের কাজ হত হল প্রসিদ্ধ মস্কো বিচার এবং বহিরষ্করণনীতির পুনরভিনয়ে। হাজার হাজার সোভিয়েট কর্ম্মচারীকে, আমি 'মেন ও পলিটিসে' এদের শত শত লোকের নাম করেছিলাম, গুলি করে মারা হয়েছিলো কিম্বা নির্ব্বাসিত করা হয়েছিলো।

সোভিয়েট শাসনব্যবস্থাকে সম্মান দেখানোর চেয়ে বরং বেশী করে আক্রমণ করা হয়েছিলো। কেউ কেউ মনে করেন কাগজে কলমে

যা লেখা রয়েছে তা ঠিকই আছে। কিন্তু স্টালিনী শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে উল্লেখ আছে তা সোভিয়েট নাগরিক জীবনে নেই। লোকেরা মনে করেছিলো যে তারা এ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে এবং সেজন্য তারা আনন্দিতও হয়েছিলো। এ আনন্দ থেকেই লোকের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা এবং তার অভাবের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণেই হয়তো সোভিয়েট নেতৃত্ব শাসনব্যবস্থা নাকচ করবার চেষ্টা করেছে; দেশবাসীরা একে খুবই উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলো। জিপিইউ হয়তো স্টালিনকে এ সম্বন্ধে জাতির মনোগত ভাবের কথা জানিয়েছিলো আর তাতে তার বিশ্বাস জন্মেছিলো যে স্বাধীনতা একনায়কত্ব ধ্বংস করে ফেলবে। ব্যাপারটাই হচ্ছে যে বিচার আর বহিঃষ্করণনীতি এবং তার আনুসঙ্গিক বিভীষিকা শাসন ব্যবস্থাকে অর্থহীন করে ফেলেছিলো। ১৯৩৪ সনে ভীতির ভাবের উপশম হবার পর, ১৯৩৫ সনে শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন, এবং ১৯৩৬ সনে এর প্রচারের পর, বিচারের নমুনা দেখে আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ বিচারে কেবল যে প্রসিদ্ধ লোককেই হত্যা করা হয়েছিলো তা নয়, গণতন্ত্রেরও অবসান হয়েছিলো।

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সনের বিচার গুপ্তচরবিভাগের কর্ত্তা জেনরিক য়াগোডা খুবই তৎপরতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৮ সনের ২রা মার্চ্চ হিটলারের মত গুম্ফ-বিশিষ্ট, ছোট, রোগা একটি লোক, য়াগোডা নিজেই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মস্কোবিচারে আসামী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৩ই মার্চ্চ দেশদ্রোহিতার অপরাধে আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। শেষ পর্য্যন্ত যে লোক তার বিরোধিতা করেছিলো স্টালিন তাকে সরিয়ে ফেললেন।

য়াগোডার পরে এসেছিলেন পাঁচফুট লম্বা ইজভ। তিনি বহিঃষ্করণ নীতি জোরে চালালেন। তারপর স্টালিন তাকে সরিয়ে ফেলেন। ইজভের পরে এসেছিলেন লেভ্রেন্টি বেড়িয়া,

স্টালিনের মতই জর্জ্জিয়ার অধিবাসী, বেটে এবং নৃশংস। ১৯২৪ সনে যখন জর্জ্জিয়ার গুপ্তচরবিভাগের প্রধান কর্ত্তা হিসাবে জর্জ্জিয়ার মেন্‌সেভিকদের তিনি ধ্বংস কোরছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার টিফলিসে কথাবার্ত্তা হয়েছিলো। স্টালিনের জন্যই তাঁর উন্নতি হয়। বেড়িয়ার নেতৃত্বে, জিপিইউ একনায়কের সম্পূর্ণরূপে অনুগত এবং বাধ্য, সোভিয়েট লেখকের ভাষায় "জ্বলন্ত তরবারি" হয়ে পড়ে। এটর্ণী জেনারেলের কথা লোকে ভুলে যায়।

১৯৪৬ সনের ১৪ই জানুয়ারী কর্ণেল জেনারেল সার্জ্জি, এন, ক্রুগলিয়ৎ বেড়িয়ার মসনদে বহাল হলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ানে জিপিইউর অধিকর্ত্তা স্টালিনের পরে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোক এবং যে লোক বহুদিন যথেষ্ট ক্ষমতা পরিচালনা করেছে সে উচ্চাভিলাষী, অতএব ভীতিপ্রদ। স্টালিন তখনই রক্ষীব পরিবর্ত্তন করেন যখন মনে করেন যে সে স্বাধীন ভাবে চলতে চায়।

জিপিইউ হচ্ছে স্টালিনের বাধ্য যন্ত্র।

স্টালিন লালফৌজকে নিয়েও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

জেনারেল, সামরিক কর্ম্মচারী-গোষ্ঠী এবং সেনাবিভাগ এমনকি গণতন্ত্রেও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তার করে — যেখানে সাধারণ লোকের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা অবাঞ্ছিত এবং যেখানে "বোনাপার্টিবাদ"-এর স্বাভাবিক ভীতি উপস্থিত। সামরিক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র নানারকম বাধা সৃষ্টি করে: যেমন অবাধ-নির্ব্বাচন, নির্ব্বাচিত অসামরিক কর্ম্মচারী, পরিষদ যা সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করে, এবং স্বাধীন সংবাদপত্র যা শাসনব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করতে গেলে তা সাধারণের কাছে প্রকাশ করে এবং এরকম নানা ধরণের ব্যবস্থা। কিন্তু একনায়কত্ব থাকবেনা যদি বেশীর ভাগ লোক বিনা আপত্তিতে একে মেনে নেয়। সাধারণের কাছ থেকে অনুমোদন না পেলে একনায়কত্বকে গণতন্ত্রের

চেয়ে বেশী করে সমরবিভাগের উপর নির্ভর করতে হয়। এতেই সমরবিভাগের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। জাপানে সমরবিভাগ শাসন পরিচালনা করতো। হিটলার তার জেনারেলদের উপর কড়া নজর রেখে চলতেন; তারা তাঁর কথামত অনেকের সৎ পরামর্শ উপেক্ষা করে সেনাদলকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছিল; তাহলেও অনেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য ষড়যন্ত্রও করেছিলো। মুসোলিনিরও সেনাবিভাগ নিয়ে গোলমাল লেগেছিলো। স্পেন, আর্জেন্টিনটাইন এবং অন্যান্য স্থানেও একনায়কত্ব কষ্ট করেও সমরবিভাগের উপর নির্ভর করে থাকে।

লালফৌজের জনপ্রিয়তার জন্যই তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছে। এটা হচ্ছে জনসাধারণের সেনাদল এবং সেজন্য লোকে তাকে পছন্দ করে। সোভিয়েট একনায়কত্ব শুষ্ক মানযন্ত্রের মত এবং এর নেতারা, স্টালিন, মলোটভ, জাদানোভ, আন্‌দ্রিয়েভ, ম্যালেন্‌কোভ, কেউই জনসাধারণেব সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হননি। লালফৌজ, অপর পক্ষে প্রাণবন্ত। এর মার্শাল এবং জেনারেলরা—জীবিতাবস্থায় টুখাচেভেস্কি, টিমোশেঙ্কো, জুকোভ এবং অন্যান্যরা—সকলেরই প্রিয়।

লালফৌজকে নিয়ে স্টালিনের অসুবিধা দু'জন লোকের ভাগ্য থেকেই বোঝা যায়: জেনারেল বোরিস এম. শ্যাপোস্নিকোভ এবং মার্শাল মাইকেল এন টুখাচেভেস্কি।

শ্যাপোস্নিকোভের জন্ম হয় ১৮৮২ সনে এবং তিনি জারের সেনাদলে কর্ণেলের কাজ করতেন। সামরিক বৃত্তিই তাঁর নিজের বৃত্তি ছিল এবং রাজনীতিতে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিলনা। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেননি, তখনই তাঁর উচ্চ সামরিক পদের জন্য পার্টিতে যোগদান করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। হাজার হাজার জারীয় অফিসারদের মত তিনিও ১৯১৮

সনে লালফৌজে যোগদান করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিক এবং বিদেশের আক্রমণ থেকে নিজের দেশকে তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

১৮৯৩ সনে টুখাচেভেস্কির জন্ম হয়। তিনি ছিলেন অন্য শ্রেণীর লোক। তিনি জারের সেনাদলে তরুণ লেফটেনেণ্ট ছিলেন এবং ১৯১৮ সনের এপ্রিল মাসে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। তখন এরকম সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এতে অতিরিক্ত বিপদ এবং দায়িত্বও ছিল। সাতাশ বৎসর বয়সে টুখাচেভেস্কি পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ওয়ারস পর্য্যন্ত লাল-ফৌজের প্রশংসনীয় আক্রমণকালে অধিনায়কত্ব করেছিলেন। ইউরোপে তিনি বর্ত্তমান যুগের নেপোলিয়ান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সামরিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও টুখাচেভেস্কি রাজ-নীতি চর্চ্চা করতে পছন্দ করতেন। লালফৌজের অনেক অল্পবয়স্ক কমিউনিষ্ট অফিসার নেতৃত্বের জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো।

রাশিয়ার অরাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী পুরাণো সামরিক বিশেষজ্ঞ যেমন শ্যাপোস্নিকোভ অল্পবয়স্ক কমিউনিষ্ট অফিসার তেমনি টুখাচেভেস্কি,—এই দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল। স্টালিন শ্যাপোস্নিকোভকে সমর্থন করলেন।

১৯২৬ সনে শ্যাপোস্নিকভ লালফৌজের সেনাবিভাগীয় অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু টুখাচেভেস্কির দলের অফিসারদের চাপের ফলে তাঁকে সরতে হয়েছিলো এবং ভলগা জেলাতে ছোট একটা কাজে তাকে বদলী করা হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত টুখাচেভেস্কি সেনাবিভাগীয় অধিনায়ক হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সনের ১১ই মে তারিখে টুখাচেভেস্কিকে অপসারিত করে ভলগা জেলাতে ছোট একটা কাজের অধিনায়ক হিসাবে বদলী করা হল। শ্যাপোস্নিকোভ আবার ফিরে এলেন।

১৯৩৭ সনের ১২ই জুন টুখাচেভেস্কি এবং লালফৌজের আরও আটজন উচ্চপদস্থ জেনারেল এবং মার্শালকে বিনা দোষে ষড়যন্ত্রের অপরাধে হত্যা করা হয়েছিলো। ১১ই মে তারিখের যে আদেশের ফলে টুখাচেভেস্কিকে তাঁর কাজ থেকে অপসারিত করা হয়েছিলো সে আদেশ অনুসারে সেনাবিভাগে রাজনৈতিক কমিসার নিযুক্ত করা হল। কমিসার অসামরিক লোক এবং সেনাবিভাগের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে একত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী এবং কর্ম্মচারীদের আদেশ অগ্রাহ্য করবারও ক্ষমতা তাদের ছিল। "প্রাভদা" লিখেছিলো, কমিসারেরা, "সেনাদলে কমিউনিস্ট পার্টির চোখ এবং কান"; এর মানে হচ্ছে পার্টি এবং জিপিইউ মনে করেছিলো যে টুখাচেভেস্কি এবং অন্যান্য অফিসার যারা তাঁর অনুগত ছিল তাদের অপসারণের পর তাদের সেনাদলের দিকে নজর রাখতে হ'বে।

সেনাবিভাগীয় কর্ম্মচারীরা কমিসারদের সহ্য করতে পারতনা এবং তারা শ্যাপোস্নিকোভকেও পছন্দ করতনা। ১৯৪০ সনের ১০ই আগষ্ট শ্যাপোস্নিকোভ সেনাবিভাগীয় অধিনায়কের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১২ই আগষ্ট কমিসার ভেঙে দেওয়া হয়।

শ্যাপোস্নিকোভের সঙ্গে কমিসারেরা এসেছিলো, তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চলেও গিয়েছিলো।

তারপর, ১৯৪১ সনের ১৬ই জুলাই লালফৌজ যখন জার্ম্মানদের সামনে থেকে হটে আসছিল এবং অফিসারদের মানসম্ভ্রম যখন কমে আসছিলো তখন কমিসারদের আবার বহাল করা হল। ১৯৪১ সনের ৩রা নভেম্বর জার্ম্মান সেনাদল যখন মস্কোর দরজায় এসে হানা দিলো, তখন শ্যাপোস্নিকোভ আবার সেনাবিভাগের অধিনায়ক হিসেবে ফিরে এলেন।

স্টালিনের কাজ হাসিল করার পদ্ধতি যদিও নিখুঁত এবং কল্পনাপ্রসূত নয় তাহলেও দৃঢ়তার জন্য তা সুপরিচিত। স্টালিনের

যুদ্ধকালীন বক্তৃতা এবং দৈনিক হুকুমজারী সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে এগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, এর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং যুদ্ধের চার বছরের বিবরণ একই ভাবে প্রকাশের সঙ্গে যুদ্ধের প্রত্যেক বিবরণীতে তিনি একই বিষয়ের একইভাবে অবতারণা করেছিলেন—যেমন কোন নতুন চিন্তা কিম্বা জটিল বিশ্লেষণ দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাকে নষ্ট করা হয়না। একই বিষয় বারবার বলার ফলে বিরাট ইঞ্জিনের চাকার মত অসাধারণ শক্তির সৃষ্টি হয়। লেখাপড়ার খুব চর্চ্চা না থাকাব জন্য স্টালিনের এ সম্বন্ধে কোন ঔদ্ধত্য নেই। তিনি কারও সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জেনে এ কথা বলেন না, "ও, সে আগেও এটা করেছে অথবা বলেছে।" এথেকেই তাঁর জ্ঞানের পরিধির আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর শত্রুদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে বলে মনে হয়।

স্টালিন দুবার গুপ্তচর বিভাগের অধিনায়ক য়াগোডাব সঙ্গে আকুলোভের ঝগড়া থামাতে চেষ্টা করেছেন। তিনবার তিনি কমিসার পদের সৃষ্টি করেছিলেন সেনাবিভাগের রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন অফিসারদের দমন কববার জন্য। তিনি বারবার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেন।

১৯৪২ সনেব ১০ই অক্টোবর স্টালিন কমিসার পদ রহিত করে সামরিক কর্ম্মচারীদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এর ফলে তাদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। যুদ্ধের সময় স্টালিনকে তাঁর নিজের হাতের সামরিক গোষ্ঠীকে মেনে চলতে হয়েছিলো। জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি কাউকে তাড়াননি।

অফিসারদের কথা শুনেও স্টালিন তাদের দমন করবার ব্যবস্থা করতে ছাড়েননি। তিনি জেনারেলদের বহুবার স্থানান্তরিত করেছেন এবং বিশেষ করে মধ্য শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার জন্য চেষ্টা করেছেন। সৈনিকেরা তাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের

কথা শুনে চলবে এই ভেবে স্টালিন কমিউনিষ্ট পার্টির অসামরিক কর্ত্তাদের উচ্চপদ দিয়েছিলেন; যেমন আনড্রী এ ঝাদানোভকে কর্ণেল. জেনারেলেব পদে এবং উক্রেনের দলপতি এস, ক্রুশেভকে লেফটেনেন্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করা হয়েছিলো। ইতিমধ্যে তিনি 'পলিটব্যুরো'কে সীমান্তের জেনারেলদের কাছে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 'জিপিইউ'এব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে ডেপুটী সভ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো এবং তাকে মার্শাল উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো। সীমান্তে কখনও যুদ্ধ না করেই তিনি এভাবে যুদ্ধের সময় উর্দ্ধতন সেনানায়কের সমকক্ষ হয়েছিলেন। স্টালিন লালফৌজ দ্বারা 'জিপিইউ'এর প্রতিপত্তি হ্রাস করতে চাননি। তিনি নিজেই জেনারেলসিমো'র মত উচ্চ এবং সম্মানিত পদ গ্রহণ করেছিলেন।

অতি ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেও যে রাশিয়াতে বড় বড় কাণ্ড ঘটে, ওয়াল্টার কাব তার প্রতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন; ১৯৪২ সনের ১৮ই নবেম্বর মস্কো থেকে 'নিউইয়র্ক হ্যারল্ড ট্রিবিউন'এর জন্য প্রেরিত সংবাদে তিনি বলেছিলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ানের উচ্চপদস্থ ১৪ জন অসামরিক নেতাদের নাম যেমন সচরাচরই সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়, "যেমন জেনারেল জুখোভ, মার্শাল টিমোশেঙ্কো, মার্শাল বোরিস. মসিয়ে শ্যাপোস্নিকোভ এবং মার্শেল, এস, এম বুদেনী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের নাম কদাচিৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।" স্টালিন সামরিক বিভাগকে খুব বেশী জনপ্রিয় হতে দিতে চাননি অথবা জয়ের জন্য তারা যে বেশী করে সম্মান পাবে সেটাও চাননি।

স্টালিনের মত পাকা রাজনৈতিক খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল বিপদ সত্ত্বেও যুদ্ধের মধ্যে সামরিক বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখা। শান্তিকাল একনায়কের কাজে সাহায্য করে।

কিন্তু স্টালিন রাশিয়াতে সামরিক কৃষ্টির বিস্তার বন্ধ রাখতে সক্ষম

হননি কিম্বা ইচ্ছা করেননি। সোভিয়েট রাজনীতিজ্ঞরা এখন সামরিক পোষাক পড়ছেন। নৌসেনাধ্যক্ষ এবং সেনাধ্যক্ষরা এখন কূটনীতিসংক্রান্ত চাকুরি পাচ্ছেন। ১৯৪০ সনের ৩০শে আগষ্ট 'প্রাভদা' লিখেছিলো, "সামরিক নেতার কাজ হচ্ছে দেশের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানের।" যুবকদের সামরিক বিভাগে যোগদান করতে উৎসাহ এবং বাধ্য করা হয়। সোভিয়েট স্কুলে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার জন্য নয়। কারণ হলো, ছেলেরা স্কুলে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক বৃত্তি অনুসরণ করে এবং মেয়েরা মেয়ে বলেই, তাদের জন্য বিশেষ স্কুলেব ব্যবস্থা আছে। রাশিয়ার যুদ্ধোত্তর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সরকারীভাবে "সোভিয়েট ইউনিয়ানের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধির" উপায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মস্কোতে আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি জেনারেল জন আর ডীন বলেন, লালফৌজের স্বাভাবিক সৈন্যসংখ্যা "প্রায় চল্লিশ লক্ষ হবে, যা বোধহয় দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে বেশী কিম্বা সমান।" এই বিরাট সেনাদল রক্ষা করা এবং স্টালিনের প্রচারিত আদেশ অনুসারে নৌবিভাগ বিস্তারের মানে হচ্ছে সুখ সুবিধা এবং রাজনৈতিক উচ্চাশা-সম্পন্ন অফিসাব সৃষ্টি করা; এর মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে প্রচারের সুবিধা যে বিদেশী শত্রু দেশকে আক্রমণের চেষ্টা করছে এবং সেজন্য দেশের লোকের সবরকম চেষ্টা করতে হবে, যাতে তাদের জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর আরও অর্থ হচ্ছে রাশিয়া একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে থাকবে।

১৮১৩ সনে জারের সেনাদল প্যারিসে প্রবেশ করে। যথেষ্ট সংখ্যায় রাশিয়ার অফিসার এবং সৈনিকেরা ইউরোপ দেখে। এতে তাদের দেশের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং অত্যাচার সম্বন্ধে চোখ খুলে যায়। ১৮২৫ সনে রাশিয়ার সেনাবিভাগীয় অফিসারেরা, যারা ফরাসী বিপ্লব দেখেছিলো, বিখ্যাত ডিসেম্ব্রিষ্ট বিপ্লবের সূচনা

করে। তারা রাশিয়ার জন্য এক শাসন ব্যবস্থার দাবী করেছিলো। এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিলো কিন্তু দেশের জনসাধারণ এর কথা ভুলতে পারেনি।

এখন রাশিয়ার আর একটি সেনাদল বোমা-বিধ্বস্ত, ধ্বংস-স্তূপে পরিণত, ক্ষুধিত, বিচ্ছিন্ন, শান্ত, অনুতপ্ত, অসুস্থ, দিশেহারা ইউরোপ দেখেছে। এমনকি এহেন ইউরোপও লালফৌজ এবং তাদের নেতাদের কাছে স্বদেশের চেয়ে বেশী সুখদায়ক, উন্নত এবং বেশী স্বাধীন বলে মনে হয়েছে। ক্রেমলিন এটা বুঝতে পেরে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলো। ১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রাভদা' একদিন লালফৌজের বুখারেস্টের সংবাদদাতা লিওনীড সোবেলেভের ছ'কলম ব্যাপি একটা লেখা ছাপায়, তাতে তিনি লালফৌজকে, "মেকি উজ্জ্বলতা" দেখে ভুলতে নিষেধ করেছিলেন। সোভিয়েট কথাশিল্পী কনষ্ট্যানটাইন সিমোনোভ অক্টোবর মাসের সেনাবিভাগীয় সংবাদপত্র "রেড স্টার"এ একই বিষয়ের অবতারণা করে লিখেছিলেন, সৈনিকদের মনে রাখা উচিত যে দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া সৌখিন জীবনযাপন করার চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রদ। পাছে তাঁর আবেদন ব্যর্থ হয় সেজন্য তিনি সোভিয়েট নাগরিকদের জন্য সুখ-সুবিধার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দিয়েছিলেন।

ইউরোপের অবস্থা দেখে চোখ খুলে যাওয়াতে লালফৌজ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চাপ দেবে বলে অনুমান করা যেতে পারে। রাশিয়ার যুদ্ধোত্তর ভারগ্রস্থ অবস্থাতে, কেবল শিল্প ও লালফৌজকে শক্তিশালী করবার জন্য প্রদত্ত অর্থের বিনিময়েই উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ হচ্ছে আর একটি সমস্যা যা স্টালিনই মীমাংসা করতে পারেন।

স্টালিন যদি মারা যান? এ প্রশ্ন নিয়ে গণতান্ত্রিক দেশে খুবই

আলোচনা হয়েছে। কোন একটি লোকের মৃত্যু নিয়ে এত চিন্তা এবং এত বেশী আশা বোধ হয় আর কখনও দেখা যায়নি। স্টালিনের *পর কি লালফৌজ ক্ষমতা আয়ত্ত করবে? স্টালিনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করবে?* এর উত্তর হচ্ছে, না।

কারও কৃতকর্ম্ম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়না। সে পিছনে কিছু রেখে যায় এবং স্টালিনের পক্ষে এটা হচ্ছে একটা বিরাট জিনিষ। তার বিশ বছরের শাসন এত সহজে মুছে ফেলা যায়না, বিশেষ করে তখন তিনি যা করেছিলেন তা ভূগোল মনস্তত্ত্ব এবং নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। স্টালিন মানচিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করেছিলেন। তা রয়েছে। তিনি মানুষের মন নতুন ছাঁচে প্রস্তুত করেছিলেন। তারও সহজে পরিবর্ত্তন করা চলেনা। তিনি ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উচ্ছেদ করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিলেন; খুব অল্প নেতাই এরকম অবস্থার পরিবর্ত্তন করে গোলমাল সৃষ্টি করার ঝুঁকি নিতে চাইবে।

স্টালিনের তিরোভাবের পব সোভিয়েট ব্যবস্থার যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হবে তা আশা করা যায়না। লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়াতে ভীষণ রাজনৈতিক যুদ্ধ হয়েছিলো। এ যুদ্ধ অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো এবং বলশেভিক বড়কর্ত্তারা এতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। লেনিনকে নিয়ে ঝগড়া ছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টির ঝগড়া ছিল। এর ফলে সারা দেশময় একটা আলোচনার সৃষ্টি হয়। নেতা এবং সভ্যরা খোলাখুলিভাবে এতে যোগদান করে। বর্ত্তমানে পার্টিকে ক্রেমলিনের ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে। এর আত্মার মৃত্যু ঘটেছে।

স্টালিনের মৃত্যুতে পরিপার্শ্বের মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক গোলযোগ ছাড়া আর কিছুই হবেনা। তাঁর উত্তরাধিকারী—আমি মনে করেছি, তিনি নিজেই ঠিক করে যাবেন—

জিপিইউ কেবল তাঁর বিরোধিতা করতে পারবে, সেনাদল পারবেনা।

জিপিইউ লালফৌজের চেয়ে অনেক ছোট এবং এর শক্তিও কম। কিন্তু তাহলেও এর রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশী। স্টালিন এবং তাঁর জিপিইউ সব সময়েই লালফৌজকে কোনঠাসা করে রাখতে পারে যেমন হিটলার এবং হিমলার জার্মান সৈন্যদলকে যেকোন রাজনৈতিক সুযোগ থেকে দূরে রাখতে পারতেন। এজন্যই স্টালিনের পক্ষে টুখাচেভেস্কি এবং লালফৌজের অন্যান্য বিশিষ্ট জেনারেলদের মেরে ফেলা সম্ভবপর ছিল। ঐ ঘটনা, দশ বছরেব সোভিয়েট ইতিহাসের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা, বাস্তবিক পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করতে জিপিইউ-এর লোকদের ন'জন নির্দ্দিষ্ট মার্শাল এবং জেনারেলের বাড়ীতে রাত্রি বেলাতে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে হয়নি। জেনারেলরা যদি বিদ্রোহের জন্য ষড়যন্ত্রই করে থাকতো তা'হলে তাদের সেনাদের ভিতরেই থাকতে দেখা যেত এবং তারা বাধাও দিত। কিন্তু তাদের খুব সম্ভব বাড়ীতে পাজামা পরিহিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন জেনারেল গমরনিক, বলশেভিক গৃহযুদ্ধের বীর এবং সেনাবিভাগের রাজনৈতিক শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর। তার সম্বন্ধে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে যখন গুপ্তচর বিভাগের লোক তার ওখানে গিয়েছিলো তখন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আব বাকী সকলে বুঝতে পেরেছিলো যে তাদের পক্ষে একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজের মাথায় নিজে গুলি ছোড়া, অথবা পিছনে থেকে জিপিউএর গুলির জন্য প্রস্তুত থাকা। বোধহয় শেষটাই তাদের পছন্দ হয়েছিল কারণ তাতে জীবনের মেয়াদ কিছুদিন বেড়ে যায়।

এথেকেই একনায়ক যে সেনাদলের কাছ থেকে কি সুবিধা আদায় করে নেয় বোঝা যায়। হঠাৎ রাজশক্তি দখল না করলে এ কেবল একনায়কের উপর চাপ দিতে পারে, এবং এ চাপ দেওয়ার মানে হচ্ছে জিপিইউ দ্বারা রাত্রিবেলায় আক্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

লালফৌজের বিরুদ্ধবাদীদের একমাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করা কিম্বা বিনা বাক্যব্যয়ে নতি স্বীকার করা। স্টালিনের বিরুদ্ধে অথবা তার উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র অফিসার, গোষ্ঠী রাজনৈতিক বিদ্রোহ করতে পারে অথবা একজন অফিসার একনায়ককে খুন করতে চেষ্টা করতে পারে। স্টালিনের উপর খুব যত্ন সহকারে লক্ষ্য রাখা হয়, এমনকি একজন লালফৌজের জেনারেলকে পর্য্যন্ত স্টালিনের সামনে যাওয়ার আগে তার বাহুর নীচে কোন কিছু আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হয়; ব্যক্তিগত আক্রমণের আশঙ্কা খুবই কম যদিও তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু হত্যাকারী কিম্বা ষড়যন্ত্রকারীদের দলের একথা জেনে রাখতে হবে যে তাদের চেষ্টার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হয়েও তারা নিজেদের আত্মীয়স্বজন সহকর্ম্মী এবং জানাশোনা সকলের উপর বিপদ ডেকে আনছে। বিদ্রোহকে কার্য্যকরী করতে হলে দেশের সংগঠনের প্রয়োজন। এ করতে হলে মস্কোর বাইরে সমস্ত ঘাঁটির সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে এবং প্রদেশিক সামরিক কর্ত্তাদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন।

একজন জেনারেল হয়তো সেনাবিভাগের একজন বন্ধুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে। তারা এবিষয়ে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারে। কিন্তু তারা যদি এ বিষয়ে কোন চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় সে নিশ্চয়ই মনে মনে বলবে, "এরা কি আমাকে পরীক্ষা করছে? এরা কি জিপিইউ এর হয়ে আমি কত বিশ্বস্ত তা পরীক্ষা করছে? আমি যদি এদের কথা না জানাই তা'হলে এরাই আমার কথা জানাবে।" কাজেই সে নিজের স্বার্থের খাতিরে তাদের কথা জানাবে। তাছাড়া, প্রত্যেক অফিস এবং সোনাদলে এমন লোক রয়েছে যারা গুপ্তচরবিভাগের হয়ে কাজ করবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সন্ধান করে দিয়ে বাহবা নিতে চাইবে। এভাবেই,

রাশিয়াতে জিপিইউ হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। সোভিয়েট ইউনিয়ানে সেনাদলের বিদ্রোহ একটা বিরাট জুয়াখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবল, চপলমতি ভাগ্যান্বেষী এবং উন্নতমনা ভাববিলাসীরাই তার চেষ্টা করবে এবং তারা নিশ্চিত ব্যর্থ হবে।

জিপিইউ লালফৌজের উপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা সব সময়েই উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করে চলে। উভয়ের মধ্যে কোন কোন কাজের সমন্বয়তার জন্য বিবোধ বৃদ্ধি পায়। জিপিইউ-এর বিদেশী গুপ্তচরবিভাগ আছে এবং সেনাবিভাগেরও তা আছে। সোভিয়েট সীমান্তে জিপিইউ পাহারা দেয় এবং এর কাছেই ঘাঁটি করে রয়েছে লালফৌজ। এমনকি সবচেয়ে ভাল গভর্ণমেন্টেও কাজের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে বিরোধ হয। জিপিইউএর বিরুদ্ধে সেনাবিভাগের আক্রোশের কারণ হচ্ছে যে জিপিইউ সেনাবিভাগে গুপ্তচব রাখে এবং তারা সেনাবিভাগীয় অফিসারদেব গ্রেপ্তার করতে পারে।

এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা পাগলামি হবে যে স্টালিনের চেয়ে কম বিচক্ষণ একনায়কের পক্ষে জিপিইউ এবং সেনাবিভাগকে সামলান সম্ভবপব হবে কিনা। গুপ্তচরবিভাগ সবসময়েই ষড়যন্ত্র এবং গৃহশত্রু "আবিষ্কাব কবে" নিজেদের প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখতে চায়। বিদেশে কাজেব ব্যবস্থা কবে যে কোন সেনাবিভাগ দেশের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখবার চেষ্টা করতে পারে।

সংগঠন ব্যাপারে লালফৌজ জিপিইউ-বিরোধী বলে আশা করা হয় যে রাশিয়া 'গণতান্ত্রিক দেশে' পবিণত হবে; জিপিইউকে জয় করার অর্থ হচ্ছে এর ভীতিজনক ব্যবস্থা এবং সাধারণের জীবনের উপর আক্রমণ করার পূর্ণ অধিকার খর্ব্ব করা। এপর্য্যন্ত কোন লক্ষণ দেখা যায়না এমন যাতে করে বিশ্বাস হয় যে লালফৌজ কিম্বা অন্য কেউ সোভিয়েট গণতন্ত্রের উন্নতি সাধন করেছে। এরকম কোন

লক্ষণ দেখবার জন্য আমি সোভিয়েট সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে আছি এবং এসম্বন্ধে লিখতে পারলে আনন্দিতই হব। সোভিয়েটবাসীরা এবং পৃথিবীও রাশিয়াতে গণতন্ত্রের বিস্তারের জন্য নিরাপদ হবে।

স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় এজন্যই যে সরকারী মহল মনে করে যে রাশিয়া গণতান্ত্রিক দেশ। বলশেভিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে গণতন্ত্রই আদর্শ ছিল। এখন, আগের চেয়ে অনেক কম স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে বলা হয় গণতন্ত্র এখানে আগের মতই রয়েছে। স্বাধীনতার অভাবকেও যদি স্বাধীনতা বলে সরকারীভাবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রাম কি করেই বা চলতে পারে? স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলেই একে মনে করা হবে।

১৯৪৬ সনের জানুয়ারী মাসের মস্কোর 'নিউ টাইমস' একথা লিখেছিলো যে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া দুই বলকান্ রাষ্ট্রকে বারনেস এবং বেভিন মস্কোমার্কা 'কন্‌ক্রিট (ইস্পাত) গণতন্ত্রের বদলে পশ্চিম গণতান্ত্রিক দেশের আব্‌ছা ভাবধারা জাতীয় যে দুষ্ট নীতিতে চালিত করতে চেষ্টা করছিল, তা থেকে ঐ দুই দেশকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে। পশ্চিমের গণতন্ত্র হয়তো অসম্পূর্ণ কিন্তু যারা এর স্বাদ পায়নি তাদের কাছেই এটা অস্পষ্ট বলে মনে হবে। এ গণতন্ত্রের মধ্যে যা ভাল তা খুবই ভাল। স্টালিন রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়াকে রক্ষা করতে চান, যেমন তিনি রাশিয়াকে স্বাধীন নির্ব্বাচন, স্বাধীন ভাবে মেলামেশা, স্বাধীন ট্রেডইউনিয়ান, স্বাধীন আদালত, স্বাধীন মতবাদ এবং স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রচার থেকে রক্ষা করেছেন। স্টালিন রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা দাবী বরেন।

যে রাষ্ট্র সাধারণকে রাজনৈতিক অধিকার এবং ব্যবহারিক কথাবার্ত্তা থেকে বঞ্চিত রেখেছে তারা কী দিতে পারে! স্টালিন এ-সমস্যার

সমাধান করেছেন। তিনি সোভিয়েট নাগরিককে জাতীয়তা দিয়েছেন। তিনি তাদের বক্ষে পদক ঝুলাবার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু দিয়েছিলেন পাছে তারা অশান্ত হয়ে ওঠে। বেশী করে সন্তান উৎপাদনের উৎসাহ দেওয়ার মত ব্যবস্থা অবলম্বনে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ গরীবের পক্ষে অনায়াসলব্ধ না করে তিনি তাদের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন। সোভিয়েট শাসনে যে সামাজিক উন্নতি হয়েছে তার উপর তিনি বেশী করে জোর দিয়েছিলেন এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধের "ধনতান্ত্রিক দাস"দের যে কষ্ট সহ্য করতে হয় তার মধ্যে তুলনা করেছিলেন। উৎসব, কার্নিভাল, আকাশযান প্রদর্শনী এবং সাইবেরিয়ায় আকাশযানে ভ্রমণের বন্দোবস্ত, এবং তাদের জন্য সার্কাসের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এগুলো সংবাদপত্রে খুব বেশী করে প্রচার করা হত। প্রতিদিনই সংবাদপত্রগুলো এরকম একটা না একটা বিষয়ে কাগজের অর্দ্ধেকটা জুড়ে লিখত—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সংবাদপত্র পাঠকেরা মনে করত যে তারা ছাড়া কোন দেশই আন্তর্জ্জাতিক ভ্রমণ কুচকাওয়াজ এবং অন্যান্য উত্তেজনার স্বাদ পায়নি।

সমস্ত একনায়কেরাই কৌতুকপ্রদ ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছেন; স্টালিন এটাকে উচ্চ শিল্পের পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছেন।

অনেক সময় বিদেশের কৃতকার্য্যতা—কূটনৈতিক অথবা সামরিক—কঠিন জীবনে পরিবর্ত্তন এনে দেয়। নাৎসী, ইতালীয়, ফাসিষ্ট, এবং জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষরা দেশের ভিতরে তাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে যুদ্ধজয় চেয়েছিলো। তারা যুদ্ধকে একটা শুভলক্ষণ বলে মনে করতো। ১৯৩৪ সনে মুসোলিনী লিখেছিলেন, "কেবল যুদ্ধই মানুষের শক্তিকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যায় এবং যে সব জাতি খোলাখুলি ভাবে এটা গ্রহণ করতে পারে তাদের মহিমান্বিত করে তোলে।" স্টালিন কোন সময়েই এরকম অদ্ভুত কথা বলেন নাই

এবং বলশেভিকরা এটা প্রচার করেনি।

দার্শনিকরা জাতির আক্রমণাত্মক ভাবের জন্য তাদের দার্শনিকদের দায়ী করেন। মনস্তত্ত্ববিদরা এ সব আসক্তিকে জাতীয় মনস্তত্ত্ব কিম্বা আদিম অনুভূতিদ্বারা বিচার করেন। এর মূলে যাই থাকুক না কেন বর্ত্তমান ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একনায়ক গদিতে না বসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ আসক্তিগুলো যুদ্ধে পরিণত হয়না। সোভিয়েট রাশিয়া দার্শনিক ছাড়াও আক্রমণাত্মক কার্য্য করেছিল।

একনায়কত্ব তোষণকারী গণতন্ত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটিয়েছিলো। তোষণনীতি হচ্ছে বুদ্ধির অপভ্রংশজনিত শক্তি-স্খলন। আর্থিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, হিটলারের আবিভাবের প্রথমাবস্থা থেকেই গণতন্ত্র একনায়কের আক্রমণের নিকট পরাভূত।

হিটলার, মুসোলিনী এবং হিরোহিতো সম্পর্কে গণতান্ত্রিক পরাজয় ছিল দৈহিক; তারা এগিয়ে এসেছিলো, আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। এভাবেই আমবা তাদের নিজের দেশে শক্তি যুগিয়েছিলাম এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের বিশ্বাস জন্মেনি যে তারা পৃথিবী জয় করতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি তাদের ঘৃণা বাড়িয়ে তুলেছিলাম।

স্টালিন সম্পর্কিত পশ্চিমা শক্তিপুঞ্জের পবাজয় কেবল দৈহিক নয়; আধ্যাত্মিকও বটে। তার সামনে আমবা কেবল মাথা নত করিনা, আমরা তাকে শ্রদ্ধাও দেখাই। এটা হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের প্রধান সামাজিক বিধি।

এশিয়ার সন্তান স্টালিন তাঁর নিজের মহাদেশকে মোহাবিষ্ট করে ইউরোপকে ছায়াচ্ছন্ন করেছেন। তাঁর প্রভাব, রাশিয়ার সুহৃদ এবং কম্যুনিজম-এর সাহায্যে আমেরিকার দুই মহাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। পোপ ভিন্ন কেউই (অতএব

আংশিকভাবে তাদের দুজনের ভিতরে বিরোধ) এতগুলো লোকের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেনি।

স্টালিনের আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব তাঁর দক্ষতা, তাঁর দেশের ক্ষমতা এবং কৃতকার্য্যতা, এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধের মানসিক অক্ষমতা ও রাজনৈতিক গোলযোগের ফলেই বিস্তার লাভ করেছে। ধনতন্ত্রবাদ নিজের উপরেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। অসম্পূর্ণতার জন্যই ধনতন্ত্রবাদ তার বুদ্ধিজীবিদের আওতার মধ্যে রাখতে পারছেনা। গণতন্ত্র অনিশ্চিত এবং বিপদসঙ্কুল। পশ্চিমের ভিতরকার এ নৈতিক দুর্ব্বলতা স্টালিনের ক্রূর দৃষ্টি এড়ায়নি; এথেকেই তাঁর বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়।

রুজভেল্ট, চার্চ্চিল এবং স্টালিন কর্ত্তৃক শান্তি প্রতিষ্ঠা

যুদ্ধকালীন নেতৃবৃন্দই শান্তি প্রতিষ্ঠাতা। যুদ্ধ করতে করতেই এঁরা শান্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে কার্য্যত শান্তি বৈঠক বসে তেহেরানে। ১৯৪৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রিমিয়াতে এবং জুলাই-আগষ্ট মাসে আংশিক ভাবে পোট্‌সডামে। যুদ্ধের সময়ে এবং পরে স্যানফ্রান্সিসকোয় এবং অন্যান্য জায়গায় যে সব বৈঠক বসেছিলো তা হচ্ছে রুজভেল্ট, চার্চ্চিল ও স্টালিন তেহেরান এবং ইয়ালটাতে যে শান্তির কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তারই ভিতরে প্রাণ সঞ্চারণের ব্যবস্থা করার জন্য।

সাধারণতঃ প্রথমে যুদ্ধজয় করা হয় তারপর শান্তি স্থাপন। রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল এরকম ব্যবস্থাই করতেন। ১৯৪৩ সনের ১৮ই নভেম্বর সেক্রেটারী হাল কংগ্রেসকে বলেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট সমস্ত সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোকে মুলতুবী রাখতে চেয়েছিলো। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে এতে অসুবিধার কারণ ছিল। যুদ্ধজয়ে যে সব দেশ সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে তাদের চেয়ে যে সব দেশ যুদ্ধের পরে শক্তি বজায় রেখেছে তাদের দ্বারাই শান্তি স্থাপিত হয়। স্টালিন একথা জানতেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ান যুদ্ধের ক্ষতির ফলে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধজয়ে রাশিয়ার সাহায্য যখন একান্ত প্রয়োজনীয় তখনই রাশিয়া মিত্রশক্তির উপর তার ইচ্ছা খাটাতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের পরে হয়তো তার আর সে ক্ষমতা থাকবেনা।

এমন ত্রিশক্তির বন্ধুত্বের কথা কল্পনা করা যাক যা কিছুতেই

নষ্ট হবেনা। তারপর একজন অংশীদার যদি কিছু চায় এবং পাওয়ার জন্য সমানে দাবী জানায় তাহলে অপর পক্ষ সে দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। তেহেরান এবং ইয়ালটাতে এটাই ছিল স্টালিনের কূটনীতির ভিত্তি।

কিন্তু ইংলণ্ড এবং আমেরিকাও অংশীদার ছিল। তারা কেন দাবী করতে পারলোনা?

স্টালিন একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। এরা হিটলার কিম্বা জাপানের সঙ্গে সন্ধি করবেনা। রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিলের স্টালিনের উপর সেরকম আস্থা ছিলনা। শান্তি স্থাপনে এটাই ছিল স্টালিনের সব চেয়ে বড় সম্পদ।

১৯৩৯ সনের আগষ্টমাসের সোভিয়েট-নাৎসী-চুক্তি পৃথিবীর কূটনীতিতে এক স্থায়ী রেখাপাত করেছে। এথেকে এটাই মনে করা যেতে পারে যে নাৎসী-বিরোধী-রাশিয়া, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমষ্টিগত রক্ষা ব্যবস্থার পাণ্ডা, প্রধান আক্রমণকারী নাৎসী-জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং পক্ষপাতশূণ্যতার চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে। মস্কো আবার এরকম কিছু করতে পারে এভয় সবসময় রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিলকে পেয়ে বসেছিলো।

১৯৪৩ সনের জানুয়ারীমাসে ক্যাসাব্ল্যাঙ্কাতে রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল তাদের সুপরিচিত, "বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ" বিধান প্রকাশ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটবৃটেন ঘোষণা করেছিল যে শত্রু সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তারা কোন শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেনা। এটা হচ্ছে ইংলিশচ্যানেলের উপর দিয়ে নরম্যাণ্ডী আক্রমণের আঠারমাস আগের কথা। তখন আমেরিকার সেনাবিভাগের উত্তর আফ্রিকাতে কেবলমাত্র সামান্য রকমের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের ঘোষণার

ফলে হিটলারের নীতির আশু পরিবর্ত্তন হয়নি বরং হিটলার ও জার্ম্মানীর শেষ পর্য্যন্ত বাধা দেবার ইচ্ছা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। এ ঘোষণা জার্ম্মানীর জন্য নয়। অথবা আমেরিকার নৈতিক বলকে দৃঢ় করবার জন্যও এর প্রয়োজনীয়তা ছিলনা; আমেরিকার অধিবাসীরা এটাই চেয়েছিলো যে যুদ্ধের মধ্যে এমন কিছু একটা করা হউক। রুজভেল্ট-চার্চ্চিল "বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ" ঘোষণা করে স্টালিনকে একই রকমের বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য ইঙ্গিত করেছিল। কিন্তু তারপক্ষে এটা করা বোকামি হত। রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল ক্যাসাব্ল্যাঙ্কাতে যা স্বীকার করেছিলেন তাতে তাদের রাশিয়ার ভাবগতি সম্বন্ধে অনিশ্চিয়তাই প্রকাশ পেয়েছিলো এবং আরও প্রমাণিত হয়েছিল যে স্টালিন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

স্টালিন বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের কথা বলেছিলেন কিন্তু কাজ করেছিলেন বিপরীত। তিনি ১৯৪২ সনের ১লা মে তারিখে জার্ম্মান সেনাদল ও জার্ম্মান জাতির কাছে খোলাখুলিভাবে এক আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "জার্ম্মান সেনাদলকে" জার্ম্মানীর জন্যে নয় বরং জার্ম্মান ব্যাঙ্কের মালিক এবং ধনকুবের সম্প্রদায়ের জন্যেই আত্মাহুতি দিয়ে এবং অপরের রক্তপাত করে নিজেদের এবং অপরকে পঙ্গু করতে বলা হয়েছে...জার্ম্মান জাতির কাছে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে বর্ত্তমানে তাদের পক্ষে যেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে এখন একমাত্র পন্থা হল জার্ম্মানীকে হিটলার এবং গোয়েরিংয়ের দস্যুতার চক্রান্ত থেকে মুক্ত করা।...আমাদের পররাজ্য দখল কিম্বা বিদেশীকে জয় করবার কোন ইচ্ছাই নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট এবং মহান্। আমরা আমাদের সোভিয়েট রাজ্যকে জার্ম্মান ফাসিস্ট জানোয়ারদের হাত থেকে মুক্ত করতে চাই।"

১৯৪২ সনের ৭ই নবেম্বর তারিখের বক্তৃতাতে স্টালিন আরও

খোলামেলা। "জার্ম্মানীকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়", একথা তিনি বলেছিলেন। "জার্ম্মানীর সমস্ত সামরিক শক্তি নষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ প্রত্যেক শিক্ষিত লোক এটা বুঝবে যে এটা যেমন জার্ম্মানীর পক্ষে অসম্ভব তেমনি রাশিয়ার পক্ষেও, এবং ভবিষ্যতের দিক থেকেও এটা যুক্তিযুক্ত নয়..."

এ হল হিটলারকে সরিয়ে দিয়ে স্পষ্টত জার্ম্মান সেনানায়কদের কাছে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার প্রস্তাব পেশ করা।

চার্চ্চিল মস্কো গিয়ে স্টালিনকে বুঝিয়েছিলেন যে ইংরেজ পশ্চিম ইউরোপে নেমে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে পারবেনা। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলবার দাবী এদিকে সমানেই চলল; রাশিয়ান এবং বিদেশস্থ রাশিয়ার সমর্থনকারীরা অনবরত এ দাবী করে চলছিল। নাৎসী-সৈন্যদের অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত রেখে কিছুটা আরাম পাবার ইচ্ছা শোণিত-সিক্ত রাশিয়ার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু পশ্চিমী মিত্রশক্তির পরিকল্পনা এবং সামর্থ্য স্টালিনের সম্পূর্ণ জানা থাকা স্বত্ত্বেও দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য আন্দোলন হল। আন্দোলন হল মিত্রশক্তিকে এ-কথাই আবার জানিয়ে দেবার জন্যে যে রাশিয়া তাঁদের উপর তুষ্ট নয় এবং তাঁদের কাছে রাশিয়া আরো বেশি প্রত্যাশা করে। এ থেকে এটাও মনে করা যেতে পারত যে রাশিয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে একটা পৃথক সন্ধি স্থাপন করে হাঁফ ছাড়তে চায়।

১৯৪৩ সনের গ্রীষ্মকালে স্টালিনের অভিসন্ধি নিয়ে লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে খুবই দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছিলো। কারণ ১৯৪৩ সনের ১২ই জুলাই, সোভিয়েট আওতায় মস্কোতে "স্বাধীন জার্ম্মানীর জাতীয় কমিটী" স্থাপিত হয়েছিলো। এতে ছিল জার্ম্মান রাশিয়া-প্রবাসী কমিউনিষ্টরা এবং যুদ্ধে বন্দী উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। তাদের এ উদ্দেশ্যেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিলো। কমিটী ২১শে জুলাই এক প্রচার পত্র প্রকাশ করে লালফৌজের

বিমানের সাহায্যে তা লাখে লাখে ত জার্ম্মান সীমান্তে বিতরণ করল এবং তারপর ১লা আগষ্টের 'প্রাভদা'তে এখবর প্রকাশিত করে তাকে সরকারী আকার দেওয়া হয়।

এ প্রচারপত্রে হিটলারশাসনের পরিবর্ত্তে, "জার্ম্মানীর জন্য খাঁটি জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছিলো।" এ গভর্ণমেন্ট অনতিবিলম্বে সামবিক কার্য্যকলাপ বন্ধ রাখবে, জার্ম্মান সেনানীকে রাইখের সীমান্তে নিয়ে আসবে, এবং সমস্ত বিজয় পরিত্যাগ করে শান্তির জন্য কথাবার্ত্তা চালাবে। এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আগের মত জার্ম্মানীকে অন্যান্য দেশের সমপর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করবে।"

"শান্তি আলোচনা," "অন্যান্য জাতির সঙ্গে জার্ম্মানীকে সমপর্য্যায়-ভুক্ত করা," এটা বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের কথা নয়।

সবগুলোকেই হিটলাব এবং তাব সেনাদলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার খাঁটি প্রচেষ্টা বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল একে এদিক থেকে দেখেন নাই। কুইবেকে যখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পারামর্শ করছিলেন, তখন ১৯৪৩ সনের ১৩ই আগস্টের এক বক্তৃতাতে ইউনষ্টন্ চার্চ্চিল স্টালিন এবং রাশিয়ার প্রশংসা করেও, সোভিয়েট এবং বিদেশের কমিউনিষ্টদের দ্বিতীয় রনাঙ্গন খুলবার দাবী সম্বন্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন। চার্চ্চিল স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "ফ্রান্সে আমাদের চমৎকার রণাঙ্গন খোলা হয়েছিলো, কিন্তু হিটলারের সমগ্র শক্তিপ্রয়োগের ফলে তা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং রণাঙ্গন প্রস্তুত করার চেয়ে নষ্ট করা সহজ।" সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তিকালে যখন ফ্রান্সকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল, এ উক্তির অর্থ তখন মুখোমুখী স্টালিনকে আক্রমণ করা। চার্চ্চিল আরও বলেছিলেন যে রাশিয়ার সঙ্গে মিতালির জন্য, হিটলার ফ্রান্সে তার "সমস্ত" শক্তি প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন।

চার্চিল রাশিয়া সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সে বছর গ্রীষ্মকালে এর চেয়েও আশ্চর্য্যজনক বিবৃতি হ্যারি হপ্‌কিনস প্রকাশ করেছিলেন। "আমেরিকান ম্যাগাজিনে" লিখতে গিয়ে রুজভেল্টের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক উপদেস্টা বলেছিলেন, "আমরা যদি রাশিয়াকে হারাই তা'হলে আমার একবারও মনে হয় না যে আমরা যুদ্ধ পরাজিত হব...." লালফৌজ স্টালিনগ্রাড্ দখল করে নিয়ে জার্ম্মানদের হটিয়ে দিয়েছিল। এখন রাশিয়ার পক্ষে হিটলারের গুঁতো খেয়ে আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। আমরা রাশিয়াকে হারাতে পারি যদি রাশিয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে পৃথক সন্ধিস্থাপন করে।"

১৯৪৪ সনের ১৯শে জানুয়ারী স্বরাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টে তার অফিসে আমাকে বলেছিলেন কেন তিনি গত হেমন্তকালে পররাষ্ট্র সচিবদের প্রথম বৈঠকে যোগদান করবার জন্য মস্কো গিয়েছিলেন। "ওয়াশিংটন, লণ্ডন এবং চুংকিংয়ে জার্ম্মাণীর সঙ্গে রাশিয়ার যে পৃথক সন্ধির কথা শোনা গিয়েছিলো তার ভিতরকার কথা আমি জানতে চেয়েছিলাম," তিনি বলেছিলেন। "আমরা এ সম্বন্ধে অন্ধকারে ছিলাম...." আমেরিকা এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ত্রিশক্তি চুক্তি সম্বন্ধে স্টালিনের আনুগত্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এই অবচেতন মানসিক অবস্থা ১৯৪৩ সনে তেহেরানে বৃটিশ ও আমেরিকার কূটনীতিকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছিল। এতে স্টালিনের পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। পোলাণ্ড অধিকার অথবা অন্যান্য সুবিধা পাবার জন্য তিনি যে দাবী করেছিলেন তার পিছনে ছিল অস্পষ্ট ভীতি যে তার দাবী অগ্রাহ্য হলে তার পক্ষে অন্য কিছু করবার আছে: তিনি হিটলারহীন জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধি করবেন।

তেহেরান বৈঠক স্টালিনের জয় ঘোষণা করে এবং "তেহেরান" সেজন্য বিদেশী কমিউনিষ্টদের বাঁধা বুলি এবং কর্ম্মপদ্ধতি হয়ে

দাঁড়িয়েছিল, বিশেষকরে ব্রাউডার চলিত আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির। কিন্তু ক্রেমলিন্ শেষপর্য্যন্ত স্থির করল যে এই বৈঠকে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে নানারকমের সন্দেহ অবসান ঘটেছে। ভবিষ্যতে কি করতে চান স্টালিন চানলা তা কেউ বুঝাতে পারে। ১৯৪৪ সনের ১৭ই জানুয়ারী, এজন্য 'প্রাভদা' কাইরোর "নিজস্বসংবাদদাতা" প্রদত্ত এক অদ্ভুত খবর ছাপায় (পরে জানতে পারা গিয়েছে, ওখানে রাশিয়ার কোন সংবাদ দাতা নেই) যে "দুজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ইংরেজ" জার্ম্মাণীর সঙ্গে এক পৃথক সন্ধি করবার জন্য নাৎসী পররাষ্ট্র সচিব ডন্ রিবেনট্রপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন। 'প্রাভদা'র "নিজস্ব সংবাদদাতা" কাইরো থেকে জানিয়েছিলেন যে তিনি "গ্রীক এবং যুগোশ্লাভ" মহল থেকে খবর পেয়েছিলেন; রিবেনট্রপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, "গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে" হয়েছিলো।

এ উপাখ্যান যে বানান তা বেশ পরিস্কার বোঝা যায় এবং 'প্রাভদা' সাধারণতঃ এরকম অর্থহীন, রহস্যজনক গল্প ছাপায় না। এটা একটা [illegible] নিয়ে ছাপা হয়েছিলো। আমেরিকার ও ইংলণ্ডের [illegible] কে খুব বিশিষ্টতা দান করেছিলো। এ সংবাদ [illegible] কারণ 'প্রাভদা' এটা প্রকাশ করেছিলো।

যেদিন 'প্রাভদা'-ঘটিত ব্যাপার আমেরিকায় প্রকাশিত হয় সেদিন আমি ওয়াশিংটনে ছিলাম। আমি একা বসে বৃটিশ রাজদূত লর্ড হালিফাক্সের সঙ্গে চা খাচ্ছিলাম। প্রথমেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, "বলুন দেখি, রাশিয়ানরা কি চায়? কেন এরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জার্ম্মাণীর সঙ্গে পৃথক সন্ধির কথা তুলে আক্রমণ করেছে?" একই প্রশ্ন স্বরাষ্ট্রসচিব হাল, সহকারী স্বরাষ্ট্রসচিব স্টেটিনিয়াস্, সহকরী এ্যাডলফ্ এ বারলে এবং পরিচিত অন্যান্য আমেরিকার ও বিদেশী রাজনীতিজ্ঞের জেগেছিলো। তাঁরা সকলেই

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

আমার মনে হয় প্রাভদার উপাখ্যানের উদ্দেশ্য ছিল ঠিক এরকমই জটিলতা সৃষ্টি করা। "আমরা যে জার্ম্মানীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছি, তা রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর সন্ধিকে প্রমাণ করবার জন্যই, মস্কোর আপত্তিটা হয়তো তা-ই।" রাজনীতিজ্ঞরা ব্যাপারটা নিয়ে এভাবে আলোচনা করছিলেন। তেহেরাণের পর মৈত্রীবন্ধনের প্রতি আনুগত্য রাশিয়ার মন থেকে দূরীভূত হয়। তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। রাশিয়াকে আবার খুসী করতে হবে। রাশিয়াকে এভাবে ফেলে রাখলে চলবেনা। এই অবস্থায়, স্টালিন রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিলের কাছ থেকে যে সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিলেন তা হজম করে আরও কিছু আদায় করতে পারেন। এতে তাঁকে ঋণ-ইজারা ব্যবস্থা থেকে আরও সামরিক রসদ পেতে সাহায্য করেছিলো।

১৯৪৩ সনে রাশিয়া যখন যুদ্ধ জয় করতে আরম্ভ করে তখন পৃথক সোভিয়েট-জার্ম্মান চুক্তির সম্ভাবনা বেশী করে প্রকাশ পেয়েছিলো; স্টালিন এই কারণে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাছে তেহারাণে সুযোগ সুবিধা দাবী করতে পেরেছিলেন। আরও কিছুদিন বাদে লালফৌজ পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপে প্রবেশ করে। এবং ক্রেমলিন্ ছোট ছোট দেশের উপর প্রভুত্ব খাটাতে আরম্ভ করে। এর ফলে ত্রিশক্তির বন্ধুত্বের মধ্যে একটা নতুন সম্বন্ধের সূচনা হয়। সোভিয়েট প্রভুত্ব ও অগ্রগতিতে বাধাদান করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড ইয়ালটাতে রাশিয়ার প্রায় সমস্ত দাবী মিটিয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলো।

যুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক দেশগুলো জনসাধারণকে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলো। জনসাধারণ একথাই বুঝতে চেয়েছিলো যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে সব কিছুই

ভাল চলছে, এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গও তাদের একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক বৈঠককেই তাং যুদ্ধোত্তর স্বর্গ প্রস্তুত করবার উপযুক্ত ভিত্তি বলে ঘোষিত করা হয়েছিলো।

আর কোন উপায় ছিল কি? রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল কি রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করে, জার্ম্মানীর সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে দিতে পারতেন? এর ফলে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতো এবং আমেরিকা, বৃটেনের অন্যান্য সকল দেশের ভীষণ রকমের ক্ষতি হতো। হ্যারি হপকিন্সের আশা সত্ত্বেও, রাশিয়াকে হারালে পশ্চিম দেশীয় মিত্রশক্তি হয়তো যুদ্ধে পরাজিত হতো। স্টালিন যা চেয়েছিলেন তা দিতে অস্বীকার করলে, ধরা যাক পোলাণ্ডের কথা, বাধ্য হয়ে তিনি জার্ম্মানীর সঙ্গে মিত্রতা করে সেটা আদায় করতে চেস্টা করতেন। তিনি ১৯৩৯ সনে এটা করেছিলেন, এবং তিনি হয়তো মনে করতেন যে তখনকার চেয়ে এখন অবস্থা আরও ভাল।

এটা হচ্ছে অসম্ভব দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। যখনি আমি মিত্রপক্ষের সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে যুদ্ধকালীন শান্তির কথা আলোচনা করেছি তখনি তারা এ প্রশ্ন তুলেছেন, "ধরুন, যদি রাশিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করে?" আমি একবার স্বরাষ্ট্রসচিব হালের সঙ্গে পোলাণ্ড এবং বাল্টিক উপসাগরস্থ রাষ্ট্রসমূহের উপর রাশিয়ার মতলব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "আপনি যদি এপ্রশ্ন নিয়ে মস্কোর সঙ্গে আলোচনা করতে চান, তাহলে আপনাকে আমেরিকার সেনা এবং নৌবহর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।" স্টালিনকে অন্তত বাধা দেওয়া যেতে পারে এমন উপায় আর অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করা যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশের পক্ষে অসম্ভব।

সাধারণ লোক কেবল সমালোচনা করতে পারে। ধরা যাক, যে নীতি সে সমর্থন করে তার ফলে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি হবে এটা সে জানে। রুজভেল্ট, হপকিন্স এবং চার্চ্চিল সুযোগ

সুবিধা দান করে স্টালিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে যুদ্ধের পরিণতি আশঙ্কাজনক। কিন্তু এটা ঠিক নয়। জার্ম্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার পৃথক চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। বাস্তবিকপক্ষে তা অসম্ভবই ছিল। এটা কি করে ঘটতে পারতো? জার্ম্মানীর পক্ষ থেকে প্রকৃত চুক্তির প্রস্তাব এলে স্টালিন মনে করতে পারতেন যে জার্ম্মানীর অবস্থা খুবই খারাপ এবং তার পক্ষে এরকম প্রস্তাব গ্রহণ করা নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। একই কারণে মস্কোর কাছ থেকে কোন খাঁটি প্রস্তাব এলে বার্লিন মনে করতে পারতো যে রাশিয়ার ভিতরে গলদ আছে এবং জার্ম্মানী রাশিয়াকে ধ্বংস করবার জন্য আরও বেশী করে চেষ্টা করতো।

দ্বিতীয় স্টালিন-হিটলার চুক্তি হওয়াতে এত বেশী বাধা ছিল, এবং এজন্যই ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সনের জার্ম্মানীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে এটা হিটলারকে গদিচ্যুত করতে সাহায্য করেছে। মস্কোর স্বাধীন জার্ম্মান কমিটি এবং জার্ম্মান সেনাদলের কাছে স্টালিনের যে আবেদন নিবেদন তাকে গভীরভাবে গ্রহণ করলে ঠিক হবে না; শেষদিন পর্য্যন্ত হিটলার নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন।

অধিকন্তু, যুদ্ধের সময়, মস্কোর জার্ম্মানী ও ইউরোপে বিস্তার লাভ করবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পৃথক জার্ম্মান-রাশিয়ান চুক্তির ফলে তৃপ্ত হতে পারতোনা। এরকম চুক্তি হলে সেটা একটা আপোষেরই নামান্তর হতো এবং সোভিয়েট বিস্তার লিপ্সায় বাধা পড়তো। রাশিয়ার বর্ত্তমান সাম্রাজ্য যতটা বিস্তার লাভ করেছে পৃথক চুক্তি হলে এতটা হতোনা। এই চিন্তাই স্টালিনকে পৃথক চুক্তি করতে দিতনা।

খুব অল্প দিনের জন্য, হয়তো ১৯৪৩ সনের কয়েক মাস যখন হিটলার রাশিয়াকে ধ্বংস করা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন এবং

স্টালিনও তাঁর দেশ থেকে জার্ম্মানদের তাড়িয়ে দেওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন নাই সে সময়ে একটা পৃথক রুশ-জার্ম্মান চুক্তি হলেও হতে পারতো। কিন্তু হিটলারের অপরাধ এবং "দৃষ্টিভঙ্গি"ই ছিল বাধা; হিটলারের সঙ্গে স্টালিনের অভিজ্ঞতা ছিল আর এক বাধা।

ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন। বৈমানিকের মত রাজনীতিজ্ঞও হিসাব করে চলেন। তিনি কতগুলো যন্ত্রের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেন এবং এ যন্ত্র হচ্ছে তাঁর জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, মানসিক বৃত্তি, তাঁর বিপক্ষ দলকে পরীক্ষা করবার ক্ষমতা। পৃথক রুশ-জার্ম্মান চুক্তির সম্ভাবনা এত কম ছিল এবং অ্যাংলো-আমেরিকান্ চাল এত মজবুত ছিল যে (ঋণ-ইজারা, ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক শক্তি ইত্যাদি) কেউ বলতে পারে তেহেরাণ এবং ইয়ালটাতে স্টালিনের কাছে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁরা যে আত্মসমর্পণ করেছিলেন সেরকম না করলেও পারতেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, স্বরাষ্ট্র সচিব হাল এবং সহকারী স্বরাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস্ খুবই জোরের সঙ্গে রাশিয়ার বাল্টিক রাষ্ট্র-সমূহের অধিকার নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। রুজভেল্ট-স্টালিনের যুদ্ধকালীন পোলাণ্ডের সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তবুও তেহেরাণ এবং ইয়ালটাতে রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল স্টালিনের মতে মত দিয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরা বাধ্য হয়েই তা করেছিলেন। পাছে স্টালিন পৃথক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সেজন্য তাঁকে খুসী রাখবার চেষ্টা।

এর ফলে যুদ্ধকালীন শান্তি বৈঠকের ফলাফল—এবং বর্ত্তমানের শান্তি তাঁরই সৃষ্টি—ন্যায় অথবা আনন্দপূর্ণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবী কোনটারই উপযুক্ত নয়, বরং দ্রুত দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে পশ্চিম দেশীয় রাষ্ট্রগুলো যা নিতে পেরেছিল তারা দিয়েছিল তার চেয়ে বেশী; বলশেভিকেরা শুধুই নিয়েছে। কেউ

প্রশ্ন করেনিঃ এটা কি ভাল হয়েছে? জনসাধারণ প্রশ্ন করেছিলঃ এ কি বাদ দেওয়া যেতে পারতোনা?

স্টালিনের পরিকল্পনা চিরাচরিত প্রথায় একই ছাঁচের পুনরাবৃত্তি করেছেঃ পূর্ব্ব পোলাণ্ড দখল করার ফলে রাশিয়া চেকোশ্লোভেকিয়ার সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। বল্টিক রাষ্ট্রসমূহ এবং পূর্ব্ব প্রুশিয়া দখল করার মানে রাশিয়া জার্ম্মানীর সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত হবে। কারপেথোরুশ (রুমানিয়া) অধিকারের ফলে রাশিয়া হাঙ্গেরীর সীমান্তে এসে পৌঁছবে। পারস্যদেশের আজারবাইজান দখল অথবা অন্য কোন অছিলায় রাষ্ট্রভুক্ত করার মানে তুরস্কের সীমান্তের সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করে দেওয়া।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত রাশিয়া চেকোশ্লোভেকিয়া, জার্ম্মানী, হাঙ্গেরী কিম্বা নরওয়ের সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলনা। এখন সেটা হয়েছে এবং এজন্য এসব দেশের উপর তার প্রভুত্ব বেশী।

জার্ম্মানীর অর্দ্ধেক, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী দখল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা ইউরোপে সোভিয়েট শক্তি বিস্তার করা। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া দখল, এবং যুগোশ্লাভিয়াতে কমরেড টিটোর প্রাধান্যে রাশিয়ার প্রভাব ইটালী, গ্রীস, তুরস্ক এবং ভূমধ্যসাগরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

মস্কো চীন এবং অন্যান্য এশিয়ার দেশগুলোকেও উপেক্ষা করেনি।

ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি যেমন ইন্দোনেশিয়া, প্যালেষ্টাইন, গ্রীস এবং ইটালীর ঘটনা দ্বারা নির্ণীত হয়, সেরকম ফিন্‌ল্যাণ্ডে রাশিয়ার উদ্দেশ্য বোঝা যায় ইরানে তার কার্য্যাবলী থেকে; কার্জ্জন লাইন বার্লিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে; দার্দ্দানেলিসের মুখেই রুমানিয়া।

স্টালিন বিরাট রুশ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা জার্ম্মান

ও জাপানী শক্তি খর্ব্ব হওয়ায় এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর দুর্ব্বলতার জন্য বিস্তারলাভ করবে।

স্টালিনের যুগে সোভিয়েট প্রচারবিভাগ 'রুদ্র' আইভান্, পিটার দি গ্রেট, ক্যাথারিন্ দি গ্রেট, এবং অন্য কোন জার কিম্বা সেনাধ্যক্ষের প্রশংসায় আকাশ বিদীর্ণ করেছে, তা তারা নির্ম্মমতায় দেশবাসীর যত বড় শত্রুই হোক। এর কারণ তারা রাষ্ট্রের সীমান্ত বিস্তারে সাহায্য করেছে। স্টালিন রাশিয়ার পুরাণো সংস্কারকে বাদ দেননি।

এজন্য সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অস্বীকার করা কিম্বা অগ্রাহ্য করার মানে হচ্ছে পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খেই হারিয়ে ফেলা।

রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের সুবিধার জন্য যুদ্ধের সময়ে মস্কো ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল। মস্কো ত্রিশক্তির মধ্যে লুণ্ঠিত সামগ্রী বণ্টন এবং পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে তিনভাগে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলো। এর ফলে বিদেশী কমিউনিষ্টরা সাম্রাজ্যবাদকে সহ্য করতে আরম্ভ করেছিল; কার্য্যত তেহেরাণের পরে তারা বলেছিলো সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের পরে, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে বেশী করে শত্রুতার ভাব দেখাতে আরম্ভ করে।

কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হয়ে তেহেরাণ ও ইয়ালটাতে ত্রিশক্তি বৈঠক একটা বিশেষ পন্থা মেনে নিয়েছিলো; তিন ব্যক্তি ত্রিশক্তির হয়ে কথা বলে পোলাণ্ডের মত দুর্ব্বল মিত্রশক্তির— যারা সেখানে উপস্থিত ছিলনা— ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বিশ'এর অধিক মিত্রশক্তি চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু ত্রিশক্তিই শান্তি স্থাপনের রূপদান করল। এটাই হচ্ছে

মিত্রশক্তির গণিত। চেষ্টা কিম্বা বিদ্রোহ ঘোষণা করেও ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর গভর্ণমেন্ট যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রচেষ্টাকে প্রচণ্ড ত্রিশক্তির হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে আনতে পারল না।

যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য ত্রিশক্তির দানই সর্ব্বাধিক। এতে করে জ্ঞান ও ভদ্রতাবোধে তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রমাণ করে না। একচেটিয়া সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা তাদের ভিতরে স্বার্থপরতা এবং অভদ্রোচিত শক্তির লড়াই করবার যথেষ্ট সুযোগ এনে দিয়েছে। বলবানের প্রাধান্য ন্যায় ও গণতন্ত্রের বিরোধী। প্রত্যেক গণতন্ত্রের সমস্যা হচ্ছে বহু লোকের ভোটের দ্বারা সংখ্যালঘুর প্রাধান্য খর্ব্ব করা, কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে ভোটদাতাগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার মিলন ঘটান। ত্রিশক্তি কিন্তু অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের সঙ্গে "পরামর্শ" এবং "আলোচনা" ছাড়া আর কিছুই করেনি। ত্রিশক্তির ভিতরে আবার একজন অপর দুজনকে অগ্রাহ্য করে "ভেটো" প্রয়োগ করতে পারত। সুতরাং একজন পৃথিবীকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা পেয়েছিল। জাতীয়তাবাদের মধ্যে এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ঘটনা এবং আন্তর্জ্জাতিকতার পক্ষে ন্যূনতম।

ত্রিশক্তির লৌহনিগড় থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ত্রিশক্তির সাহায্যে আন্তর্জ্জাতিক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা। তার মানে আন্তর্জ্জাতিক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায় অনেক বাধা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এ প্রশ্ন তেহেরাণ, ইয়ালটা এবং পোটসডামে কোথায়ও উত্থাপিত হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভৌগোলিক সীমা নির্দ্ধারণ নিয়ে হয়নি। এটা হয়েছিলো আমাদের সভ্যতার গলদ থেকে। ১৯৪৩ সনে আমি "এম্পায়ার" নাম দিয়ে ছোট একখানা বইতে লিখেছিলাম, "এযুদ্ধ হয় নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবে নয় আর একটা নতুন মহাযুদ্ধের

সৃষ্টি করবে।” শান্তিকামীরা এক শান্তিবৈঠকে বসে এ রোগ নির্ণয় করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে পারতেন। কিন্তু তাদের এমন কোন সময় ছিলনা। বর্ত্তমান যুগের রাজনীতিজ্ঞরা এত বেশী দ্রুত চলেন যে তাঁরা প্রায়ই থেমে এ বিষয়ে চিন্তা করবার অবসর পাননা যে তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন। রুজভেল্ট, চার্চ্চিল এবং স্টালিন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ত লোক এবং পাঁচদিন বৈঠকে বসে তাঁরা দু'শ কোটী মানুষের ভবিষ্যৎ দ্রুত নির্দ্ধারণ করে ফেললেন। তাঁদের প্রথম কাজ ছিল যুদ্ধে জয়লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা রণনীতি স্থির করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তেহেরাণ, ইয়ালটা এবং পোটস্‌ডামে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার ফলে তৃতীয় মহাযুদ্ধকে বাধা দেওয়া চলবেনাঃ এ শান্তি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জয় করবার জন্য। এ শান্তি যুদ্ধকালীন মিত্রপক্ষকে সুখী রাখার উপায় মাত্র। রাশিয়াকে ঋণ-ইজারা দেবার ব্যবস্থা অথবা ফ্রান্সের আক্রমণের পরিকল্পনার মত এটাও ছিল সামরিক ব্যবস্থা।

১৯৪১ সনের ১৪ই আগষ্ট রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের মনঃস্থির করার পর ১৯৪২ সনের ১লা জানুয়ারী সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ আটলান্টিক সনদ'এ স্বাক্ষর করেন। এটা কোন আদর্শবাদের কথা নয়, এ সনদ হয়তো স্থায়ী শান্তির ভিত্তি স্থাপন করতে পারতো। কিন্তু তেহেরাণে এটা হয়ে পড়লো একটা মূল্যহীন দলিল। ইয়ালটাতে এটাকে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো।

আটলান্টিক সনদের ৮টি বিষয়বস্তুর প্রথম দফাতে বলা হয়েছে, “তাদের রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রগত কিম্বা অন্য রকমের বিস্তার চায়না।” দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, “তারা রাষ্ট্রের নতুন সীমানা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যদিনা তা জনসাধারণের ইচ্ছাদ্বারা সাব্যস্ত হয়।”

রুজভেল্ট, চার্চ্চিল এবং স্টালিন তেহেরাণ এবং ইয়ালটাতে

পোলাণ্ড এবং জার্ম্মানী সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাদ্বারা এ দুই দফা চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছিলো। নিজেদের কথার খেলাপ করে তাঁরা শান্তি নষ্ট করতে আরম্ভ করেছিলেন।

১৯৩৯ সনে সোভিয়েট ইউনিয়ান পূর্ব্ব পোলাণ্ড দখল করার পর, "গণভোট" নেবার ব্যবস্থা করেছিলো, অবিশ্যি দশ লক্ষের উপর লোককে সাইবেরিয়া এবং তুর্কিস্থানে নির্ব্বাসন দেবার পর, শতকরা নব্বই জন লোক রাশিয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। ১৯১৮ সনের ১৮ই নবেম্বর, আদর্শবাদের দিনে, সোভিয়েট কংগ্রেস এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো যে যদি কোন দেশ অন্য কোন দেশদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যদি সে জাতির কোনরকম চাপ দেওয়া ছাড়া গণভোট দ্বারা স্বাধীন জীবন যাপন করবার অধিকার স্বীকার করা না হয়, যদি আক্রমণকারী রাষ্ট্র কিম্বা অন্য কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সৈন্যদলকে অপসারিত করা না হয়, তবে এ অধিকারকে বলা হবে দখলদারী; এটা বিদেশী শাসন এবং অপরাধ।"

লেনিনের প্রভাবে যে সোভিয়েট বৈঠক বসেছিলো তার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, স্টালিনের পূর্ব্ব-পোলাণ্ড দখলকে একটা গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা যেতে পারে।

কার্ল মার্কস, যিনি ইউরোপীয় রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রামাণিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ১৮৪৮ সনের ১৯শে আগষ্ট 'নিউ রিন্ জীটান' এ লিখেছিলেন, "গণতান্ত্রিক জার্ম্মানী প্রতিষ্ঠার প্রধান সর্ত্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক পোলাণ্ড প্রতিষ্ঠা। কাগজে-কলমে শুধু স্বাধীন পোলাণ্ড গড়ে তুলবার প্রশ্ন এ নয়, রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভিত্তি এবং স্বপ্রতিষ্ঠ করার প্রশ্ন। ১৭৭২ সালে পোলাণ্ডের যে সীমানা ছিল তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।" তা ১৯৩৯ সনে পোলাণ্ডের যা ছিল তার চেয়েও বেশী। ক্রেমলিনে কেউ কি মার্কস পড়ে?

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের সঙ্গে চুক্তির ফলে রাশিয়া পূর্ব্ব পোলাণ্ড অধিকার করে কিন্তু ১৯৪১ সনের ৩০শে জুলাই রাশিয়া এবং পোলাণ্ড লণ্ডনে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যার ফলে, "সোভিয়েট সরকার স্বীকার করেন ১৯৩৯ সনে পোলাণ্ডের সীমানা নিয়ে যে সোভিয়েট-জার্ম্মান চুক্তি হয়েছিলো তা আর বৈধ রইল না।" হিটলারের অনুগ্রহে স্টালিনের বলপূর্ব্বক রাজ্য দখলের লিপ্সাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লালফৌজের আওতায় গণভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিলো। এর ফলে পোলাণ্ড তার পূর্ব্বের রাজত্ব ফিরে পেয়েছিলো।

তবুও ১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া আটলান্টিক সনদে স্বাক্ষর করবার পর এবং জার্ম্মানীর কাছ থেকে সোভিয়েট সরকার পূর্ব্ব পোলাণ্ড পূর্ণদখল করবার আগেই তেহেরাণে রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল রাশিয়াকে তা দিয়ে দিয়েছিলেন; এর নাম রাজ্যবিস্তার। তাঁরা জনসাধারণের সম্মতি ছাড়াই তা করেছিলেন। তাঁরা কেবল স্টালিনের সঙ্গেই পরামর্শ করেছিলেন। পোলাণ্ডের ভবিষ্যৎ যত জটিল হোক না কেন, এ কাজ পোলাণ্ডে সব চেয়ে বেশী জটিল। এর ফলে এক কলঙ্কপূর্ণ, ঘৃণ্য নীতির প্রচার করা হয়েছিলো। ত্রিশক্তি যখন একত্র হয় তখন কোন নীতিই খাটেনা।

তারপরে, বাস্তবিক পক্ষে, গভর্ণমেন্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার বিভাগ এবং কমিউনিস্ট দলের ধূর্ত্ত লোকদের একত্র করে রাশিয়া কর্ত্তৃক কার্জ্জন লাইনের পশ্চিম দিকের ভূমিখণ্ডের অধিকার যথার্থ হয়েছে বলে এক ভীষণ গোলমাল সৃষ্টি করা হয়েছিলো। এটা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের এক দুর্দ্দৈব ঘটনা যে এই অস্বাভাবিক চীৎকারকে গণতান্ত্রিক দেশে অনেকে স্বাভাবিক দাবী বলে মেনে নিয়েছিলো এবং আরও অনেককে তা বোকা বানিয়ে দিয়েছিলো।

প্রচারবিদরা বলেন, কার্জ্জন লাইন পর্য্যন্ত পোলাণ্ডের অংশ আগে

রাশিয়ার ছিল। তা ঠিক কথা নয়। পূর্ব্ব গ্যালেসিয়ার, যে অংশ দাবী করা হয়েছে, তার বৃহৎ এবং ভাল অংশটুকু জারের আমলে রাশিয়ার ছিলনা।

কেবল এই অংশের সামান্য কিছু জারের আমলে রাশিয়ার ছিল। জাররাইবা তা পেল কোথেকে? বলশেভিক শাসনের সৃষ্টিকর্ত্তা লেনিনই এর সাক্ষ্য দেবেন। ১৯০৭ সনের মে মাসে প্রকাশিত 'ওয়ার এণ্ড রেভলুশন'-এ লেনিন পোলাণ্ড এবং ল্যাটভিয়ার একটা প্রদেশ কোরল্যাণ্ড, জারের আমলের রাশিয়া, সাম্রাজ্যবাদী জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্র কর্ত্তৃক ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কোরল্যাণ্ড ও পোলাণ্ড" তিনটি রাজদস্যু কর্ত্তৃক ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়েছিলো। তারা এই দুই রাজ্য এক'শ বছরের জন্য ভাগ বাঁটোয়ারা করেছিলো। এর জীবন্ত মাংস ছিঁড়ে নিয়েছিলো। এবং সবচেয়ে বেশী ছিঁড়ে নিয়েছিলো রুশীয় দস্যু কারণ সে-ই ছিল সব চেয়ে বেশী বলিষ্ঠ।

বলশেভিক স্টালিন কোন এক দস্যু জারের চুরির উপর নিজের দাবীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্টালিনবাদ যখন জারবাদের কাছে অনুপ্রেরণার জন্য তাকায় তখন আর কি আশা করা যেতে পারে?

লেনিন কর্ত্তৃক স্টালিনের কার্য্যের নিন্দার আর একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। ১৯১৭ সনের ২৯শে এপ্রিলের এক পার্টি-বৈঠকে লেনিন বলেছিলেন, "একসময়ে প্রথম আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ান পোলাণ্ড নিয়ে জুয়া খেলেছিলেন। একসময়ে জারগোষ্ঠী পোলাণ্ডের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছিলো। আমরা কি জারের অনুসরণ করবো? তা'হলে আন্তর্জ্জাতিকতাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। এটা হবে উগ্র স্বাদেশিকতা।" স্টালিনের স্বাদেশিকতা একেই বলে।

পূর্ব্বে কোন দেশের অধিকারে কোন রাজ্য ছিল বলেই সে রাজ্য যে সে দেশেরই হবে এ ধারণা অত্যন্ত মারাত্মক; তা হলে সারা

দুনিয়া পাগলা গারদে পরিণত হবে। ইংলণ্ড ভার্জ্জিনিয়া, বোস্টন, এবং ফ্রান্সের কতকাংশ দাবী করতে পারে। রোম লণ্ডন নিতে পারে; ওলন্দাজরা নিউইয়র্ক দাবী করতে পারে। ফরাসীরা নিউ অরলিয়ান্স নিতে পাবে; তুরস্ক মিশর, প্যালেষ্টাইন, সোভিয়েট উক্রেন, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া দাবী করতে পারে; সুইডেন রাশিয়ার অনেকাংশই নিয়ে নিতে পারে; স্পেন ক্যালিফোর্ণিয়া দাবী করতে পারে; ইতালী স্পেন, জাপান, চীন ও ইণ্ডোচীন দাবী করতে পারে; চীন ইন্দোচান নিতে পারে; ইরাণ ভারতবর্ষের কতকাংশ দাবী করতে পারে; গ্রীসও ভারতবর্ষের সমান দাবী করতে পারে। কিন্তু এভাবে অরাজকতারই সৃষ্টি হবে।

প্রচারবিদরা বলেন: ১৯২০ সনে রাশিয়া দুর্ব্বল ছিল সেজন্য এই অংশ পোলাণ্ডকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। তা ঠিক নয়। আবার লেনিন, তখন তিনি সোভিয়েট সরকারের শিরোমণি এবং নিজের কার্য্যের নিষ্ঠুর প্রতিবাদকাবী, এ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। তিনি ১৯২০ সনের নবেম্বর মাসে মস্কোতে বলেছিলেন, "ওয়ারসোতে ক্ষতি স্বীকার করেও লালফৌজের জয়লাভ প্রশংসনীয়, কারণ পোলাণ্ডকে এরকম অবস্থায় এনে ফেলা হয়েছিলো যে যুদ্ধ করবার মত তার আর কোন ক্ষমতাই ছিলনা। পোলাণ্ডের সাধারণ অবস্থা এত বেশী অস্থায়ী হয়ে পড়েছিলো যে তার পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা।" এই উক্তি অতি খাঁটি সত্য। কাজেই দুর্ব্বল রাশিয়ার কাছ থেকে শক্তিশালী পোলাণ্ডের এই অংশকে ছিনিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠেনা। বাস্তবিক পক্ষে ইচ্ছা করেই লেনিন ১৯২১ সনের শান্তি আলোচনায় পোলাণ্ড যা দাবী করেছিলো তার চেয়ে বেশী দিয়েছিলেন, কারণ তিনি কার্জ্জন লাইনের অধিবাসীদের সোভিয়েট রাশিয়ার আওতার ভিতরে নিতে চাননি। এদের অনেকেই রোমানক্যাথলিক ছিল এবং

তাঁর হাতে রোমানক্যাথলিক সমস্যা এসে পড়ে তাও তিনি চাননি। রাশিয়া এবং পোলাণ্ডের মধ্যে তিনি একটি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সীমান্ত চেয়েছিলেন এবং তা তিনি পেয়েও ছিলেন।

ধরা যাক রাশিয়া তখন দুর্ব্বল ছিল এবং পোলাণ্ডকে রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। এই রাজত্ব ছেড়ে দেওয়া নীতির দিক থেকে ঠিক হতো। পৃথিবীতে ন্যায় অথবা স্থায়িত্ব বলে কোন জিনিষ থাকবেনা যদি কোন দেশ দুর্ব্বল থাকার জন্য রাজত্ব হারিয়ে ফেলে এবং শক্তিশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে তা ফিরিয়ে পাবার জন্য দাবী করে। তাহলে ভবিষ্যৎকালে জার্ম্মানী, জাপান ও ইতালীর কি হবে ?

প্রচারবিদ্‌রা বলেন, এই দ্বন্দ্বপূর্ণ কার্জ্জন লাইনের অধিবাসীদের বেশীর ভাগই রুশবাসী শ্বেত রাশিয়ান্ অথবা উক্রেন্‌বাসী। অষ্ট্রিয়া ও সুদেতানল্যাণ্ডের অধিবাসীর বেশীর ভাগই জার্ম্মান। সেজন্যই কি আমরা হিটলারের আক্রমণকে সমর্থন করেছিলাম ? বেশীর ভাগ অধিবাসীই যদি রাশিয়ান হতো তা'হলে মস্কো লালফৌজ এবং জিপিইউ-এর অপসারণের পর কেন আন্তর্জ্জাতিক তত্ত্বাবধানে স্বাধীন নির্ব্বাচনের জন্য অপেক্ষা করলোনা ?

প্রচারবিদরা বলেন, পূর্ব্ব-পোলাণ্ড রুশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ঘৃণ্য পোলের চাইতে বেশী সুখী থাকবে। কে তা বলতে পারে ? কেইবা ঠিক করতে পারে ? মস্কোর সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ভাব রেখে ওয়ারস'তে কি নতুন শাসনব্যবস্থা চালু হয়নি, আর প্রচারবিদদের কথা অনুসারে তা কি পূর্ব্বতন শাসনব্যবস্থার চাইতে ঢের বেশী উন্নত নয় ? তাহলে এদের হাতেই বা কেন পূর্ব্ব-পোলাণ্ডের শাসনব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়না ?

পোলাণ্ড, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ অথবা বলকান্ দেশগুলো রাশিয়ার শাসনে অথবা রাশিয়ার কর্ত্তৃত্বে ভাল থাকবে এই কারণ প্রদর্শন করা

হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন ধুয়া। এটা হচ্ছে ভারতবর্ষে "শ্বেত জাতির দায়িত্ব" সম্বন্ধে ইংরেজের যুক্তি এবং আবেসেনিয়াকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার জন্য মুসোলিনীর সেখানে যাওয়ার হেতুরই পুনরাবৃত্তি। হিটলারও একথা বলেছিলেন যে তিনি পোলাণ্ডের জন্য ভাল জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করবেন। সমস্ত লাটিন আমেরিকার গণতন্ত্র অথবা এর কয়েকটি আমেরিকা কর্ত্তৃক অধিকৃত হলে পর তাদের জীবন যাত্রা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, যানবাহন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার যথেষ্ট উন্নতি হবে। এজন্য কি যুক্তরাষ্ট্র এগুলো দখল করে বসবে?

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও তার বিদেশী সুহৃদগণ ফিন্ল্যাণ্ড, ইস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, ইরাণ এবং তুরস্কে ১৯৩৯ সনের পর থেকে রাশিয়াব কার্য্যের জন্য যে বড় বড় কথা বলেন তা আগেই আক্রমণের ব্যাখ্যা নিয়ে ১৯৩৩ সনের বৈঠকে শেষ মহিকান্ বলশেভিক সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব ম্যাক্সিম্ লিট্ভিনভ্ আফগানিস্থান, ফিন্ল্যাণ্ড, ইস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ইরাণ, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং তুরস্ককে সোভিয়েট ইউনিয়ানেব সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করবার জন্য যে প্রবোচনা দিয়েছিলেন তাতেই এর জবাব খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছিলো, "কোন রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, অথবা অন্য কোন কারণকেই আক্রমণের হেতু বলে মনে করা হবেনা।" এর কারণ হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আক্রমণ এবং রাজ্যবিস্তার অন্যান্য রাষ্ট্রেব মনে সন্দেহ এবং গোলমালের সৃষ্টি করে, যার ফলে অন্যপক্ষ আগে কিম্বা পরে বিরুদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে যা প্রায়ই যুদ্ধের জন্য দায়ী, যার জন্য যুদ্ধ সংঘটিতও হয়। এ ভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল।

তবুও হিটলার, মুসোলিনী, হিরোহিতোর আক্রমণের ফলে যে

যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তা দেখেও রুজভেল্ট এবং চার্চিল তেহেরাণ ও ইয়ালটাতে রাশিয়া কর্তৃক নতুন আক্রমণ অনুমোদন করেছিলেন।

১৯২০ সনের ২২শে ডিসেম্বর এক বৈঠকে লেনিন বলেছিলেন, "আপনারা জানেন রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে কতগুলো রাষ্ট্রের সঙ্গে, যারা পূর্ব্বে রুশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং যারা আমাদের প্রধান নীতির ফলে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অবাধে স্বাধীনতা লাভ করছে, শেষ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

ক্রেমলিন যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য অপহরণ করে চলছিলো, তখন সে সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির 'মূল ভাবধারাকে' অস্বীকারই করেছে। আমি সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে "দি সোভিয়েটস্ ইন্ ওয়ার্ল্ড্ অ্যাফেয়ার্স" নাম দিয়ে দু'খণ্ডে একটি বই ১৯৩০ সনে প্রকাশ করেছিলাম। বহুদিন আমি সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির ধুরন্ধরদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। প্রয়োজনীয় সমস্ত সোভিয়েট দলিলপত্র ও পুস্তিকা পড়েছি। ১৯২০ সন থেকে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত কোন সোভিয়েট মুখপাত্র কিম্বা সোভিয়েট পুস্তিকা ফিনল্যাণ্ড কিম্বা পোলাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সীমান্ত নিয়ে প্রতিবাদ কিম্বা সমালোচনা অথবা বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতার বিপক্ষে আক্রমণ করেনি। মস্কো এ দেশগুলোকে স্বীকার করেছিলো এবং কূটনীতি ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত সম্বন্ধ বজায় রেখেছিলো। সীমান্ত নিয়ে যদি বলশেভিকরা সন্তুষ্ট না থাকতো তা'হলে তারা প্রতিবাদ করলেইতো পারতো, যেমন করেছিলো ব্যাসারা-বিয়ার বেলায়, ১৯১৯ সনে যে ব্যাসারাবিয়াকে রুমানিয়া দখল করে নিয়েছিলো। সোভিয়েট সরকার ব্যাসারাবিয়ার ক্ষতি স্বীকার করেনি এবং সোভিয়েট মানচিত্র ব্যাসারাবিয়াকে এভাবে চিহ্নিত করে দেখিয়েছিল যেন সে দেশ তাদেরই অধীনস্থ, যদিও তখন ব্যাসারাবিয়া রুমানিয়ার শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু কার্জ্জন-

লাইনের অংশে পোলাণ্ডের অধিকার নিয়ে কিম্বা ফিনল্যাণ্ডের কোন অংশ অথবা বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে সোভিয়েট সরকার এরকম কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি। তাদের ছিনিয়ে নেবার শক্তি যখন হয়েছিল তখনই এগুলো দাবী করা হয়েছিল। সেজন্য সমস্ত রাজনীতিবিশারদরা নরম গণতান্ত্রিক বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবার জন্য নানারকম অছিলা আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছিল। এবং তারা কিছুদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যতা লাভও করেছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান গোলমেলে অবস্থা কেবল অন্যায়কারীরাই সৃষ্টি করেনি, বহু ভাল লোক অন্যায়কারীদের খুসী রাখতে এবং তাদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার সহায়তা করেছে।

নাৎসী পররাষ্ট্র আক্রমণ সম্বন্ধে নিন্দা (যা বলশেভিক আক্রমণের উপরও প্রয়োগ করা চলে) করতে গিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট, মাইকেল ক্যালিনিন, প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের কথাগুলো স্মরণ করেছিলেন, 'যদি শক্তি থাকে এবং তুমি বিদেশী রাষ্ট্র দখল করতে চাও তাহলে আর সময় নষ্ট না করে এক্ষুণি দখল করে ফেল। দেখবে, দখল করবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উকিল এসে হাজির হয়েছে যারা প্রমাণ করতে চাইবে যে তুমি অধিকৃত দেশ পাওয়ার অধিকারী।" এবং কেবল যে উকিলই আসবে তা-ই নয়।

বেশীর ভাগ লোকই ইরাণ এবং পোলাণ্ডে বলশেভিক পদ্ধতি, চীনে ও অন্যান্য দেশে আমেরিকার কার্য্যকলাপ দেখে সোভিয়েটনীতির বিচার করতে চায়। নিজের দেশে যেখান থেকে এর সৃষ্টি সেখানে ভাল করে লক্ষ্য করলেই সোভিয়েট নীতির পরিচয় পাওয়া যাবে। তখনই দেখা যাবে যে ব্যক্তিত্বের কারসাজি, অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং গণতন্ত্রে দলগত দ্বন্দ্ব একত্র হয়ে রাষ্ট্রনীতি স্থির হয়। এজন্যই আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের স্পেনে লয়ালিষ্টদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ বন্ধ এবং তা স্পেনের ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কহীন; প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্ট লয়ালিষ্ট দলের সমর্থক ছিলেন। সেজন্য ফ্র্যাঙ্কোর পরাজয় তিনি চেয়েছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয়েছিল ক্যাথলিক ও বৃটিশের চাপে এবং রাষ্ট্রপরিচালকদের "পক্ষপাতশূন্য" নির্বিকল্প জনমত ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়ে। এমন অংসখ্য নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে।

পোলাণ্ডে সোভিয়েট উদ্দেশ্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে এমন যায়গাতে পৌঁছান যায় যেখানে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির গোপনীয়তা স্পষ্ট। কয়েক লক্ষ উক্রেন অধিবাসীর সাহায্যে পূর্ব্ব-পোলাণ্ড দখল করে মস্কো সোভিয়েট উক্রেনবাসীর আনুগত্য পেতে আশা করেছিল। রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী যারা জারের আমলের সীমানা এবং আরও কিছু ফিরিয়ে পেতে চেয়েছিল তাদেরও এর সাহায্যে খুসী করতে চেষ্টা করা হয়। বিপ্লবীযুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক কৃতিত্ব অপেক্ষা রাশিয়াকে যে বিপ্লবই রক্ষা করেছে—ক্রেমলিন একথার উপর যুদ্ধের সময় বেশী জোর দিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে সুপ্রিম পলিট ব্যুরোর সভ্য, এ, এস, শেরবাখোভ, ১৯৪৪ সনের ২১শে জানুয়ারী লেনিনস্মৃতি সভাতে ঘোষণা করেছিলেন যে জার আমলের রাশিয়া, "এমন পথে চলেছিল যা শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতা হারাতে বাধ্য হতো। এই কলঙ্ক থেকে আমাদের দেশকে বলশেভিকদল রক্ষা করেছে।" ফলে রাশিয়ার জাতীয়তাবাদীদের যথেষ্ট ভাল কারণ দেখিয়ে কমিউনিষ্টদের বোঝাতে হয়েছে যে সোভিয়েট-শাসন সমর্থনযোগ্য। বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিই হচ্ছে জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে সব চেয়ে ভাল যুক্তি।

বলশেভিকরা সর্ব্বদাই ইউরোপের ব্যাপারে জার্ম্মানীর প্রাধান্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল। জার্ম্মানীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বেশী কর্ত্তৃত্ব লাভ করবার জন্য স্টালিন এগুলো ঠিক করেছিলেন: পূর্ব্বদিকে রাশিয়া কর্ত্তৃক পোলাণ্ডের অর্দ্ধেকাংশ অধিকার; পোলাণ্ডকে জার্ম্মান

রাষ্ট্রের উত্তরে সাইলেসিয়া, পমেরিনিয়া, পূর্ব্ব প্রুশিয়ার কতকাংশ এবং যুদ্ধপূর্ব্ব জার্ম্মানীর এক পঞ্চমাংশ ছেড়ে দিয়ে ক্ষতি পূরণ করা; রাশিয়া কর্ত্তৃক পোলাণ্ড অধিকার; রাশিয়া কর্ত্তৃক প্রুশিয়ার বহুলাংশ অধিকার; কনিস্‌বার্গ শহরসহ পূর্ব্ব প্রুশিয়ার অনেকাংশ রাশিয়া কর্ত্তৃক অধিকার; জার্ম্মানীর ক্ষতিপূরণের বহুলাংশ রাশিয়াকে প্রদান; লালফৌজ কর্ত্তৃক যুদ্ধ-বিজয়ের ফলস্বরূপ জার্ম্মানীর অর্দ্ধেকাংশ অধিকার (এদিকে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক বাকী অংশ অধিকার); রুশ সৈন্য কর্ত্তৃক বার্লিন অধিকার—আত্মসম্মানের দিক থেকে এটা চাই।

রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল এ সবই তেহেরাণ ও ইয়ালটাতে স্টালিনকে দিয়েছিলেন।

কার্জ্জনলাইনের পূর্ব্বদিকের পোলাণ্ডের অংশ হাতছাড়া হওয়াতে পোলাণ্ডকে দুর্ব্বল করে ফেলেছিল। জার্ম্মান রাজত্বের শিল্পোন্নত অংশের বেশীর ভাগ পোলাণ্ডের অধিকারে আসাতে পোলাণ্ডকে কারিগরী, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল—যা পোলাণ্ড রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া সমাধান করতে পারতনা। এসব ব্যাপার, তাছাড়া জার্ম্মানীকে পরাজিত করবার জন্য পোলাণ্ডে লালফৌজের অবস্থানের ফলে স্টালিন পোলাণ্ডকে রাশিয়ার অধীন রাষ্ট্রের সামিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জার্ম্মানীর সঙ্গে পোলাণ্ডের বিস্তৃত যুক্তসীমান্ত রয়েছে। রাশিয়া কর্ত্তৃক জার্ম্মানী অধিকারের জন্য রাশিয়ার পোলাণ্ডকে হাতে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। স্টালিনের পোলনীতি হচ্ছে তাঁর জার্ম্মান-নীতিরই অংশবিশেষ। আবার তাঁর জার্ম্মাননীতি হচ্ছে ইউরোপীয় নীতিরই অংশ। যে জার্ম্মানীকে পদানত রাখতে পারে সে ইউরোপেও প্রাধান্য লাভ করতে পারবে। ইয়ালটা বৈঠকের ফলে এশিয়া মহাদেশে রাশিয়া সাখলিন্‌ দ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং

জাপানের উত্তরে অবস্থিত কুরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ও মাঞ্চুরিয়ার দুটি বন্দরের উপর কর্তৃত্ব পেয়েছিল। স্টালিন এ ব্যবস্থা লিখে-পড়ে রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিলের স্বাক্ষর নিয়ে একেবারে পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন। এটা হচ্ছে জাপানের সঙ্গে লড়াই করবার তাঁর প্রতিশ্রুতির পুরস্কার। এভাবেই স্টালিন গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা ইংলণ্ড কেউই শান্তিবৈঠকে এশিয়া কিম্বা ইউরোপে কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার পায়নি। এটা নালিশ নয়; অপর পক্ষে, এটা হচ্ছে বাস্তব সত্য। এটা অবশ্য মনে করা হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইংলণ্ড ইউরোপে তাদের নিজ নিজ পৃথক পৃথক প্রভাব অক্ষুন্ন রাখবে। রাশিয়া এবং আমেরিকা তাদের পৃথক পৃথক প্রভাব প্রতিপত্তি এশিয়াতে বজায় রাখবে। এশিয়াতে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য অটুট থাকবে।

এরকমের শান্তিই ত্রিশক্তি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা আক্রমণ মঞ্জুর করেছিলেন। তারপর তাঁরা নীতির কথা বলেছিলেন, পৃথক পৃথক এলাকাতে প্রাধান্যও মঞ্জুর করেছিলেন। তারপর এই নরম ভিত্তির উপর রাষ্ট্রসংঘের মত অসম্পুর্ণ সহযোগিতার বনিয়াদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট উইলসন্ আশা করেছিলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিস শন্তিবৈঠকে যে গলদ দেখা দিয়েছিল তা লীগ অব নেশনস্ শোধরাতে পারবে। প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট মিত্র শক্তি-পুঞ্জের ওপর ভরসা রেখেছিলেন। ১৯৪৪ সনে ডাম্বারটন্ ওক্স্এ আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া এবং চীনের প্রতিনিধিবর্গ—বেশীর ভাগ খসরা রচনা করেছিলেন। পরে তা স্যানফ্রান্সিসকো সনদ নামে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা একটা বিষয়ে একমত হতে পারেননি—সেটা হচ্ছে বাধা দান করবার ক্ষমতা (veto)।

সেজন্যই ইয়ালটাতে ত্রিশক্তির হাতে এর মীমাংসার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। রুজভেল্ট-চার্চ্চিল-স্টালিন রুলিংই এখন এই সনদের বড় জিনিষ। এই রুলিংয়ের ফলে সম্মিলিত শক্তিবৈঠককে যুদ্ধে বাধা দান এবং শান্তিরক্ষা করার উপায় হিসেবে ধরা যেতে পারেনা। যেখানে সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রয়েছে সেই সম্মিলিত শক্তি-বৈঠকের গণপরিষদ, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারেনা। কেবলমাত্র এগারজন সভ্যের নিরাপত্তা পরিষদই স্বস্তিপরিষদকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলতে পারে। ইয়ালটারুলিং এবং স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সনদ অনুসারে এই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স অথবা চীন—এই পঞ্চশক্তির যে কেউ আক্রমণকারী হলেও যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধা দান করতে পারে। এটাই পঞ্চশক্তি 'ভিটো' নামে অভিহিত হয়েছে।

তা'হলে স্বস্তিপরিষদ কি করে আক্রমণ এবং যুদ্ধ নিবারণ করতে পারে ?

স্টালিন ইয়ালটাতে 'ভিটো' দাবী করেছিলেন; সোভিয়েট রাজনীতিজ্ঞেরা এটাকে সমালোচকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট ছিলেন। রুজভেল্ট আশঙ্কা করেছিলেন যে 'ভিটো' ছাড়া স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সনদ যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সভাতে একদল রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী কর্ত্তৃক নাকচ হয়ে যেতে পারে। চীন খোলাখুলি ভাবে এটাতে বাধা দিয়েছিল। গ্রেটবৃটেন এর সম্বন্ধে ততটা গরজ দেখায়নি।

নিউজিলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটার ফ্রেজার ভিটোকে "সনদের একটা কলঙ্ক" বলে অভিহিত করেছেন। এটা হচ্ছে একটা মহা-অপবাদ। ভিটোর জোরে যে কোন রাষ্ট্র স্বস্তিপরিষদের সনদ পরিবর্ত্তনে বাধা দান করতে পারে।

যুদ্ধে এরকম শান্তির কাঠামোই রচনা করা হয়েছিল।

রাশিয়া মহাযুদ্ধে হেরে গিয়েছিল, কারণ তখন বিজেতা মিত্রশক্তি বলশেভিকদের ঘৃণা করত এবং সেজন্য তাকে শান্তিবৈঠক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৯ সনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জার্ম্মানী, বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং প্রধানত অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যকে বলিদান করে। এখন রাশিয়া কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই জয়লাভ করেনি প্রথম মহাযুদ্ধেও জয়লাভ করেছে, কারণ এখন রাশিয়া পূর্ব্বের অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া এবং তুরস্ক ছাড়াও জার্ম্মানীর উপর কর্ত্তৃত্ব করছে।

গ্রেটবৃটেন প্রথম মহাযুদ্ধ সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেই জয়লাভ করেছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মানী পরাজিত হয়েছিল; রাশিয়া বিপ্লবের চাপে পড়ে গিয়েছিল; তুরস্কের কিছুই ছিলনা; জাপান ও আমেরিকা তখনও তার প্রধান্যে বাধা দিতে আসেনি; গ্রেটবৃটেনের অর্থনৈতিক শক্তি অব্যাহত ছিল। গ্রেটবৃটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও জয়লাভ করেছিল কিন্তু তা রাজনৈতিক বিজয় নয়। রাশিয়া তাকে কোনঠেসা করে ফেলেছে; বৃটেনে অর্থনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে; তার শহর ব্যবসাবাণিজ্য দুই-ই নতুন করে গড়ে তুলতে হবে; সাম্রাজ্যও চলে যাচ্ছে। যুদ্ধ গ্রেট বৃটেনকে এত দুর্ব্বল করে ফেলেছে যে তার পক্ষে এখন রাশিয়া এবং আমেরিকার কাছ থেকে নিজের প্রধান্য রক্ষা করা অসম্ভব।

আমেরিকা দুই যুদ্ধেই জয়লাভ করেছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে জার্ম্মানীর নিকট পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমেরিকা প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর আমেরিকা বাড়ী ফিরে গিয়েছিল। কোন সুবিধা অথবা দায়িত্ব গ্রহণ করতে কিম্বা মাথা ঘামাতে অথবা আনন্দপূর্ণ জীবন নষ্ট হতে দিতে আমেরিকা চায়নি। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আক্রমণ

এবং জাপান কর্ত্তৃক চীনের পরাভবে বাধা দেবার জন্যই আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা বাড়ী ফিরে যেতে পারেনি।

তৃতীয় পর্ব্ব

দু'ধারা প্রত্যাখ্যান

দুধারী প্রত্যাখ্যান

ভারতে অবস্থানকালে আমি যখন ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করতাম, তাঁরা বলতেন : "কিন্তু আমেরিকানরা নিগ্রোদের সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করে থাকেন তার সম্বন্ধে কি বলেন ?"

উত্তরে আমি বলি, "আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্বেত-মার্কিণদের নিগ্রোবিরোধী বৈষম্যমূলক ব্যবহার দুটোকেই সমানভাবে নিন্দা করছি।"

আমি দুটো পথকেই গ্রহণের অযোগ্য বলে মনে করি।

পোলদেশীয় জমিদার বা তাঁবেদার উভয়কেই আমি ঘৃণা করি। জার্মানদের নৃশংসতা এবং জার্মান-বিরোধী নৃশংসতা—আমি দুয়েরই বিরোধী। যে কোন ধরনের নৃশংসতারই আমি বিরোধী।

এক ধরনের অন্যায়ের বিরোধী হয়ে সে ধরনের অন্যায়ের পথই গ্রহণ করা নীতি বিসর্জ্জন দেওয়ারই নামান্তর, আর এতে করে মহৎ কিছুর জন্য সংগ্রামেরও সমাধি ঘটে। যাকে আমরা অপেক্ষাকৃত কম অন্যায় বলি, তা সাংঘাতিক ধরনের অন্যায়ই হতে পারে। দুটো অন্যায় পথই পরিহার করে তৃতীয় পথে যাত্রা করা ভাল—যে পথে রয়েছে মানুষের প্রগতি।

'অপেক্ষাকৃত কম অন্যায়' নীতির হাতে পড়ে আমাদের সমস্ত সংস্কৃতিই বিপন্ন ; বাস্তব রাজনীতির ওপরও এ নীতির প্রভাব পড়েছে।

চার্চ্চিল রুশবিস্তারকে আক্রমণ করে ইঙ্গ-মার্কিণ মৈত্রীর পক্ষে ওকালতি করেন। স্টালিন চার্চ্চিলকে আক্রমণ করে কথা বলছেন।

কিন্তু নেহেরু সুসম্বদ্ধ একটি পৃথিবীর জন্য বক্তব্য প্রচার করছেন আর তাঁর কল্পনায় স্বাধীন ভারতের স্থান সেই বিশ্বজোড়া কাঠামোরই মধ্যে। চার্চ্চিল বা স্টালিন কাউকেই আমি চাইনা; আমি চাই নেহেরুকে।

এক ব্যক্তি রুমানিয়া, পোলাণ্ড ও ইরানে রুশ কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন। উত্তরে রুশ-সমর্থক বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় ব্রিটিশ-কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কি বলবেন ?"

রুশ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুয়েরই আমি বিরোধী। আর এক ধরনের কথা প্রায়ই শোনা যায়, "রাশিয়ার কিউরাইল বা পোর্টআর্থারের দাবীর মধ্যে অন্যায় কি আছে ? আমেরিকানরা কি অকিনাওয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করছে না ?"

দুটিই খারাপ ও নির্বোধের কাজ। দ্বীপপুঞ্জ, ঘাঁটি বা রাজ্যদখলের সমর্থনে বলবার কিছুই থাকতে পারেনা।

সাম্রাজ্যবাদ হয় অতি সুন্দর কিছু, না হয় কুৎসিত। ইংলণ্ডের পক্ষে এটা সুন্দর হলে, রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স বা হলাণ্ডের পক্ষেও এটা সুন্দরই হবে। এটা কুৎসিত হলে, আপনার নিজের দেশের পক্ষেও এটা একই রকম কুৎসিত। এক ধরনের দোষের জন্য অপ্রিয় দেশের নিন্দা ক'রে প্রিয় দেশের একই ধরনের দোষে প্রশংসা করলে গোঁড়ামি ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেওয়া হবে।

'নিউ ইয়র্ক পোষ্ট' কাগজে কণ্ডল ফস্ বার্লিনে পরিচিতা এক প্রৌঢ়া মহিলার মন্তব্য উল্লেখ করেন : "রুশরা মানুষের মত নয়। জীবন বা সম্পত্তির জন্য কোন দরদই তাঁদের নেই। তাঁরা রাস্তা থেকে আমাদের দেশবাসীদের ধরে নিয়ে যায়—তাঁদের সম্বন্ধে তারপর আর কোন কথাই শোনা যায়না। রুশদের দখল-করা অঞ্চলে আমার বোনের বাড়ীর উল্টো দিকে তাদের পুলিশরা একটি বন্দীশালা তৈরী

করেছে। পরিপাটী পোষাকপরা নরনারীকে দরজার ভেতর দিয়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে দেখতে পাই। রাত্রে তাঁদের আর্ত্তনাদ আমি শুনতে পেয়েছি। এই এসিয়াটিক অরাজকতা বন্ধ করার সময় এসেছে।"

ফসসাহেব নিজের কথা বলতে গিয়ে বললেন, "আমি বলি, দেখুন, এরূপ ঘটনা ঘটার মূলে রয়েছে তার আগের একটা ঘটনা।"

প্রত্যেক বীভৎস ব্যাপারই যদি আর একটা বীভৎস ব্যাপারের জনক হয়ে দাঁড়ায় তবে পৃথিবীর কি গতি হবে ?

১৯৪৫ সানের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে ব্যর্থ বৃহৎ ত্রিশক্তি সম্মেলনে পররাষ্ট্রসচিব বার্ণস্ রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় স্বাধীন নির্ব্বাচন দাবী করেছিলেন। এ ব্যাপারে কয়েকজন সমালোচক মন্তব্য করলেন, "যার নিজের দেশ দক্ষিণ কেরোলিনায়ই স্বাধীন নির্ব্বাচন বলে কিছু নেই, তিনি কেন বল্কানে স্বাধীন নির্ব্বাচন সম্বন্ধে জোর দিয়ে কথা বলতে আসেন ?" তাতে দক্ষিণ কেরোলিনাতে স্বাধীন নির্ব্বাচন দাবী করা আরও সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

স্টালিনকে ক্যাথলিকরা প্রতিদিনই আক্রমণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু মস্কো পোপ-রাজনীতির সমালোচনা করলেই তাঁরা আঘাত পান। চীনের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করায় কমিউনিষ্টরা চিয়াং কাইসেককে দোষারোপ করেন। কিন্তু রাশিয়ায় সোভিয়েট সরকার যে এ স্বাধীনতাকেই সর্ব্বতোভবে খর্ব্ব করেন তাতে কমিউনিষ্টদের কিছু যায় আসে না।

সদগুণে অবিশ্বাস ও নীতিবিসর্জ্জনই আমাদের সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলছে। নিখুঁত গভর্ণমেন্ট বলে আজ পর্য্যন্ত কিছু দেখা যায়নি। আমার দেশ স্বদেশ হলেও ভ্রান্ত হতে পারে। আমার গভর্ণমেন্ট একনায়কত্বমূলক হলে আমি তা ধ্বংস করতে চেষ্টা করব। অন্য কোন দেশ কোন পাপ কাজ করলে আমার মনে যতটা ঘৃণাবোধ জাগে, আমার নিজের দেশ সে ধরনের পাপকাজ করলে ঠিক

ততটুকু ঘৃণাবোধই জাগে। চিন্তা আর বিচার নিরপেক্ষভাবে করলেই দুধারা প্রত্যাখ্যানের নীতি গ্রহণ করা চলে।

স্বদেশের সম্বন্ধে অনেকের একটা ধর্ম্মভাব আছে। অনেকের ধর্ম্মভাব আছে কোন বিদেশ সম্বন্ধে। পৃথিবীর ঘটনাবলী বিচারের বেলা ও ধরনের মনোভাবের প্রভাবে পড়ে গেলে তাঁরা সত্যকেই বিসর্জ্জন দেবেন। তাঁরা নিজেদেরই বিপথগামী করেন। জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়েই চিন্তা বা বিচার করে থাকেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা আজকাল প্রায় একটা দেখাই যায়না। এর কারণ, মানুষ আজ অবস্থাবিশেষের কোন স্বচ্ছ চিত্র গ্রহণের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়না, চলিত হয় ধর্ম্মভাব, জাতীয়তাবাদী মনোভাব, গোষ্ঠীভাব আর দলীয় কুসংস্কার দ্বারা। সময় সময় বিশেষত দৃষ্টি যখন আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন কত ভাবেই না তারা ভ্রান্ত হয়ে পড়ে! তা বুঝে নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে কঠোর ও নির্ম্মম হওয়াই আমি স্থির করেছি। বিশ্লেষণকারী ও পর্য্যবেক্ষকের কোন কিছুরই প্রতি অন্ধ ভক্তি থাকা চলতে পারেনা। ও ধরনের কোন অন্ধ ভক্তি থাকার অর্থ নিজেরই ক্ষতি করা।

মনোভাব ইচ্ছাকে কাজের পথে এগিয়ে নেয়। পরিব্যাপ্ত অন্যায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার তীব্র ইচ্ছাও আমার মনে জেগে ওঠে। দুধারা প্রত্যাখ্যান কাজের উত্তম জাগিয়ে তোলে। এর কারণ 'দুধারা প্রত্যাখ্যান'ই দেখিয়েছে বর্ত্তমানের গুরুতর সঙ্কট থেকে মানবজাতিকে উর্দ্ধে তুলে ধরবার প্রয়োজন আজ কত জরুরী। অবস্থার সঠিক হিসাব-নিকাশের ফলে মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়, সে নৈরাশ্য সৃজনশীল। এর ফলে মানুষ সংগ্রাম-চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার মধ্যে জাগে কাজ করবার প্রেরণা।

আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে ১৯৩০ সনের পরবর্ত্তী কালের আশাবাদের ফলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। অবস্থা যত খারাপ বলে

চিত্রিত হচ্ছে আসলে তত খারাপ নয়, সবকিছু আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে, হিটলার সংযত হয়ে ভদ্রভাবে চলবেন জনসাধারণ এ অলীক ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। নৈরাশ্যবাদ, এমনকি ভয়বিহ্বলতা জেগে উঠলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিবারিত হত। যে সব বিপদ চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে আছে, দুধারা প্রত্যাখ্যানের মোহমুক্ত চিন্তাধারাই এখনো আমাদের চোখকে সেগুলির দিকে ফিরিয়ে নিতে পারে।...

অধিকাংশ ব্যক্তিই দুধারা প্রত্যাখ্যানের নীতি গ্রহণ করতে ভয় পান—হয়তো এ ভয় যে তাঁরা করেন সে বিষয়ে তাঁরা সচেতনই নন। হয়তো তাতে তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটিই সরে যাবে, তাঁদের দাঁড়াতে হবে শুধু নীতিরই ওপর। আর এমন ক'জনকে পাওয়া যাবে যাঁরা নীতির ওপর দাঁড়ান আরামজনক বলে মনে করেন?

কিছুসংখ্যক আমেরিকান রাশিয়াকে আদর্শ বলে দেখান—এর কারণ, তাঁদের একটা স্বর্গস্থান চাই-ই। মার্কিন ব্যবস্থায় অন্যায়ের অস্তিত্বের জন্য তাঁরা সে ব্যবস্থার বিরোধী। সে অনুসারে একটা বিকল্প তাঁরা আঁকড়ে ধরেন—সে বিকল্প রাশিয়া। রাশিয়াও অন্যায় করছে, একথা তাঁদের বলা হলে তাঁরা অসুখী বোধ করবেন। এতে নৈতিক অবলম্বনই তাঁরা হারিয়ে ফেলবেন।

যার সম্বন্ধে কিছু জানা নেই এমন এক সুদূরের স্বর্গকে মেনে নেওয়া, বা, অন্য কিছুর সঙ্গে পরিচয় নেই বলে হাতের কাছের ব্যবস্থাকেই মেনে নেওয়া এ দুইই দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। বলশেভিক-বাদের মধ্যে যে অন্যায় রয়েছে, আমি তাঁর বিরোধী, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অন্যায়েরও আমি বিরোধী। এ দুই-এর চেয়েও ভাল এমন কিছুর সন্ধান আমি করছি।

কাজেকাজেই 'দুধারা প্রত্যাখ্যান' নেতিবাচক নয়—একথা স্পষ্ট। অতীত অবস্থা থেকে সে পরিবর্ত্তনকেই ওপরে তুলে ধরে—এহচ্ছে এমন

একটা প্রত্যক্ষ মতবাদ। উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে প্রগতিই এ মতবাদের কাম্য।

আজানা পৃথিবীর অভিযাত্রী যাঁরা, তাঁরা হয়তো নূতন একটা মহাদেশ আবিষ্কার করতে পারেন, নূতন একটা পৃথিবীর সন্ধানও হয়তো তাঁরা দিতে পারেন। নূতন একটা পৃথিবীর প্রয়োজন আছে। সে নূতন পৃথিবী কোথায়? উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কোন পথে? দুটোর একটার সন্ধানও সহজে পাওয়া সম্ভব নয়। গতানুগতিক পথে এর সন্ধান মিলবেনা, এর সন্ধান মিলবে পরিবর্ত্তনের পথে। এমন প্রগতিবাদীরাই এর সন্ধান দিতে পারেন যাঁদের কার্য্যতালিকা আছে, এমন কালাপাহাড়রাই এর সন্ধান দিতে পারেন যাঁদের ভাব আছে। যাঁরা সরল সঙ্কীর্ণ পথেই চলেন—দুটো মতবাদই প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে দুপক্ষের গুলির ঝুঁকিই যাঁরা নেন, এপথের সন্ধান দিতে পারেন এমন সব সাহসী লোকেরাই।

সঙ্কট

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা বিদ্রোহী সত্তা রয়েছে। সে বিদ্রোহ এক রাত্রি, কি একদিন,—এক বছর কি দশ বছর,—কি সারা জীবনও স্থায়ী হতে পারে। তা যৌবনেই শেষ হতে পারে, বার্দ্ধক্যে আরম্ভ হতে পারে। তা কাজের একঘেয়েমীর বিরুদ্ধেও হতে পারে, কি বর্ব্বর জীবনধারণের ক্লান্তি, নয়তো জীবনের মিথ্যার বিরুদ্ধেও হতে পারে। সে বিদ্রোহ জ্ঞান অথবা দারিদ্র্য, শাসক অথবা সম্পদের বিরুদ্ধেই হোক আর যৌন বাধানিষেধ অথবা পরিবার অথবা মাতাপিতার বিরুদ্ধেই হোক্—মোট কথা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সে বিদ্রোহী সত্তা রয়েছে।

বৈষম্যপুষ্ট লক্ষপতি তাঁর প্রমোদ-তরীতে বসে' বসে' সাম্যবাদী স্বর্গরাজ্যের ছবি আঁকেন। নিঃসম্বল নিগ্রো সমস্ত আশা হারিয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আনন্দের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়; আশা ফিরে পেলে সে আফ্রিকায় এক স্বতন্ত্র বাসভূমি দাবী করে, আর নয়তো স্বর্গ হাতড়ায় রাশিয়ার মধ্যে। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সনের মধ্যে যে-সমস্ত ইংরেজ কবি সাম্যবাদ নিয়ে বড় বেশী মাতামাতি করেছিলেন তাঁরাই এখন খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর এক দল আবার জীবনকে ফাঁকি দিয়ে যোগ এবং প্রাচ্য মরমীবাদের মধ্যে আত্মগোপন করতে চান। প্রতিভাবান এবং নাৎসীবিরোধী সাম্যবাদী জার্ম্মান কবি আর্ণস্ট্ টলার ১৯৩৯ সনে আত্মহত্যা করেন। রাশিয়া তাঁকে হতাশ করেছিল; ইতিমধ্যে স্পেনেরও পতন ঘটে। প্রতিভাবান লেখক হেউড ব্রুয়ঁ সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন, পরে তা বর্জ্জন করে' তিনি ক্যাথলিক মতবাদকে গ্রহণ করলেন। সাম্যবাদী পত্রিকা

ডেলী ওয়ার্কার-এর পরিচালনাকারী সম্পাদক লুই বুদেনৎসও পরে ক্যাথলিক হয়ে যান। জার্ম্মানবাহিনীর স্নায়ুযুদ্ধবিভাগীয় অফিসার সল্ কে প্যাডোভার ১৯৪৫ সনে হেরাল্ড্ ট্রিবিউন পত্রিকায় লিখ্‌লেন যে, হিটলারের হাতে ক্ষমতা আসবার পর "কম্যুনিষ্ট দলের এক বিরাট অংশ, সম্ভবতঃ এক তৃতীয়াংশ লোকই, সক্রিয় নাৎসীতে পরিণত হয়েছিল।" ফ্রান্সের ফ্যাসিষ্ট নেতা ডরিয়ট্ও এককালে সাম্যবাদী আন্তর্জ্জাতিক-এ উঁচু পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাৎসী-বন্ধু লাভালও আগে ছিলেন কমিউনিষ্ট। যে বেতার-ভাষ্যকার ইটালীতে মুসোলিনীর হয়ে কথা কয়, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে সেই আবার রাশিয়ার গুণকীর্ত্তন করে।

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যত কিছু প্রশ্ন বর্ত্তমান, সাম্যবাদ, ক্যাথলিক মতবাদ এবং কিছু পরিমাণে ফ্যাসিবাদের মধ্যেও সে সম্পর্কে আলাদা আলাদা সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। মানসিক ঝোঁকের নির্দ্দেশে এর মধ্যে যে-কোনও একটি সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করা হোক্ না কেন, পরে তা সন্তোষজনক বলে মনে না হতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্যতর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে আট্‌কায় না।

ধনী, নিগ্রো, ইহুদী এবং ফ্যাসিষ্টরাও কমিউনিষ্ট হয়ে যায়; কমিউনিষ্টরাও আত্মহত্যা করে, নয়তো ক্যাথলিক কিংবা নাৎসী হয়ে ওঠে। এ সমস্তই হলো জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। জীবনের আপাতরূপকে তারা বর্জ্জন করে। যারা সরে যায় তাদেরই বলা হয় বিদ্রোহী।

হিট্‌লারপূর্ব্ব জার্ম্মানীতে তরুণ ইহুদীরা ইহুদীরাষ্ট্রের দাবী তুলেছিলেন, তারপর তাঁরা কমিউনিষ্ট হয়ে যান। মাঝে মাঝে তাঁরা পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্রদাবীর ক্ষেত্রেও ফিরে এসেছেন। তখনকার জার্ম্মানীকেই তাঁরা বর্জ্জন করেছিলেন।

আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যতো লোক আজ কমিউনিষ্ট

দলভুক্ত, তার থেকে কমিউনিস্ট দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন এমন লোকের সংখ্যাই সেখানে বেশী। বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে' তাঁরা তা পাননি, অন্যতর ব্যবস্থার সন্ধানে তাঁরা দল ত্যাগ করেছেন। অধিকাংশ লোকের পক্ষে একটা আত্মিক আশ্রয়ের প্রয়োজন। তাঁরা আশ্রয় চান। বর্ত্তমান পৃথিবীকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ না করতে পারলে তাঁরা অন্যতর পৃথিবীর অনুসন্ধান করেন।

বর্ত্তমান যুগ আত্মিক অস্থৈর্য্যের যুগ। তাতে একনায়কত্বের পথই পরিষ্কার হয়।

কমিউনিষ্টরা স্টালিন ও রাশিয়ার কমিউনিষ্ট-সরকারের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। তাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত (মার্ক্স) এবং ধর্ম্ম (পার্টি) রয়েছে। পৃথিবীতে একদিন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, এই বিশ্বাসেই তারা লালিত। সাম্যবাদ এবং ক্যাথলিক মতবাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ; তা সত্ত্বেও, মানসিক দিক থেকে কোনও সাম্যবাদী এক পা মাত্র বাড়িয়ে দিয়ে অনায়াসেই ঐ রোমকে ধর্ম্মমতের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।

এ যুগের রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদীরাই হলেন সর্ব্বাপেক্ষা তেজীয়ান বিদ্রোহী। সাম্যবাদীরা ধনতান্ত্রিক পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করে' রাশিয়াকে মেনে নিয়েছেন। যাকে তাঁরা বর্জ্জন করলেন রাশিয়াকে তাঁরা তার শত্রু বলে গণ্য করেন। ধনতন্ত্রবাদের সংস্কার সাধনে তাঁদের আস্থা নেই, তাঁরা বিপ্লববাদী। (আমি হচ্ছি একজন অস্থির বিবর্ত্তনবাদী)। তাঁরা আমূল পরিবর্ত্তন কামনা করেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, রাশিয়াই হলো সেই পরিবর্ত্তনসাধনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এজগতে তাঁরা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেন। কেননা রাশিয়াই সেই পরিবর্ত্তন আনবে। কমিউনিষ্ট দল সংস্কারপন্থী নয়, ক্ষমতা হস্তগত করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য।

শ্রেণী, দল ও ব্যষ্টির হাত থেকে রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই হলো সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মূল কথা। রাষ্ট্রই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়ায়,—এত বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে, ব্যষ্টির তখন আর বিদ্রোহ করবার ক্ষমতা থাকে না। বিদ্রোহের পরিণতি হলো বিদ্রোহেরই চির-অবসান।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নরনারীরা নানা বাস্তব ও বস্তুতান্ত্রিক কারণে এবং প্রথা ও প্রতীতি অনুযায়ী কমিউনিষ্ট দলে যোগদান করে। সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরের কমিউনিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশই হলো আদর্শবাদী বিদ্রোহী। পৃথিবীকে তারা সুস্থ করে তুলতে চায়। কমিউনিস্ট দল বেগবান, তার উদ্যম আছে। কমিউনিষ্ট দল ত্যাগ এবং আনুগত্য চায়, গোপনীয়তা এবং শৃঙ্খলা। একদল মানুষের কাছে এ-সবের আকর্ষণ আছে। পার্টির মধ্যে গিয়ে কম্যুনিষ্টরা সঙ্গী এবং কাজ খুঁজে পায়। বিবেকবোধ বলে যদি তাদের কিছু থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা যদি হলিউডের উচ্চ বেতনভোগী লেখক কিংবা অনায়াসলব্ধ প্রভূত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন, তাহলে পার্টিতে গিয়ে তাঁদের সেই পীড়াদায়ক বিবেকবোধের উপরেও একটা প্রলেপ পড়ে। নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থতা, কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা অথবা সমাজব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃও কেউ কেউ পার্টিতে যোগদান করেন। পার্টির সদস্য হ'লে পর সঙ্গী পাওয়া যায়, নানা মজলিশে যাতায়াত করা যায়, কাজ করবার এবং উৎসাহকে কাজে লাগাবার সুবিধে হয়।

ফ্যাসিষ্টদের তুলনায় অধিকাংশ কমিউনিষ্টই পরিচ্ছন্ন এবং সুরুচিসম্পন্ন। ফ্যাসিবাদ অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদেরই আকর্ষণ করতো, এখনও করে। সমাজ থেকে যারা বিতাড়িত এবং সমাজের প্রতি যারা বিতৃষ্ণ, হিংসার জন্যেই যারা হিংসাকে ভালবাসে, দুর্জ্জন ও উঁচু মহলের ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য যে-সমস্ত

ক্ষমতালিপ্সু নেতা হাত বাড়িয়ে আছে, যারা ভাবতাড়িত, যাদের মধ্যে ঘৃণা রয়েছে, বিবেকবোধ অথবা দয়ামায়ার বালাই যাদের নেই, হত্যালীলার মধ্য দিয়ে যারা বিদ্রোহের উদ্‌যাপন করে এবং মৃত্যুর সাথে যারা ছিনিমিনি খেলতে ভালোবাসে—ফ্যাসিবাদের প্রতি তারাই আকৃষ্ট হয়।

হতাশা থেকেই ভাবাবেগের সৃষ্টি, আর এই শিকলছেঁড়া ভাবাবেগের কোনও রীতিব বালাই নেই। যুক্তিহীন প্রবণতা শান্তিকেই বিনাশ করে। স্নায়ু আর শোণিতের চাপ মস্তিষ্ককে অকর্ম্মণ্য করে দেয়। ভাবাবেগের তলায় বুদ্ধিবৃত্তি ঢাকা পড়ে' যায়, চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে বিশ্বাস। মনে হয়, পথ যাই হোক না কেন, লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেই হলো। নীতিকে আঁকড়ে থাক্‌তে হলে সুবিধা বুঝে পথ পরিবর্ত্তন করা বা ডিগ্‌বাজী খাওয়া চলেনা। তাই বিরক্তিভরে তখন নীতিকে বলি দেওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যেই একনায়কত্বেব ধ্বংস-বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার প্রাবল্য এক বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছে।

সম্প্রতি এরই একটি ছোটখাট নিদর্শন চোখে পড়লো। ১৯৪৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জনৈক বৃটিশ প্রকাশক আমার 'সাম্রাজ্য' নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির নানাস্থানে তিনি অদলবদল করেছেন। প্রকাশকদের, বিশেষতঃ বৃটিশ প্রকাশকদের, খুবই খ্যাতি রয়েছে যে, এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট বিবেকবোধসম্পন্ন। কোনও পরিবর্ত্তন করতে হলে লেখককে জানিয়ে তাঁরা অনুমতি চেয়ে নেন। অথচ আমাকে জানানো হয়নি।.... একস্থানে আমি লিখেছিলাম যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোক হয়তো গান্ধীকে নাও জান্‌তে পারে, "কিন্তু এরি উপর নির্ভর করে' ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের যোগ্য কিনা সে সম্পর্কে

কোনও সিদ্ধান্ত করা চলেনা। সোভিয়েট সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, শতকরা একজন রাশিয়ানও তখন বোধ হয় লেনিন "অথবা ট্রট্স্কির নাম জানতোনা।" বৃটিশ সংস্করণে "অথবা ট্রট্স্কি" কথাটি বাদ দেওয়া হয়। অন্য একস্থানে আমি বলেছিলাম, "আমার দৃষ্টিকোণ জাতীয়তাবাদী নয়। আমি স্পেনের সমর্থক ছিলামনা। যদিও ফ্র্যাঙ্কো হচ্ছেন একজন স্প্যানিয়ার্ড তবুও আমি ফ্র্যাঙ্কোবিরোধী ও কমিউনিষ্ট-অনুগতদের সমর্থক ছিলাম। আমি রুশবিরোধী নই, আমি স্টালিনবিরোধী। বৃটেনকে আমি নিন্দা করিনা, আমি তার ভারতকে পরাধীন করে রাখবার নীতিরই নিন্দা করি।" "আমি রুশবিরোধী নই, আমি স্টালিনবিরোধী" কথা কয়টিকে বর্জ্জন করা হয়। আর এক জায়গায় আমি লিখেছিলাম, "....ভারতবর্ষে এসে পৌছুবার পর থেকে প্রায় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের কাছেই শুনেছি যে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। জার্ম্মানী এবং রাশিয়াতেও আমি বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছি। এ দুটি দেশে জেল-ফেরৎ লোকদের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয়না। আসলে তারা কারারুদ্ধই রয়েছে।..." এর পরিবর্ত্তনসাধন করে লেখা হলো; "জার্ম্মানীতে আমি বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছি। সে দেশে...।" সর্ব্বশেষে আমি বলেছিলাম, "চার্চ্চিলের 'নিজের অধিকার বজায় রাখো' নীতি, স্টালিনের প্রাক্-১৯১৭ রুশ-সীমান্ত এবং প্রাক্-১৯১৭ দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরুদ্ধারসাধনের আকাঙ্ক্ষা এবং ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি আমেরিকার সমর্থন এই কারণেই এক শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুল্তে পারেনা।" স্টালিন এবং রাশিয়া-সংক্রান্ত কথাগুলি বৃটিশ সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি।

বেশ বোঝা যায় যে, কোনও কমিউনিষ্ট, অথবা কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিই এই সমস্ত কাটাকুটি করেছেন। বৃটিশ অথবা মার্কিণ নীতিকে সমালোচনা করার মধ্যে তিনি দোষের

কিছু দেখতে পাননা; তবে স্টালিন অথবা তাঁর নীতিকে সমালোচনা করবারও উপায় নেই।

আমাদের সভ্যতার একটা নূতন, ক্রমবর্দ্ধমান এবং আতঙ্ককর দিকের এ একটা ছোটখাট নিদর্শন। সত্যকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করবার যে একনায়কীয় কৌশল মস্কো-বিচারের সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল—এটা হলো তারই একটা অংশ। সোভিয়েট পুস্তক-পুস্তিকা, বাইরের কমিউনিষ্ট-সাময়িকপত্রাদি, এবং কমিউনিষ্টদের সর্ব্বপ্রকার যুক্তিতর্কের মধ্যেই এই কৌশল প্রকট হয়ে উঠেছে। যে-কথায় অনিষ্টের কোনও আশঙ্কা নেই, কোনও কমিউনিষ্ট যদি শুধু অপ্রিয়তার দোষেই জনৈক গ্রন্থকারের তেমন কয়েকটি কথা চেপে দিতে পারেন, তা হলে সত্যকেই বা তিনি সম্মান করতে যাবেন কেন? তিনি নিজে যা বল্‌ছেন বা লিখছেন সে সম্পর্কেই বা কেমন করে তাঁর নিষ্ঠা বা বিবেকবোধ থাক্‌বে? অপরাপর একনায়কত্ববাদীদের মত কমিউনিষ্টরাও সত্যনিষ্ঠ নয়।

১৯৪৫ সালের ২২শে জুন তারিখে মিসেস্ ইলিনর রুজভেল্ট তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "আমেরিকার কমিউনিষ্টদের সাধু সদস্যপদের জন্য তাদের সম্পর্কে আমার আপত্তি নয়; এমন কি তাদের প্রচারিত উদ্দেশ্য সম্পর্কেও না। বছরের পর বছর এদেশে তারা মিথ্যাচরণের কৌশল শিখিয়ে এসেছে। তারা শিখিয়ে এসেছে যে, দলের প্রতি আনুগত্য এবং দলীয় নেতাদের নির্দ্দেশ মেনে চলাই হলো সব থেকে বড় কথা। অথচ এসব নেতার স্বার্থ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ এক নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্টদের প্রতারণা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে, সেইজন্যই তাদের আমি বিশ্বাস করবনা।...."

তাদের উপর যদি বিশ্বাস না থাকে তা হলে তাদের সঙ্গে কাজও করা যায়না।

সত্যকে মিথ্যায় দাঁড় করানোই কমিউনিষ্টদের দার্শনিকতা। সত্যনিষ্ঠার আদর্শকে তারা উপহাস করে। কথিত বা লিখিত শব্দ তাদের কাছে উদ্দেশ্যসিদ্ধিরই হাতিয়ার মাত্র, এবং সেইভাবেই তারা তার প্রয়োগ করে। সচরাচর সে উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতালাভ। ছোট মিথ্যা এবং বড় মিথ্যা—এ দুয়েতেই তারা বিশ্বাসী, চরিত্রবিনাশে এবং কুৎসা রটনায় আস্থাবান।

এ যুগ কুৎসারটনার যুগ। সৎযুক্তির-অভাবে কমিউনিষ্টরা শেষে কাদা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। কুৎসারটনা করাটা দেউলিয়া মনেরই পরিচয়। "প্রতিক্রিয়াশীল", "ট্রট্স্কীপন্থী", "ফ্যাসিষ্ট"। অপ্রমাণ সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার পক্ষে কুৎসারটনাটা হলো ভাবাবেগের সোজা পথ।

কথার বিকৃতিসাধন এবং অপপ্রয়োগ এ যুগের বহুসংক্রমিত ব্যাধিসমূহে অন্যতম। পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে জোসেফ গোয়েবলস্ বলতেন "ধনীপরিচালিত-পুঁজিবাদী ইহুদীপন্থী গণতন্ত্র।" রাজনৈতিক গালিগালাজের এক চমৎকার সংমিশ্রণ। কমিউনিষ্টরাও জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের একবছর সোস্যাল ফ্যাসিষ্ট বলে গাল দিয়ে পরের বছরই আবার তাদের যুক্ত-ফ্রন্টে, যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। যা-কিছুর সঙ্গেই কমিউনিষ্টদের সম্পর্ক রয়েছে কমিউনিষ্টরা তাকে গণতান্ত্রিক বলে এবং যা-কিছু গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক, সুতরাং কমিউনিষ্ট-বিরোধী, তাকেই তারা প্রতিক্রিয়াশীল বলে' অভিহিত করে। টোরীরাও তা-ই করে। তাদের মতে, যাদের দেখতে নারি তারাই কমিউনিষ্ট।

বিপদ বুঝে আমরা যদি সতর্ক না হই তা হলে এই কুটিল শব্দাবলীই গণতন্ত্রের বেড়ি হয়ে দাঁড়াবে। শব্দ হলো চিন্তার বাহন; ন্যায় অথবা অন্যায়ের পথে সে-চিন্তা পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে ফেরে।

কমিউনিষ্টদের মধ্যে সততা অনুপস্থিত—সত্যের প্রতি তাদের

নিষ্ঠা নেই; তাদের গণতন্ত্রবিরোধিতার এই হলো মূল কারণ। কথা এবং চিন্তা যেখানে শুধুমাত্র অভীষ্টসাধনের কার্য্যেই নিযুক্ত, স্বাধীনতাই বা কেমন করে থাকে, যদি তাকে, বিশেষ কোনও রাজনৈতিক ছাঁচেই ঢালাই করে নিতে হয়?

লেখক, বক্তা এবং শিল্পীদের কাছে স্বাধীনতার মূল্য হওয়া উচিত প্রাণধারণের বায়ুর মতো। অথচ তাঁরাও কমিউমিষ্টদের কাছ থেকে নির্দ্দেশ গ্রহণ করেন। কমিউনিষ্ট দল, ট্রেড ইউনিয়ান বা ট্রেড ইউনিয়ানসমূহের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং নাগরিকদের যে-সমস্ত সভাসমিতি বা পত্রিকায় কমিউনিষ্টদের হাত রয়েছে রাশিয়া সম্পর্কে কোনও দিনই তারা সত্যকথা উচ্চারণ করবেনা, কোনও দিনই রাশিয়ার সমালোচনা করবেনা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি সকলকেই তারা সোৎসাহে নিন্দা করে, রাশিয়াকে তারা ভুলেও সমালোচনা করবেনা। এটা একেবারে সাদামাঠা মিথ্যাচরণ। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বহু লোকই কমিউনিষ্ট-প্রভাবিত দলগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাদের উদ্দেশ্য নানাপ্রকার। কেউ বা বড় কোনও গোষ্ঠির সমর্থন চান, অন্য পথে যা পাবার সম্ভাবনা নেই। কেউ কেউ বা কেষ্টবিষ্টুদের আওতায় এসে আনন্দলাভ করেন। এঁদের দলভুক্ত হবার একমাত্র কারণ এই যে, অন্যান্য বড় বড় ব্যক্তিরাও দলভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের বলা হয়েছে যে, কোনও একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সমর্থন না করলে তাঁদের জীবন ব্যর্থ; সে জীবনের কানা কড়িও দাম নেই। আবার কেউ কেউ বা দৌড়ঝাঁপ, হুড়োহুড়ি, কর্ম্মব্যস্ততা এবং ভোজসভা, আর্জ্জিপেশ, সভাসম্মেলন ইত্যাদি ব্যাপারে মত্ত হয়ে উঠতে ভালোবাসেন।

আমাদের চারিদিকেই নানাপ্রকার খারাপ ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ কেউই প্রায় তার অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেন না, সম্ভবতঃ এইটেই

হলো মূল সমস্যা। যে ব্যবস্থায় কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতা আগলে রেখে তাদের সমৃদ্ধিসাধন সম্ভব হয়েছে সেই ব্যবস্থাই আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। তার কারণ, সে ব্যবস্থা যথেষ্ট-স্বাধীনতা এবং যথেষ্ট-সমৃদ্ধি দিতে পারেনি। অথচ বর্ত্তমান ব্যবস্থার যাঁরা সমর্থক, এখনো তাঁরা সতর্ক হয়ে সেই স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দিতেও এগিয়ে আসছেন না। ওদিকে সে ব্যবস্থার যাঁরা বিরোধী—আরও-স্বাধীনতা এবং আরও-সমৃদ্ধির মিথ্যা আশায় ভুলিয়ে সমস্তটুকু স্বাধীনতাকেই তাঁরা লুপ্ত করবার আয়োজন করছেন।

গ্রেটবৃটেনের কমিউনিষ্ট দল খুবই দুর্ব্বল; এর কারণ সেখানে একটি শক্তিশালী শ্রমিক দল রয়েছে। যুদ্ধপূর্ব্ব কালে অষ্ট্রিয়ার কমিউনিষ্টরাও সংখ্যায় মাত্র কয়েকজনই ছিল; সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের বলিষ্ঠ মতবাদ এবং রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির দরুন কমিউনিষ্টরা সেখানে পাত্তা পেতনা। স্পেনেও ১৯৩৬ সনের পূর্ব্বে সোস্যালিষ্ট এবং সিন্‌ডিক্যালিষ্টরাই ছিল কর্ম্মতৎপর এবং বিদ্রোহী; সে-সময় কমিউনিষ্টরা সেখানে কিছুমাত্রও সমর্থন লাভ করেনি। ভারতবর্ষের কমিউনিষ্টদের পেছনেও বেশী লোকের সমর্থন নেই, কারণ গান্ধী-নেহেরুর কংগ্রেস দলই হলো সেখানকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিদ্রোহের প্রধান ধারক।

বৃটেনের শ্রমিক দল, এবং অষ্ট্রিয়া ও স্পেনের সমাজতন্ত্রীরা একই সঙ্গে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও একনায়কত্ববাদী কমিউনিষ্টদের বিরোধিতা করে এসেছে। এই দ্বৈত-বিরোধিতা যেখানেই সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে উঠবে, মিথ্যাশ্রয়ী ভূয়া বিপ্লবীদের সেখানে জয়লাভের সম্ভাবনা নেই।

গণতন্ত্র যতই ত্রুটিশূন্য হয়ে উঠবে—তার উপরে আক্রমণও ততই মন্দবল হয়ে আসবে। গণতন্ত্রের উন্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। গণতন্ত্র

নিজেই যদি আজ নিষ্ক্রিয় হয়ে হাল ছেড়ে দেয়, তবে অন্য কেউ তার আসন দখল করতে ইচ্ছুক হ'লে দোষারোপ করবার উপায় নেই।

গণতন্ত্রের পক্ষে আজ সক্রিয় সমর্থক দলের প্রয়োজন, নতুবা তার মৃত্যু অবধারিত।

গণতন্ত্র আজ শত্রুদলের সম্মুখীন—গণতন্ত্রকে তারা উচ্ছেদ করতে চায়। কমিউনিস্ট অথবা ফ্যাসিষ্ট—কেউই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। অথচ কমিউনিষ্টরা সর্ব্বদাই, এবং হালে ফ্যাসিষ্টরাও—কবর থেকে যারা মুসোলিনীর শবদেহ অপসরণ করেছিল—নিজেদেরকে গণতন্ত্রী বলে জাহির করছে। ফ্যাসিষ্টরা সরাসরিভাবে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ চালায়, কমিউনিষ্টরা গোপনে গণতন্ত্রী-শিবিরে প্রবেশ করে' সেখানে ভাঙন ধরিয়ে দেয়। এতে গণতন্ত্রবাদীদের শক্তিহ্রাস ঘটে, ফ্যাসিবাদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কমিউনিষ্টরাই ফ্যাসিবাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। জার্ম্মানীর কমিউনিষ্ট দলের কাছে হিটলার অনেকাংশেই ঋণী। কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপের ফলে আমেরিকার ট্রেড-ইউনিয়ান আন্দোলনেরও সঙ্ঘবদ্ধতা এবং সামর্থ্য নষ্ট হচ্ছে।

গণতন্ত্র যাতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে মহান আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে থাকতে পারে, যাতে সে সর্ব্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখবিধান করতে সক্ষম হয়, সেজন্য সাহস, সামর্থ্য এবং বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। নিজের মধ্যে সে আজ সেই সাহস, সামর্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে খুঁজে পাবে কিনা গণতন্ত্রের কাছে তা-ই হলো মহাজিজ্ঞাসা। বৈষয়িক দুঃখদারিদ্র্য, রাষ্ট্রনৈতিক নির্য্যাতন এবং জাতিগত বৈষম্য সর্ব্বত্রই গণতন্ত্রের গতিরোধ করে, এর মধ্যেও গণতন্ত্রের বিপদ নিহিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর

ইতিপূর্ব্বেই এ-সমস্ত আমাদের দেখা হয়ে গেছে। দেখেছি, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট দেশের উপরে প্রভুত্ববিস্তার করেছে; পৃথিবীকে কি ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেয়া যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তাই নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেছে; আন্তর্জ্জাতিকতার মোড়কে প্রভুত্বলিপ্সু জাতীয়তাবাদকে ঢেকে রাখা হয়েছে, আত্মরক্ষার অজুহাতে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন। বৈষয়িক ও সাম্রাজ্যবাদী সমর, এবং বিদ্রোহী উপনিবেশিক জনসাধারণের উপরে যুদ্ধ-ঘোষণা—এ সমস্তই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যুদ্ধকালে যে কোটি কোটি লোক নিপীড়িত হয়েছিল, দেখেছি যে শান্তিকালেও তাদের উপরে প্রতিশোধাত্মকভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখেছি, ন্যায়বিচার এবং নরনারীকে বলি দিয়ে ক্ষমতালাভের চেষ্টা করা হয়; সরকারের অসহায়তা, সরকারের সামনে জনসাধারণেরও অসহায়ত্ব আমরা দেখেছি। সত্য প্রকট হয়ে পড়লে নেতৃত্বের অবসান ঘটতে পারে—এই আশঙ্কায় নেতারা সত্যগোপন করেছেন। সরকারের অসুস্থ এবং কৃত্রিম আশাবাদ, ভাগ্যনির্ভরতা ও উদ্দেশ্যহীনতা এবং সেইসঙ্গে সুনির্দ্দিষ্টপথে সমস্যাসমাধানে ব্যাপক আস্থালোপ—এ সমস্তই ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

পূর্ব্বেকার যে পরিস্থিতি আমাদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছিল বর্ত্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়ে গেছে; উদ্বেগ সেইজন্যেই।

যে-পথে আমরা যুদ্ধ চালিয়েছি অথবা যে পথে আমরা শান্তিপ্রতিষ্ঠা করেছি, তাতে যে দ্বিতীয় মহাসমরের কারণ সমূহকে বিনষ্ট করতে পারা গেছে—কোনও সাধুব্যক্তিই তা বলতে পারেননা। যে উদ্দেশ্যে

যুদ্ধ করা—তা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের অবসান হয়না। দ্বিতীয় মহাসমরেরও অবসান হয়নি। বর্ত্তমান শান্তিকে যে বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছে তার কারণ এই যে, সে শান্তি প্রকৃত শান্তি নয়। পৃথিবী এখনও পর্য্যন্ত যুদ্ধমানই।

জীবিত থাকলে পর ১৯৪৫ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট বল্‌তেন, "শত্রুকে পরাজিত করাটাই যথেষ্ট নয়।"

হিট্‌লার, মুসোলিনী এবং জাপানী জঙ্গীনেতারা আজ আর বেঁচে নেই। জার্ম্মানী, ইতালী এবং জাপানের যুদ্ধকালীন সরকার আজ ভূলুণ্ঠিত। অসংখ্য মানুষের জীবন, চক্ষু, হাত-পা, স্বাস্থ্য, স্নায়ু এবং অশ্রুর বিনিময়ে এই মহান এবং প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য যদি এক সুস্থতর পৃথিবীর বনিয়াদ হতো তবে তার থেকে আমরা আরও স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারতাম। আসলে তা জাতিগত স্বার্থপরতা, পররাজ্যদখললিপ্সা, পক্ষপাতদুষ্ট কঠোর নিপীড়ন এবং চুক্তিভঙ্গের একটা সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কেও আজ ঐক্যেব আদর্শ এবং নিতিবুদ্ধির অভাব ঘটেছে। সেখানে আজ এক-কর্ম্মসূচী, এক-লক্ষ্য এবং নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের স্থান নেই।

হিট্‌লার মুসোলিনী এবং জাপানী জঙ্গীনেতারা আজ আর বেঁচে নেই। তাই বলে কি ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে পারা গেছে? অবসান ঘটেছে একনায়কত্বের?

পাঁচ বছরেরও ওপর যুদ্ধ চল্‌লো। তাতে বহু দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ মৃত্যু এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যারা টিঁকে রইলো তাদের কাছেও এটা একটা ঘটনামাত্রই। এর কারণ, যুদ্ধের আগে যা-যা ঘটেছিল, যুদ্ধোত্তর ঘটনাসমূহের সঙ্গে তার কোনও বৈসাদৃশ্য নেই।

মানুষ আজ কোন পথে চলেছে? শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কি তা জানেন? যে-পথে সে চলেছে তার জন্যে কি কেউ দায়ী?

গ্রহতারকারাও ব্রহ্মাণ্ডজগতের নিয়ম মেনে চলে—সেইজন্যেই তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয়না ; জাতিপুঞ্জের সম্পর্কে কিন্তু সে-কথা খাটেনা, প্রায়ই তাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হয়। যুদ্ধোত্তর কূটনীতি কি এমন কোনও নিয়ম অথবা শক্তির সন্ধান পেয়েছে যা দিয়ে যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে ? পায়নি। পরমাণু-বোমার সংহার-শক্তি থেকেও কিছুই শিক্ষা হয়নি আমাদের।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বহুকোটি লোকই তোষণনীতি গ্রহণ করেছিল ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাদের মধ্যেই কোটি কোটি জন আবার সমর-সজ্জায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তারা তোষণনীতিপরায়ণ, নৈরাশ্যবাদী এবং সমরসজ্জায় বিশ্বাসী। তারা বলে ঃ যুদ্ধ মানেই ক্ষতি তবু যুদ্ধই অনিবার্য্য—যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।

একটিমাত্র দেবতারই সৃষ্টি করেছে এই যুদ্ধ, তিনি হচ্ছেন বলদেব। আদর্শবাদ এবং নীতিবুদ্ধি আজ সৈন্যবাহিনীর হাতে পর্য্যুদস্ত। সম্রাটই জয়লাভ করেন, তা তিনি যদি দুর্জ্জন হন, তবুও। বিজয়ী ব্যক্তি তোমাকে যদি কারাগারের পথে ঠেলে দেন, তবুও তাকেই অনুসরণ কর। মিথ্যাচরণ এবং বিবেকবুদ্ধিরহিত কার্য্যকলাপ—কি যায় আসে তাতে ? লক্ষ্য হলো ক্ষমতালাভ। কমিউনিষ্ট এবং ফ্যাসিষ্টরাই হচ্ছে এই মতবাদের প্রধান ধারক। নয়া নীতি—এটা মোটেই ভালো নীতি নয়—হচ্ছে, "আমাদের উপরে যে অত্যাচার চালানো হয়েছে ক্ষমতালাভের পর আমরাও সেই অত্যাচার চালাবো।" একনায়কত্ববাদীরা এই "প্রতিশোধ নীতি" গ্রহণ করেছে।

ক্ষমতার উপাসকরা বলে, "নীতিবুদ্ধি কথাটা নেহাৎ বাজে। আদর্শবাদ ? এই পরমাণু-যুগে ? তুমি কি উন্মদ ?"

নৈরাশ্যপরায়ণ 'বাস্তববাদী'রা বলে, "গান্ধী স্বপ্নবিলাসী, নেহেরুও এ-জগতের লোক নন। তাঁদের মধ্যে ছলচাতুরীর বড়ই অভাব।

তাঁরা যা ভাবেন, তাই-ই বলেন—এমন কি নিজেদের সম্পর্কেও। তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী।”

একনায়কত্ববাদীরা যন্ত্রের নির্দ্দেশে কাজ করে যায়, তারা যন্ত্রের উপাসক। সে যন্ত্র ক্ষমতার যন্ত্র। সে ক্ষমতা মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে, তাদের ধ্বংসসাধন করে। ফ্যাসিষ্ট পররাষ্ট্র-সচিব সিয়ানোর যে রোজনামচা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মুসোলিনীর কাছে মানুষের জীবনের কানাকড়িও দাম ছিলনা। ইটালীতে তখন খাদ্য, কাঁচামাল এবং অর্থের নিদারুণ অভাব ; ইটালীয় সৈন্যবাহিনীও তখন সুসজ্জিত নয়। তা সত্ত্বেও মুসোলিনী চাইছিলেন যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন দেবার জন্য হিট্‌লার যেন আরও বেশী পরিমাণে ইটালীয় সৈন্য গ্রহণ করেন। তিনি চাইছিলেন যে, “গৌরব”-এর কিছুটা অংশ তাঁরও হোক্। হতাহত এবং নিপীড়িতদের দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেননি। “ইটালীয় জাতি” বলতে তখন জীবিত জনসাধারণকে বোঝাতনা। দেশ ধ্বংসের সম্মুখীন, অথচ ‘ডিউস্’ তখন আরও একফালি বাজে জমি দখল করবার পরিকল্পনা করে’ চলেছেন। ইতালীকে তিনি শক্তিশালী করে তুল্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে চেয়েছিলেন যে তার জনসাধারণ দুর্ব্বল এবং অনুগত থাক্। সমস্ত একনায়কত্বই হলো এইরকম। ক্ষমতার যন্ত্রটিকে চালু রাখবার জন্যে যাতে প্রচুর পরিমাণে ক্রীতদাস পাওয়া যায়, একনায়কত্ববাদ তারই জন্যে ক্ষমতা হস্তগত করতে চায়।

এ যুগ একনায়কত্ববাদী যুগ। ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বেই এর সুরু হয়েছে। যুদ্ধে তার অবসান ঘটেনি। একনায়কত্ববাদী দেশগুলিতে স্বৈরাচারী শক্তিই হলো একমাত্র শক্তি। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তা যাতে একমাত্র শক্তি হয়ে না উঠ্‌তে পারে সেইজন্যেই আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। এ যুদ্ধে প্রধান প্রধান ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ববাদী

দেশসমূহের পরাজয় ঘটেছে বটে, কিন্তু তা সত্বেও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সেই স্বৈরাচারী শক্তিই এখন একমাত্র শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ন্যায়বিচারকে বলবৎ করবার জন্যে ক্ষমতাপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ক্ষমতাপ্রয়োগ রয়েছে কিন্তু ন্যায়বিচার নেই, তা হলো একনায়কত্ববাদ। ক্ষমতা আছে, আদর্শ নেই—তা হচ্ছে উৎসাদনবাদ (নিহিলিজ্‌ম্)। আর শুধু ক্ষমতার মোহেই যদি ক্ষমতা হস্তগত করা হয় তবে তা ফ্যাসিবাদ হয়ে দাঁড়ায়। গণতন্ত্রের পক্ষে এই ক্ষমতার আধিপত্যই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ্।

১৯৩৬, ১৯৩৭, এমন কি ১৯৩৮ সালেও গণতান্ত্রিক দেশগুলি যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত হলে পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে হয়তো বা ঠেকিয়েও রাখ্‌তে পারা যেত। তার বদলে বিভিন্ন 'সাফল্যমণ্ডিত' সম্মেলনের ঘুমপাড়ানী ইস্তাহার পড়ে' পড়ে' তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই কথা ভেবেই তারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে যদি তারা চুপচাপ বসে থাকে, মাঞ্চুরিয়া, আবিসিনিয়া ও স্পেনের যুদ্ধে যদি নিরপেক্ষ থাকে তারা, তা হলেই শান্তি অক্ষুণ্ন থাক্‌বে। অতঃপর যুদ্ধ এলো।

গণতান্ত্রিক দেশগুলির অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তখনও তারা ঝিমুচ্ছে কেন? সমস্যা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে কেন তারা এই তোষণ আর নিষ্ক্রিয়তার পথ অবলম্বন করছে?

আধুনিক গণতন্ত্রবাদ কোনও একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির আন্দোলন নয়, এটা জীবনচর্য্যারই একটা নির্দ্দিষ্ট পথ। গণতন্ত্রবাদ বল্‌তে স্বস্তি বোঝায়। বৃত্তি, সম্পদ বা অন্যতর সাফল্যের জন্য ব্যক্তিগত কলহবিবাদই সে স্বস্তির ব্যাঘাত ঘটায়।

মানুষের রুষ্ট হবার ক্ষমতাকেও বর্ত্তমান সভ্যতা নষ্ট করে দিচ্ছে। সর্ব্বত্রই যে-সমস্ত দুর্নীতি বর্ত্তমান, অষ্টপ্রহরের জন্যেই মানুষকে তা রুষ্ট করে রাখ্‌তো। তা থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। দৈবে বিশ্বাসস্থাপন করতে শিখিয়ে, নয়তো বর্ত্তমান দুঃখযন্ত্রণা সম্পর্কে

ভবিষ্যৎ পরিত্রাণের আশ্বাস দিয়ে ধর্ম্ম সেই প্রতিবাদ-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়াকে স্তিমিত করে আনে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আবার প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত সমাধানের পথে এগিয়ে দেয়।

জনসাধারণের স্থায়ী সক্রিয়তার আবহাওয়াতেই একনায়কত্বের আধিপত্য। একনায়কত্ববাদী সরকার প্রজাসাধারণকে সদাসর্ব্বদাই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত করে রাখছে। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থাই হলো সার্ব্বিক নিষ্ক্রিয়তা।

গণতান্ত্রিক সমাজকে সক্রিয় করে তুলবার জন্য পার্ল হারবারের মতো, অথবা ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের জাতীয় অস্তিত্ব যেরকমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল সেইরকম কোনও চাবুকের প্রয়োজন। নয়তো অর্থনৈতিক সঙ্কট। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণকে জাতিগত ভিত্তিতে কোনও কাজ করতে দেখা যায়না। গণতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ কোনও একটা অংশ—যথা শ্রমিক শ্রেণী, অথবা কোনও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী অথবা কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই সরকারের সম্মুখে ব্যবস্থাবলম্বনের দাবী উত্থাপন করা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাকে অন্যান্যদের বিরোধিতা অতিক্রম করতে হয়; সচরাচর তাকে গণতান্ত্রিক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নিষ্ক্রিয়তা এবং ঔদাসীন্যই অতিক্রম করতে হয়ে থাকে।

জনমত ও রাজনীতিক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকার বাদানুবাদ বর্ত্তমান; গণতান্ত্রিক সরকার তাতে নিষ্ক্রিয়তার একটা অজুহাত খুঁজে পান। বস্তুতঃ এই বাদানুবাদের ফলে সময় সময় তাদেব পক্ষে কাজ করা অসম্ভবও হয়ে দাঁড়ায়।

সংখ্যালঘুদের হাত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের রক্ষা করা, সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা, এবং এক-সংখ্যালঘুর হাত থেকে অপর-সংখ্যালঘুকে রক্ষা করাই হলো গণতন্ত্রের কাজ। এর থেকেই নিষ্ক্রিয়তার উদ্ভব। গণতন্ত্র বল্‌তে বাধাপ্রদান এবং

ভারসাম্যবিধানকেই বোঝায়। তার থেকেও নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়।

গণতন্ত্র সমাজকে তার ক্ষুদ্রতম অংশ-ব্যক্তি ও পরিবারে বিভক্ত করে ফেলে। সংহতিকে সে বিনষ্ট করে, পরে সংহতিহীন হয়ে সে নিজেই আত্মরক্ষা করতে পারেনা। ট্রেড ইউনিয়ন, কার্টেল, উৎপাদক সমিতি এবং নানারকম গোষ্ঠী সেখানে, শুধু অস্তিত্বরক্ষা নয়, পরিপুষ্টও হতে থাকে। একমাত্র সরকারী কাজের মধ্যেই তখন সমগ্র জাতি, অর্থাৎ ঐ গণতন্ত্রের অখণ্ড সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্যবিধানের প্রচেষ্টাই সরকারের অস্থিরমতিত্ব, দ্বিধাজড়িত মনোভাব এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণ। কখনো কখনো বা দেখা যায় যে, এই দুই পরস্পরবিরোধী স্বার্থ প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন।

রাজনীতি ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে ব্যবধান—স্বাধীন সমাজব্যবস্থায় তা এক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। শ্রেষ্ঠমনীষাউদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠ উপায় অনুযায়ীই বৈজ্ঞানিকরা পরমাণু-বোমা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিকালে সে বোমাকে কি কার্য্যে নিযুক্ত করা হবে—শ্রেষ্ঠ মনীষা দ্বারা তা নির্ণীত হয়না, অসংখ্যপ্রকার স্বার্থ, চাপ, টানাটানি, ভয়, লোভ ও আশার দ্বারাই নির্ণীত হয়। বিজ্ঞানের প্রসাদে বহুদিন আগেই দারিদ্র্য, সাম্রাজ্য, এবং বিভিন্ন দেশের অনগ্রসর অবস্থার অবসান ঘটতো। অথচ রাজনীতি কিন্তু সাবেক বস্তুকেই জিইয়ে রাখছে। সমাজের দূষিত উপাঙ্গকে ছেঁটে ফেলতে সে দ্বিধাগ্রস্ত।

দলের যোগ্যতম ব্যক্তিকেই যে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয় তা নয়, যিনি সর্ব্বাধিক ভোট কুড়োতে সক্ষম প্রার্থী-হিসেবে তাঁকেই দাঁড় করানো হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠ মতবাদই যে সবসময় জয়লাভ করে তা নয়, যে-মতবাদের পিছনে ঢক্কানিনাদের জোর রয়েছে তাই-ই জয়লাভ করে।

যে সরকার বড় বেশী সক্রিয় এবং কর্ম্মকুশল সে সরকারের হাতে

স্বাধীনতা লুপ্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে বলে গণতন্ত্র তার প্রতি বিরূপ। ফলে, গণতন্ত্রী সরকার নিষ্ক্রিয় এবং অপটু হয়ে পড়েন; অতঃপর তার উপরে যখন গুরুভার দায়িত্ব এসে পড়ে তখন তা পালন করতে তাকে বেগ পেতে হয়।

তোষণশীল গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ যে-আজ আক্রমণপরায়ণ একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রসমূহের সামনে জমি ছেড়ে দিয়ে হটে আসছে কেন এর থেকেই তার কারণ বুঝতে পারা যাবে। আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ব্যর্থতার কারণও এখানে পরিস্ফুট।

যুদ্ধের ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সুপ্ত সঙ্কল্প পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে; বিপদই তাদের মধ্যে সংহতি এনে দেয়। তারা যুদ্ধজয়ে সমর্থ বটে, কিন্তু তারপরেই আবার তাদের সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়; তাদের রাজনৈতিক অবস্থাও আবার তখন সেই যেমন-কে-তেমন।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবী আজ নানা জটিল সমস্যায় পীড়িত। সে সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। গণতন্ত্র যদি তাকে উপেক্ষা করে তবে তাতে তার নিজেরই সর্ব্বনাশ। গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন দেশ আজ পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাও এ-যুদ্ধ কমিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনও দেশে কোনও সঙ্কটের সৃষ্টি হলে আরো পাঁচটা দেশ তার দ্বারা সংক্রমিত হয়। আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা না হলে ভবিষ্যতে তা আরও ছড়িয়ে পড়বে। আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কটা আজ আর একটা অপ্রধান বিষয়মাত্র নয়, জীবনমরণের প্রশ্ন এখন এর সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতেও তাই থাকবে; জাতীয় অস্তিত্বও এখন এরই উপরে নির্ভরশীল। শৈথিল্য, অনন্যসংলগ্নতা, সস্তা আশাবাদ এবং পল্লবগ্রাহিতা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই সৃষ্টি করবে।

আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলিও এখন একই সাথে মাথা চাড়া দিয়ে

উঠেছে। নরনারী আজ জীবনধারণের উন্নততর ব্যবস্থা দাবী করছে। কর্ম্মসংস্থানকে সকলে এখন মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার বলেই মেনে নিয়েছে। যুদ্ধকালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বেকারীর অবসান ঘটেছিল; তারা তখন যা-কিছুই উৎপাদন করেছে তারই খরিদ্দার ছিল। সে খরিদ্দার হিট্লার এবং হিরোহিতো। প্রেরিত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদিই তাঁরা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ এই শান্তিকালে জনসাধারণ দাবী করছে যে, গঠনাত্মক পরিকল্পনা অনুযায়ী সার্ব্বিক কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক্। কিন্তু ব্যক্তিপ্রচেষ্টার দ্বারা কোনওদিনই কোথাও সার্ব্বিক কর্ম্মসংস্থান এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারা যায়নি। জনসাধারণ সেইজন্যেই আজ সরকারের কাছে আশা করছে যে, ব্যক্তিপ্রচেষ্টার দ্বারা যে-সমস্যার সমাধান অসম্ভব—সরকারই এগিয়ে এসে সে সমস্যার প্রতিকার করবেন।

ব্যক্তিপ্রচেষ্টা আজ তার একচ্ছত্র আধিপত্য হারাচ্ছে। ব্যক্তিপ্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থও জড়িত। বৃটিশ শিল্পসঙ্ঘের সভাপতি স্যার ক্লাইভ্ বেলিয়্ ১৯৪৫ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে ম্যাঞ্চেষ্টারে ঘোষণা করেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে, শিল্পের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আজ আর শুধুমাত্র মালিকদেরই এলাকাভুক্ত বিষয় নয়।" যেখানে জনস্বার্থের প্রশ্ন ওঠে মালিকানা অধিকারের ক্ষেত্র সেখানে সীমিত। মালিকদের পক্ষে রেমব্রাঁর একখানা ছবি পুড়িয়ে ফেলবার অথবা নিজের বাড়ীকে একটা আস্তাকুঁড়ে পরিণত করবার যতটুকু অধিকার রয়েছে—জনস্বার্থবিরোধীভাবে, যথা কম মজুরী দিয়ে অথবা উৎপন্ন দ্রব্যাদির অতিরিক্তরকম 'মূল্যনির্দ্ধারণ করে,' কারখানা চালাবারও তার চাইতে কিছুমাত্র বেশী অধিকার তাদের নেই। মালিকানা নীতির স্থলে আজ জনস্বার্থাশ্রয়ী চিন্তাধারা বিকাশলাভ করছে।

এই নতুন চিন্তাধারা আবার নতুন বিপদের সৃষ্টি করে। সমাজের প্রতিনিধিহিসেবে কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের শক্তিবৃদ্ধিও ঘটে। সময়মত সতর্ক হতে না পারলে সরকারের ক্ষমতা তখন সমাজদেহকে আচ্ছন্ন করতে পারে। আধুনিককালের একনায়কশাসিত রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস ব্যষ্টি এবং গোষ্ঠীর নিকট থেকে সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরেরই ইতিহাস। অতঃপর সে সরকার আর জনসাধারণকে গ্রাহ্য করে চলেননা। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যেই আজ এই একনায়কত্বপ্রবণতার বিপদ দেখা দিয়েছে।

বেকারী; অনিশ্চিত অবস্থা, অভাব এবং বৈষম্য—এগুলি হচ্ছে গণতন্ত্রের অভিশাপ; এরি ফলে অনেকে একনায়কত্ববাদের উপাসক হয়ে ওঠেন। ওদিকে সরকার যদি আবার খুব কর্ম্মতৎপর হন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান করতে কৃতসংকল্প হন—সেক্ষেত্রে সে সরকার একনায়কত্বের পথে পা বাড়াতে পারেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উভয়সঙ্কট এখানেই।

একনায়কশাসিত রাষ্ট্রে, মজুরী কম হলেও, সকলের জন্যেই কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে—তবে সেখানে স্বাধীনতা নেই। ওদিকে সাবেকী ধরণের পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ছিল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে অনিশ্চিত অবস্থা এবং অভাবও বিদ্যমান ছিল। কি করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রেখে আর্থিক নিরাপত্তা এবং সার্ব্বিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায়—তাই হলো আজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্যা। গণতন্ত্র যদি এই সমন্বয়সাধনে সক্ষম হয়—একমাত্র তাহলেই সে একনায়কত্ববাদের সঙ্গে তার এই সংগ্রামে জয়লাভ করবে।

সরকারী নিষ্ক্রিয়তার ফলে সমস্যার কোনও প্রতিকার সম্ভবপর হয় না; আবার সরকার যদি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন তাহলে

কর্ম্মসংস্থানের হয়তো একটা ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বাধীনতারও অবসান ঘটে। গণতন্ত্রকে এই উভয়সঙ্কটের মধ্যবর্ত্তী কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রহিসেবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আগামী কয়েক বৎসরের জন্য সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও অতি-সক্রিয়তার মাঝামাঝি একটা নিরাপদ পথের ছক্ কেটে নিতে হবে। আমেরিকার পক্ষে নিউ ডীল ব্যবস্থা বর্জ্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। ব্যাপক ব্যক্তিপ্রচেষ্টা, সেইসঙ্গে স্বল্প কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান হারে টেনেসি ভ্যালি পরিকল্পনার ন্যায় সরকারী প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন। একই সঙ্গে সরকারী পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও সালিশের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করে যেতে হবে। আরও অধিক সংখ্যায় যদি ক্রেতা ও উৎপাদকদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করা হয় তাহলে সেটাও একটা সুস্থ লক্ষণ হয়েই দেখা যাবে। গোঁড়া পুঁজিবাদীরা যদি এই পরিমিত উন্নয়নকে বাধাপ্রদান করেন তাহলে মার্কিন সমাজে প্রচণ্ড ভেদবিভেদের সৃষ্টি হবে এবং চরমপন্থীদের মধ্যে তা একটা আশু সঙ্ঘর্ষেরই সৃষ্টি করবে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদী একনায়কতা—এ দুয়ের মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করতে হবে ইউরোপের সম্মুখে আজ প্রশ্ন তা নয়। জার্ম্মাণীর পুঁজিবাদী-শ্রেণী সম্ভ্রান্ত জমিদারকুল এবং নির্দ্দোষ মধ্যবিত্তরাই হিটলারকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই সঙ্গে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটা পুঁজিবাদী প্রাচীর গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরাও হিটলারকে সমর্থন করেছিলেন। সেই হিটলারের হাতেই ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। ইউরোপের সম্মুখে আজ দুটিই মাত্র পথ: সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমক্রেসী, আর নয়তো ধনতন্ত্র-গণতন্ত্ররহিত সমাজতন্ত্র অর্থাৎ বলশেভিক্‌বাদ।

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া—শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে এরা সবাই অনগ্রসর; এ সমস্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারকে এক প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। একজন কোটিপতি ভারতীয় মিলমালিক আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি সমাজতন্ত্রী। ভারতের ইস্পাতরাজ জে আর ডি টাটার নেতৃত্বে বোম্বাইর একদল পুঁজিপতিশ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে এক পনেরসালা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করেছেন। এ পরিকল্পনার সাফল্য সরকারী প্রচেষ্টার উপরেই নির্ভরশীল। নতুন ধারা এদিকেই বইছে। পুঁজিপতিরা স্বীকার করেছেন যে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমাজতান্ত্রিক সাহায্য না পেলে তাঁদের একলার পক্ষে এ-কাজ করা অসাধ্য। সেইসঙ্গে তাঁরা মার্কিণ মূলধনেরও সাহায্যকামনা করেন। এই নতুন অর্থনীতি বাস্তবিকপক্ষেই একটা সমন্বিত অর্থনীতি।

এ যুদ্ধ সমাজতন্ত্রের বিকাশলাভের সুবিধা করে দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈদেশিক সরকাররা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নানা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণগ্রহণ করেছিলেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র-সরকারই 'লেণ্ড্ লীজ' ব্যবস্থায় তাদের ঋণদান করেছেন। অনুরূপভাবে ১৯৪১ সালের পর থেকে পরিকল্পনা-প্রণয়ন, মূলধন-নিয়োগ এবং সমরসম্ভার নির্ম্মাণের ব্যাপারে মার্কিণ শিল্পের প্রসার-সাধনে কেন্দ্রীয় সরকারই অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন। সমরসম্ভার নির্ম্মাণের মতো একটা বিরাট কাজ সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা সম্ভব হতোনা। শান্তিকালেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের উপরে অনুরূপ বিরাট এক দায়িত্বভার এসে পড়েছে।

সরকারকে আজ অর্থনৈতিক ধারার গতিনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রক্ষণশীল উইনস্টন চার্চ্চিলও বলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী এই সমাজ-তন্ত্রপ্রবণতা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র নয়,—নিঃসন্দেহেই এটা একটা স্থায়ী আন্দোলন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ, তার কথা ছেড়ে দেয়া যাক্। ব্যক্তিপ্রচেষ্টা থাক্‌বে কি থাকবেনা অন্যান্য দেশের প্রশ্নও আজ তা নয়। প্রশ্ন হলো, জাতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য সরকারীপ্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিপ্রচেষ্টার আনুপাতিক হার কি পরিমাণ হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিপ্রচেষ্টার পাশাপাশি কি পরিমাণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হবে। এমনভাবে তাদের আনুপাতিক হার নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির নিশ্চিত ব্যবস্থা করা যায়। যুদ্ধোত্তরকালে এই দুই বি-সম স্বার্থের সমন্বয়সাধনপ্রচেষ্টার সাফল্যের উপরেই গণতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করছে। মানুষকে স্বাধীন এবং সুখী করে তোলাই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

গ্রেট বৃটেনই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যুদ্ধশেষে সর্ব্বপ্রথম সে-ই সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে।

যোগ্যতাসত্ত্বেও অনেক জাতির কপালেই উপযুক্ত সরকার জোটেনা। উদাহরণস্বরূপ স্পেনের নামোল্লেখ করা যায়। তিন বৎসর ধরে ফ্র্যাঙ্কো, হিট্‌লার এবং মুসোলিনীর বিরুদ্ধে যে-স্পেন যুদ্ধ চালিয়েছে ফ্র্যাঙ্কোর চাইতে ভালো শাসক পাওয়া উচিত ছিল তার। অনেক সময় আবার, বিশেষ করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে, দেখা যায় যে, জনসাধারণ তার মানসিক ঝোঁক এবং সহজবুদ্ধি অনুসারে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল পথই গ্রহণ করেছে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে তা দেখা গিয়েছিল। বৃটিশ অর্থনীতিক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং বৃটেনের পররাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন করে তুলবার জন্যে বৃটিশ জনসাধারণ তখন নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে শ্রমিক দলকেই বিপুলভাবে সমর্থন করেন।

বৃটেনের শিল্পব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়েছে। তাকে যুগোপযোগী করে তুল্‌বার জন্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ১৯৪১ সালে যে-সমস্ত বৃটিশ কারখানা আমি পরিদর্শন করেছিলাম তার প্রত্যেকটির পরিচালকই সাক্ষাৎকারের কিছুক্ষণ বাদেই আমাকে বলেছেন, "আসুন, এবার আপনাকে আমাদের যাদুঘর দেখাই।" কখনো কখনো দেখেছি যে তা প্রায় কয়েক শতাব্দী আগেকার ধরণের। আধুনিক বহু কারখানা, বিশেষতঃ নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যোৎপাদনের কারখানা বৃটেনের রয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ এই দুয়ে মিলে বৃটিশ শিল্পব্যবস্থাকে মোটামুটিভাবে পিছিয়েই রেখেছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতিকে যে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন করে তোলা দরকার তার কারণ অতি সরল। যে জাতীয়তাবাদী পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী জবরদস্তিমূলকভাবে দুর্ব্বল জাতিসমূহের উপর প্রভুত্ববিস্তার করা হয় তার একটিই মাত্র আকর্ষণ রয়েছে—তা হলো সাফল্য। সে সাফল্য হয়তোবা ক্ষণস্থায়ীই। ইংলণ্ডের পক্ষে সে আকর্ষণে লুব্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ রাশিয়ার সঙ্গে, এবং স্থানে স্থানে আমেরিকার সঙ্গেও, প্রতিযোগিতায় নেমে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির রাজনীতিতে জয়লাভ করা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব।

পুরোনো নীতি বড় একগুঁয়ে হয়। আলস্য, স্বভাবদোষ, গতানুগতিকতা এবং নূতন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভয়কাতরতার ফলেই পুরোনো নীতি টিঁকে থাকে। সময়-সময় নির্ব্বাচিত মন্ত্রিদের অপেক্ষা স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীরাই অধিকতর ক্ষমতাশালী হন—তাঁরা সব হচ্ছেন পুরোনো নীতির ধ্বজাধারী। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যবিধান করেছে, এ যাবৎ সে ছিল ধনতান্ত্রিক। ইংলণ্ড যদি আজ তার সেই অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়, তাহলে ইউরোপ এবং পরে এশিয়াও—তাকে নেতৃপদে কামনা করতে পারে।

বৃটিশ জনসাধারণ যে শ্রমিক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন—তা এই কারণেই। বৃটেনের শ্রমিকদলীয় রাষ্ট্রনীতিবিদরাও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক সুযোগ সম্পর্কে তাঁরা অবহিত। হোয়াইট-হলের দুধারে এবং তার পাশের রাস্তা ডাউনিং ষ্ট্রীটে যে-সমস্ত সরকারী দপ্তর রয়েছে, এই সুযোগের তারা সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ কিনা, সময়ই সেকথা প্রমাণ করবে।

হোয়াইট হল, ক্রেমলিন এবং ভ্যাটিক্যান—এই ত্রিভূজের উপরেই ইউরোপের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। ইউরোপেব উপর দিয়ে যে বিভীষিকার ঝড় বয়ে গেছে তা সত্ত্বেও এখনো সে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। বর্ত্তমানে সেই বুভুক্ষু, পরিশ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত এবং রক্তাক্ত মহাদেশের উপরে প্রভাববিস্তারের জন্য হোয়াইট হল, ক্রেমলিন এবং ভ্যাটিক্যানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌ছে। হোয়াইট হল হচ্ছে বৃটিশ জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ সোস্যাল ডেমক্রেসীর প্রতীক, রুশ জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ বলশেভিকবাদের প্রতীক হলো ক্রেমলিন। রক্ষণশীল ক্যাথলিক সমাজ এবং রক্ষণশীল পুঁজিবাদী, রাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদীরা এই দুয়েরই বিরোধী। এই ত্রিভূজের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের উপরেই সমস্ত কিছু নির্ভরশীল।

১৯৪৪ সালের শরৎকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা সমস্যা সম্পর্কে পোপের কাছে স্ট্যালিন একখানা চিঠি লিখেছিলেন। ক্রেমলিন এবং ভ্যাটিক্যানের মধ্যে তিনি আপোষের প্রস্তাব করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি রাশিয়ার গোঁড়া গ্রীক ধর্ম্মমতের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতের মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

স্ট্যালিনের লক্ষ্য তখন পোল্যাণ্ড। রাশিয়া এবং জার্ম্মাণীর মধ্যে পোল্যাণ্ডই হচ্ছে যোগসাধক সেতু, ওদিকে জার্ম্মাণী হলো ইউরোপের কেন্দ্রস্থল। পোল্যাণ্ড রোমান ক্যাথলিক দেশ। স্ট্যালিন জান্‌তেন যে, পোলদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে বেগ পেতে হবে।

তিনি জানতেন, বৈদেশিক প্রভুত্ব ছদ্মবেশী হওয়া সত্বেও, চিরদিনই তারা দীর্ঘকাল ধরে' বাধা দিয়ে এসেছে; তখনো তাদের সে ক্ষমতা অটুট। এই কারণেই স্টালিন পোপের সাহায্যপ্রার্থনা করেছিলেন। রোম এবং মস্কোর মধ্যে একটা আপোষ হয়ে গেলে তার ফলে পোল্যাণ্ডে কার্য্যোদ্ধার করতে রাশিয়ার সুবিধে হয়ে যেত।

ম্যাসাচুসেট্স্-এর অন্তর্গত স্প্রীংফিল্ডের পোল্ ধর্ম্মমতাশ্রয়ী পল্লীযাজক ফাদার ওর্লেম্যান্স্কি ১৯৪৪ সালে ক্রেমলিনে স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের পর বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করলেন যে, পোল্যাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতের কিছুমাত্রও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্য সোভিয়েট সরকারের নেই। পোপের মনোভাব কিন্তু এতটা সহযোগিতাপরায়ণ ছিলনা।

বহুদিনের জন্য পোপ্ স্টালিনের পত্রের কোনও উত্তরই দেননি। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট ব্যাপাবটার ভারগ্রহণ করেন। ব্রন্‌ক্স্ কাউন্টির গণতন্ত্রী নেতা এডওয়ার্ড জে ফ্লীন রোমে গেলেন, সেখান থেকে ১৯৪৫ সালেব ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ইয়াল্টা সম্মেলনে যান; সেখান থেকে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে গিয়ে স্টালিন, ঝ্ডানভ্ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতান্তে তিনি রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একটা রফা করবার উদ্দেশ্যে দু'পক্ষকেই তিনি বাজিয়ে দেখ্ছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত ফ্লীন দৌত্য ব্যর্থ হলো। স্টালিন যে প্রস্তাব করেছিলেন পোপ্ তা অগ্রাহ্য করলেন। তখন থেকেই সোভিয়েট পত্রিকাসমূহ, এবং সমস্ত স্থানের সোভিয়েট প্রতিনিধিরাই ভয়ানকভাবে ক্যাথলিকবিরোধী হয়ে উঠেছেন।

ক্রেমলিন এবং ভ্যাটিক্যান—এ দুয়েরই আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব রয়েছে; আদর্শবাদ এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তারা আজ দ্বন্দ্বনিরত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ মহাদেশে ক্যাথলিক মতবাদের

রাজনৈতিক প্রভাব অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। ক্যাথলিক রাষ্ট্র ইটালী পরাজিত; যে-জার্ম্মানীতে প্রচুরসংখ্যক ক্যাথলিক মতবাদী ছিল সেই জার্ম্মানীও তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে। স্পেন এবং পর্তুগাল ক্যাথলিক বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তারা ফ্যাসিবাদী সুতরাং মূল রাজনৈতিক প্রবাহ থেকে তারা বিচ্যুত। ফ্রান্সে পূর্বে একটি প্রথমশ্রেণীর শক্তি ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পর্য্যবসিত হয়েছে। যে পোল্যাণ্ড আগে ছিল পোপের রাজনৈতিক সংগঠনের স্তম্ভস্বরূপ সে আজ রাশিয়ার প্রভাবাধীন। ভ্যাটিক্যান তাই ক্রমেই আজ আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে উঠ্‌ছে। তাই বলে' ইউরোপের ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব থেকে সে সরে আসেনি, সেই দ্বন্দ্বে সে বরং মার্কিণদেরও টেনে নামাতে চেষ্টা করবে।

পৃথিবীর রক্ষণশীল শ্রেণী আজ ক্রেমলিন এবং হোয়াইটহলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভ্যাটিক্যানকে তাদের বন্ধু বলে গণ্য করতে পারে। কিন্তু ফ্রান্স এবং ইটালীব উদারপন্থী ক্যাথলিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি আজ নূতন সামাজিক বিক্ষোভ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। মনে হয়, নূতন ভাবধারার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবে। তারা হোয়াইট হলেরই পক্ষাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

হোয়াইটহল এবং ক্রেমলিন আজ এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বে নিরত। ইতিমধ্যেই আঘাত এবং পাল্‌টা-আঘাত হানা হয়ে গেছে; ইউরোপ এবং এশিয়ার পথেঘাটে আজ তারই প্রতিধ্বনি। যুদ্ধোত্তর যুগের এই সংগ্রামে একটা কিছু মীমাংসা হয়ে যাবেই।

ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর প্রবন্ধে 'প্রভাবাধীন এলাকা' গঠন এবং ত্রিশক্তি-প্রভুত্বের প্রশংসা করেছেন। তাঁর অভিমত হচ্ছে এই যে,

ইংলণ্ড হলো একটি 'তিমি' অর্থাৎ নৌশক্তিপ্রধান রাষ্ট্র এবং রাশিয়া হলো একটি 'হস্তী' অর্থাৎ সে স্থলশক্তিপ্রধান; সুতরাং তাদের মধ্যে বিরোধের কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু এশিয়া মহাদেশে সেই ইংলণ্ডই হচ্ছে এক বিরাট স্থলশক্তি। তা ছাড়া স্টালিনও ঘোষণা করেছেন যে, রাশিয়া একটি বিরাট নৌবাহিনী গড়ে তুলতে চায়। রাশিয়া এখন ধীরে ধীরে আটলাণ্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, বাল্টিক সাগর, পারস্য উপসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

'তিমিমাছ' এখন সাঁতরে গিয়ে হাতীর জঙ্গলে প্রবেশ করবে কিনা প্রশ্ন তা নয়। সিংহ কি আজ ভল্লুকের সঙ্গে আপোষ করে নেবে? সিংহের হয়তো সেরকম ইচ্ছে থাকতে পারে, কিন্তু ভল্লুক হলো মহাতেজীয়ান, চারদিকে সে এখন থাবা বাড়াচ্ছে। আপোষ করে' চল্‌বার কোনও লক্ষণই তার মধ্যে দেখা যাচ্ছেনা। বুড়ো সিংহের সঙ্গে তো নয়ই। কেশর ঝরে' গেছে বুড়ো সিংহের, এশিয়াবাসী প্রজাদের আর্ত্তি আর প্রতিবাদের মধ্যে গর্জ্জন ডুবে গেছে তার।

১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন জর্জ সিসারিন। 'দি সোভিয়েটস্ ইন্ ওয়ার্লড্ অ্যাফেয়ার্স' বইখানা লিখবার সময় তার সঙ্গে আমার বহু আলাপ আলোচনা হয়েছিল। সিসারিনের কথাবার্ত্তায় বোঝা যেত যে, ইরান, আফগানিস্থান, এবং মোটামুটিভাবে সমগ্র প্রাচ্য সম্পর্কেই তিনি বিশেষ আগ্রহশীল। জারশাসিত রাশিয়ায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলেন অধ্যাপক সুনেসারেভ। ১৯২৮ সালে সিসারিন আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চমৎকারভাবে অতিবাহিত হয়েছে। সিসারিন বলেছিলেন, "বাকু যেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে এশিয়ার রাস্তা

দেখিয়ে দিচ্ছে।” তাঁর নজর এশিয়া আর জার্ম্মানীর দিকেই। জারের আমলেও সিসারিন পররাষ্ট্র-দপ্তরে কাজ করেছিলেন; কমিউনিষ্টদলভুক্ত হয়া সত্ত্বেও তিনি সেই পুরোনো আমলেরই জের টেনে গেছেন।

পররাষ্ট্রসচিব-পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে ম্যাক্সিম্ লিট্ভিনফ্ সিসারিনের সহকারী ছিলেন। প্রায়ই তিনি আমাকে বল্তেন যে, মধ্য-এশিয়ার আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিকে তোয়াজ করে' ইঙ্গ-সোভিয়েট সম্পর্কে ঘুণ না ধরিয়ে সোভিয়েট সরকারের পক্ষে বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্কস্থাপনেরই প্রয়োজন বেশী। লিটভিনফ্ এবং সিসারিনের সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়। স্টালিন পুনরায় সিসারিনের নীতি গ্রহণ করবার পর ১৯৩৯ সালের মে মাসে লিট্ভিনফ্‌কে পদচ্যুত করা হয়। রাশিয়া তখন রাজ্যবিস্তার-নীতি গ্রহণ করেছে। সোভিয়েট সরকারের রাজ্যবিস্তারমূলক নূতন পররাষ্ট্র-নীতিতে লিটভিনফের আস্থা নেই, সেইজন্যেই তিনি সেই নীতি অনুযায়ী কাজ চালাতে পারেননি। তাই তিনি নিষ্ক্রিয়।

১৯৩৬ সালে আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম প্যারিসে। তখন একটি ফরাসী সংবাদপত্রে দেখলাম যে, আবিসিনিয়ার প্যারিসস্থ রাষ্ট্রদূত রুশভাষায় কথা বলেন। কৌতূহলী হয়ে এ বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করি। তাতে জান্তে পারলাম যে, বলশেভিক্ বিপ্লবের পূর্ব্বে জার-সরকারের আমন্ত্রণক্রমে সেন্ট পিটার্স্‌বার্গের সামরিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে এবং জারের দরবারে আদবকায়দা শিখতে ইথিওপীয় রাজবংশের ছেলেদের পাঠানো হতো। আবিসিনিয়া তখন বৃটিশ প্রভাবাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

আবিসিনিয়ার খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজ খ্রীষ্টের একটিই-মাত্র প্রকৃতিতে, তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে, বিশ্বাসী। খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক ও মানবিক —এই দ্বৈতপ্রকৃতিতে তাঁরা বিশ্বাসী নন। আর্ম্মেনীয় ধর্ম্মসমাজও

খ্রীষ্টের একটিইমাত্র প্রকৃতিতে বিশ্বাসী। তাঁদের সদরদপ্তর হলো রুশ আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত এখ্‌মিয়াদ্‌জিন্‌-এ। সেখানে তাঁদের ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে আমি কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছিলাম। আবিসিনিয়াতে রাশিয়ার প্রভাববৃদ্ধির জন্য জার-সরকার আর্ম্মেনীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়েছিলেন।

যেখানেই বৃটেনের প্রভাব রয়েছে—সেখানে গিয়েই উৎপাত সৃষ্টি করা ছিল জারের রাশিয়ার নীতি। আজও আবার সেই বৃটিশ প্রভাবাধীন. এলাকায় হাজির হয়ে উৎপাতের সৃষ্টি করতেই সে চেষ্টা করছে।

মিশর ,১৯৪৪ সালে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কস্থাপন করে। মিশবেব প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী কঠোর শ্রমজীবী গ্রাম্য 'ফেলাহিন'দের উপরে উৎপীড়ন চালাতো: এ সম্পর্কে আত্মসচেতনতাবশতঃ এতদিন পর্য্যন্ত তারাই মিশরকে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে দেয়নি। অতঃপর ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত তাঁব সেক্রেটারীবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কায়রোতে এসে পৌঁছুলেন। সেক্রেটারীদের মধ্যে সকলেই মুসলমান। (সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে।) প্রথম সরকারী কাজ হিসেবে তাঁরা গিয়ে রাজা ফারুককে অভিবাদন জানিয়ে বল্‌লেন যে, প্রতি শুক্রবার সকালে রাজা ফারুকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলে তাঁরা আনন্দিত হবেন। এই কূটনৈতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করলে তার অর্থ দাঁড়ায়, রাশিয়া মিশরের প্রতি সদ্ভাবাপন্ন, সহানুভূতিশীল।

প্যালেষ্টাইন, এবং সমগ্র আরব-জগৎ সম্পর্কেই আজ রাশিয়ার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তার কারণ, সেটাও গ্রেট বৃটেনেরই এলাকা। আরব জাতি, এবং প্রাচ্যের অন্যান্য জাতির সম্মুখেও ক্রেমলিন আজ নিজেকে বৃটিশের পরিবর্ত্ত হিসেবেই উপস্থাপিত

করেছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান, আর্ম্মেনীয়, গোঁড়া গ্রীক ধর্ম্মমতাশ্রয়ী শ্লাভ অধিবাসীবৃন্দ আজ বৃটিশ প্রভুত্বাধীন এলাকার মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে রাশিয়ার জন্য বন্ধুসংগ্রহে ব্যস্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের মনে আজ যে বিদ্রোহভাব ধূমায়িত, তাতে তাদের কাজের সুবিধেই হয়ে গেছে।

তাদের উদ্দেশ্যের বিভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যা করা হতে পারে। কিন্তু রাশিয়া কর্ত্তৃক দার্দ্দানেলিসে ঘাঁটিস্থাপন, ইরাণ-প্রবেশ, গ্রীসে প্রভাববিস্তার, দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জকে রুশ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন এবং উত্তর আফ্রিকাস্থ উপনিবেশ ত্রিপলিতানিয়ায় হস্তক্ষেপের ফলে বৃটিশসাম্রাজ্য যে বিপদ্গ্রস্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে মিশর ও ভারতবর্ষের যোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে যাবে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে রাশিয়ার যদি আজ উত্তর আফ্রিকাকে হস্তগত করবার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে সে কারণে তো তার উরুগুয়েকে হস্তগত করবারও প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, ঐ আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যথাক্রমে দার্দ্দানেলিস ও পোল্যাণ্ডকে হস্তগত করা প্রয়োজন। তা হলে তো সমগ্র পৃথিবীকে প্রভুত্বাধীন না করতে পারলে আত্মরক্ষা করা যায়না, বা নিরাপত্তা বলেও কিছু থাকেনা।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানে আমার কিছুমাত্রও আপত্তি নেই; কিন্তু রাশিয়ার চাপের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘট্লে বৃটিশ উপনিবেশগুলি রাশিয়ারই হাতে গিয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে স্ফীতকায় রুশ সাম্রাজ্য সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের-প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে।

বৃটিশরা আজ তাদের উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতাপ্রদান করুক এইটেই বাঞ্ছনীয়। সমর্থ এক সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাধীনে এই উপনিবেশগুলি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে; তখন আর তাদের নিয়ে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ ঘট্‌বেনা। কিন্তু

সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই উপনিবেশগুলি যদি আজ ইংলণ্ডের হাত থেকে খসে পড়ে তা হলে তারা স্বাধীন হয়ে না উঠে সোভিয়েট একনায়কত্বের আওতায় গিয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর।

বৃটিশ সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্যের এই দ্বন্দ্বে মধ্যএশিয়া এবং পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিও আর তখন নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্রই থাকবেনা; তারাও তখন চক্রান্ত চালাবে, এ-ওব পক্ষে যোগ দেবে এবং যে-যার উদ্দেশ্য হাঁসিলের চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই তারা তা সুরু করে দিয়েছে।

রুশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূতন করে সুরু হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে শৃঙ্খলিত জনসাধারণ যে মুক্তি-আন্দোলন আরম্ভ করেছে, ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তা একটি নূতন ঘটনা। ইংলণ্ড যদি আজ তার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে স্বাধীনতাপ্রদান না কবে তা হলে এই মুক্তি-আন্দোলনের ফলে রাশিয়ারই সুবিধা হয়ে যাবে। এশিয়াবাসীরা মরিয়া হয়ে স্বাধীনতা-অর্জনের চেষ্টা করবে তা সে যে কোনও উপায়েই হোক্। বৃটিশ প্রভুস্বাধীন ভাবতবর্ষ আজ ক্রমান্বয়েই বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার কাছে সে সাহায্যপ্রার্থনা করতে পারে। অপরপক্ষে ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতাপ্রদান করা হয় তা হলে সে রুশপ্রভুত্বের বিরোধী হয়ে উঠবে; সোভিয়েট আক্রমণের বিরুদ্ধে সে তখন ইংলণ্ড, অথবা আমেরিকা অথবা কোনও সমর্থ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদ যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল রাজ্যবিস্তারশীল রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বভূমিতে অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটছে। রাশিয়া আজ নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গ ঔপনিবেশিক জনসাধারণের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করবে।

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানের লণ্ডন-অধিবেশনে সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র-সচিব আঁদ্রে ভিসিন্স্কি ও বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব বেভিনের মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানে কোনদিকে ভোট দেওয়া হচ্ছে, অথবা বেভিন কি বল্লেন, অথবা আঁদ্রে ভিসিন্স্কির ক্রিয়াকলাপকে বৃটিশ ও মার্কিণ সংবাদপত্রে কিভাবে বিদ্রূপ করা হচ্ছে—তাতে তাঁর কিছুই যায় আসেনি। ব্যাপারটার গুরুত্ব এইখানে যে, অতঃপর সমগ্র দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া এই বলে' ভিসিন্স্কিকে অভিনন্দন জানাবে যে, পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি নিপীড়িত ঔপনিবেশিক জনসাধারণকেই সমর্থন করেছেন।

কর্ত্তব্য কি? ঔপনিবেশিকত্বের অবসান ঘটিয়ে এশিয়াবাসীদের মুক্তিপ্রদান করতে হবে। স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার অথবা দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলবার জন্যে তারপরেও তাদের মধ্যে কারো যদি সাহায্যলাভের প্রয়োজন থেকে থাকে তবে সেজন্যে এক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপরেই তাদের নির্ভর করতে হবে। মিত্ররাষ্ট্ররাই সেই প্রতিষ্ঠান গঠন করে তুল্‌বে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা, বস্তুতঃ সমগ্র পাশ্চাত্ত্য অঞ্চলের সঙ্গেই রাশিয়ার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌ছে তাতে রাশিয়ার কাছে আজ প্রত্যেকটি বিক্ষুব্ধ এশিয়াবাসীরই যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ এক দুর্গ্রহ; পাশ্চাত্ত্যের নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের দিক্ থেকেও তা হানিকর পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে এই কারণেই আজ সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহের যদি আজ এ-কথা উপলব্ধি করবার মত বুদ্ধিরও অভাব ঘটে থাকে তাহলে তারা রাশিয়ার ব্যাপক উচ্চভিকেই সফল করে তুল্‌বে।

বৈদেশিক কমিউনিষ্ট দলগুলিও সোভিয়েট সরকারের আর-এক

প্রচণ্ড সম্পদ। ১৯৪৩ সালের মে মাসে মস্কো থেকে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিণ্টার্ণের অবসান ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, যে-সমস্ত কমিউনিষ্ট দল নিয়ে কমিণ্টার্ণ গঠিত হয়েছিল তার পর থকে তারা ক্রেমলিনের প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করছে। কোনও কমিউনিষ্টদলই কোনওদিন সোভিয়েট সরকারের প্রকাশ্য সমালোচনা করেনি, মস্কোর সঙ্গে সামান্যতম মতবিরোধও দেখা যায়নি তাদের, সোভিয়েট সরকারের নীতি সমর্থনে কোনও কমিউনিষ্ট দলেরই এযাবৎ কোনও গাফিলতি দেখা যায়নি। কমিউনিষ্টদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে রাশিয়ার সমালোচনা করবার একটিমাত্রও দৃষ্টান্ত দেখা গেলে খুশী হওয়া যেতো; তাতে হয়তো প্রমাণ হতো যে, ক্রেমলিনের কবল থেকে তারা মুক্ত হয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত একটিও নেই।

মাঝে মাঝে দৃষ্টান্ত দেখানো হয় যে, কমিউনিষ্ট দল অকমিউনিষ্ট কার্য্যপন্থা অথবা আদর্শও সমর্থন করেছে; তা-থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয় যে, কমিউনিষ্ট দলগুলি সত্যিই-কিছু কমিউনিষ্ট নয়, বা রাশিয়ার কাছ থেকে তারা কোনও নির্দ্দেশও গ্রহণ করেনা। এটা কোনও কাজের কথা নয়। রাশিয়াও নামেমাত্রই কমিউনিষ্ট। চীনা কমিউনিষ্টরা মধ্যপন্থী ও অকমিউনিষ্টসুলভ সংস্কারসাধনের পক্ষপাতী হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসেনা। তারা অথবা অন্যান্য কমিউনিষ্ট দল সোভিয়েট সরকারের নীতির বিরোধিতা করেছে কি-না, অথবা তার সঙ্গে অসহযোগ করেছে কিনা আসল পরীক্ষা সেইখানেই।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের রুশ-জাপান চুক্তিতে সোভিয়েট সরকার মাঞ্চুরিয়াকে জাপ-তাঁবেদার রাষ্ট্রহিসেবেই স্বীকার করে নেন; তাতে আরো বলা হয়েছিল যে, জাপান সম্পর্কে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে। কোনও চীনার পক্ষে কি করে এই চীনা-বিরোধী চুক্তির প্রশংসা করা সম্ভব হয়? অথচ চীনা কমিউনিষ্ট দলের নেতৃবৃন্দ

প্রকাশ্যেই এই চুক্তির প্রশংসা করেছেন। ১৯৪৩ সালে কমিণ্টার্ণের অবসানের পর মস্কোর সঙ্গে সত্যই কোনও বিচ্ছেদ ঘটলে পরে অতঃপর যুক্তির দিক্ থেকে রুশ-জাপান চুক্তি সম্পর্কে চীনের কমিউনিষ্ট দলের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হতো। অথচ সেরকম কোনও পরিবর্ত্তন ঘটেনি; তার কারণ কমিণ্টার্ণের সে অবসান কোনও অবসানই নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ভারতের সমস্ত দলই যুদ্ধবিরোধী ছিল। যুদ্ধের সমর্থক হওয়ার অর্থ বৃটিশেরও সমর্থক হওয়া; সুতরাং ভারতীয়দের পক্ষে যুদ্ধবিরোধী হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। রাশিয়া আক্রান্ত হবার পরেই ভারতীয় কমিউনিষ্ট দলও যুদ্ধ-সমর্থক হয়ে উঠে ভারতের বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। তাদের কাছে মস্কোর প্রতি আনুগত্যই হলো চরম কথা। কমিণ্টার্ণের অবসানের পরেও ভারতীয় কমিউনিষ্টরা রুশ-অনুগত ও যুদ্ধ-সমর্থকই থেকে গেলেন।

ইটালীর কমিউনিষ্টদের পক্ষে মুসোলিনীর চীফ-অব-স্টাফ মার্শাল বাদোগ্লিওর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অথচ সোভিয়েট সরকার বাদোগ্লিও মন্ত্রিসভাকে মেনে নেওয়ার পর ইটালীর কমিউনিষ্টরাও তাঁকে সমর্থন করলেন, ভাবেপ্রকারে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে প্রস্তুত। ত্রিয়েস্তেকে টিটোশাসিত যুগোশ্লাভিয়ার কাছে সমর্পণ করবার ব্যাপারে অন্যান্য ইটালীয়দের মত ইটালীয় কমিউনিষ্টদের পক্ষেও ক্রুদ্ধ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু ত্রিয়েস্তেকে টিটোর হাতে তুলে দিলে যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিষ্ট একনায়কত্ব আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং আদ্রিয়াটিক্ সমুদ্র পর্য্যন্ত সোভিয়েট প্রভাব বিস্তৃত হয়, অতএব ইটালীয় কমিউনিষ্টরা তৎক্ষণাৎ ইটালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে টিটোর পক্ষাবলম্বন করলেন।

জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত কোনও ভূখণ্ড অপরের হাতে তুলে দিলে জার্মানরা স্বতঃই তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জার্মান কমিউনিষ্টরাও রাইনল্যাণ্ড এবং রুঢ়কে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করবার বিরোধী। কিন্তু রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ডের হাতে জার্মান ভূখণ্ড তুলে দেবার ব্যাপারে তাঁরা খুশীই হয়েছিলেন।

মস্কোর নীতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিভুর্ল সঙ্গতি রেখে অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট দলগুলিও নিজ নিজ নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। সোভিয়েট-নীতির সঙ্গে অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্টদের কথায় ও কাজে এত বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাহলে ১৯৪৩ সালে যে কমিণ্টার্ণের অবসান ঘোষণা করা হলো তার অর্থ কী দাঁড়ায়? রাশিয়া যে আন্তর্জ্জাতিকতাবাদ পরিহার করছে এটা হলো তারই একটা নমুনা। অতঃপর অন্যান্য স্থানের কমিউনিষ্টরাও এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে ষ্টালিন একজন ব্যবসাদার ব্যক্তি। বলতে কি, ছোট্ট একখানা কালো খাতায় নিশ্চয়ই তিনি তার লাভ-লোকসানের একটা হিসেব টুকে রাখেন। কমিণ্টার্ণের হিসেবের পৃষ্ঠা উল্টে তিনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন যে, ১৯১৯ সালে কমিণ্টার্ণের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ-যাবৎ তার লাভের কোঠায় কিছুই-প্রায় জমা পড়েনি। চীনা কমিউনিষ্টদের অবশ্য বিরাট এক সৈন্যবাহিনী রয়েছে, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাদের শাসনাধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনওদিনই তারা চিয়াং কাইশেকের আদর্শ বা পররাষ্ট্র-নীতির কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারেনি। ১৯৩৩ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্মান কমিউনিষ্ট দল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, সেইসময় তারা ষাট লক্ষেরও ওপর ভোট পেয়েছে। কিন্তু হিট্‌লারের অভ্যুত্থানকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি তারা, তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতেও পারেনি। স্পেনের কমিউনিষ্ট-অনুগতদের সমর্থনে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার কমিউনিষ্টরা প্রচণ্ডরকম কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্পেন সম্পর্কে ঐ সমস্ত দেশের নীতি অপরিবর্ত্তিতই থেকে গেছে। কমিউনিষ্টরা কোনওখানেই সরকারী-নীতির উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং স্টালিনও তা বুঝতে পেরেছিলেন। কমিউনিষ্টরা বড় রকমের একটা গণ-বিক্ষোভের আয়োজন করতে পারে; কোনও প্রতিষ্ঠানকে বেদখল করতে কি নষ্ট করতে, অথবা কাগজে-কলমে জোরালো প্রচারকার্য্য চালাতেও তারা সক্ষম। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যকলাপে কোনওদিনই সোভিয়েট সরকারের তেমন কোনও উপকার হয়নি। তার কারণ প্রতিবাদ জানাবার ব্যাপারেই কমিউনিষ্টরা খুব তৎপর ছিল; বড়জোর খুব জোরালো রকমের একটা প্রতিবাদ তারা জানাতে পারতো, এই পর্য্যন্ত। তারা প্রতিবাদ জানিয়েই এসেছে; তাতে ক্ষমতার কোনও বালাই ছিলনা। এমন কোনও ক্ষমতা তাদের হাতে ছিলনা যাকে তারা রাশিয়ার কাজে লাগাতে পারে।

কমিণ্টার্ণের অবসান ঘটিয়ে ষ্টালিন বৈদেশিক কমিউনিষ্ট দলগুলিকে ক্ষমতার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিলেন।

১৯৪৩ সালের পূর্ব্বে, রাশিয়ার বাইরে একমাত্র স্পেনের কমিউনিষ্ট-অনুগত মন্ত্রিসভাতেই কমিউনিষ্ট সদস্যদের জন্যে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকেই কমিউনিষ্ট দলগুলি এমন কি যে সমস্ত কমিউনিষ্ট দল দুর্ব্বল তারাও—সম্ভব হলেই মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছে। এইভাবেই ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে তারা।

এর থেকেই কমিউনিষ্টদের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপের অর্থ বুঝতে পারা যায়; ভবিষ্যতেরও একটা আভাষ পাওয়া যায় এর থেকে।

ইটালী ও ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট দল মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে তার পতন ঘটাতে সক্ষম। এই স্থায়ী বিপদের ফলেই ইটালীয় অথবা ফরাসী সরকার মস্কোর পক্ষে অপ্রীতিকর কোনও নীতি গ্রহণ

করতে পারছেননা। ফরাসী কমিউনিষ্টরা যদি বাধাপ্রদান করে তবে তা অতিক্রম করে ফ্রান্সের পক্ষে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীতে যোগদানের উপায় নেই। সে বাধা তারা দিচ্ছে, মস্কোও।

কমিউনিষ্ট দল ক্রমেই নানা দেশের মন্ত্রিসভায় যোগদান করছে। এর ফলে ঐ সমস্ত দেশের সরকারের পক্ষে এমন কোনও কথা উচ্চারণ করা বা এমন কোনও কাজ করা অসম্ভব ক্রেমলিনের কাছে যা অপ্রীতিকর। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন থেকে স্টালিনের কাছে এর দাম অনেক বেশী। স্টালিন চান যে তাঁর সমর্থকরা পরিষদ-ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে স্লোগান না দিয়ে পরিষদ ভবনের ভিতরে গিয়ে ভোটদানের ক্ষমতা লাভ করুক, তাতে তাঁর লাভ বেশী। মাঝে মাঝে অবশ্য কমিউনিষ্টরা দু-তরফাই কাজ চালায়।

কমিণ্টার্ণের অবসানের পর এখন কমিউনিষ্ট দলগুলির কার্য্যসূচীতে ক্ষমতালাভ এবং রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কাজ করে যাওয়াটাই প্রধান কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে; নীতিনিষ্ঠা বা সমাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি আনুগত্যকে এখন আর তারা ততটা দাম দেয়না। ভারতীয় কমিউনিষ্টরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে; যে চিয়াং কাইশেককে চীনা কমিউনিষ্টরা একদা ফ্যাসিষ্ট বলে গালিগালাজ করেছে তাঁরই সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত ছিল তারা; রুমানিয়ার রাজা মাইকেল হিটলারেব সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও রুমানীয় কমিউনিষ্টরা সেই মাইকেলের সঙ্গেই সহযোগিতা করেছে; রুমানিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব জর্জ্জ টাটারেস্কু হচ্ছেন ইউরোপের একজন চাঁই-প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁর সঙ্গেও রুমানীয় কমিউনিষ্টরা হাত মিলিয়েছিল। 'বামপন্থা' এবং 'লাল'—কমিউনিষ্টদের কাছে এ-দুটি কথার এখন আর কোনও দাম নেই। তারা হচ্ছে প্যান-স্লাভ, রুশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে, যেখানে কমিউনিষ্টরা সংখ্যাতেও বেশী নয়, অথবা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার মতো সামর্থ্যও যেখানে তাদের নেই, সেখানে মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেসের সদস্যদের উপরে যথাসম্ভব প্রভাববিস্তার করাই হচ্ছে তাদের নূতন কৌশল। সেইসঙ্গে সরকারী দপ্তর, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল, ধনতন্ত্রী সংবাদপত্র, বেতারকেন্দ্র, ট্রেড-ইউনিয়ন এবং—বিতাড়িত আর্ল ব্রাউডারের আমলে যেমন হয়েছিল—জাতীয় উৎপাদক সমিতিতেও তারা গোপনে প্রবেশলাভ করে। তাদের 'ভিতরে ঢুকে ভাঙন ধরানো'র প্রাক্তন নীতি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান এবং বামভাবাপন্ন মধ্যপন্থী দলগুলি সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠানের উপরে প্রভাববিস্তার করাই হচ্ছে তাদের বর্ত্তমান লক্ষ্য।

এই কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হ'লে, আর কিছু না হোক, সোভিয়েট সরকারের সমালোচনাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে তারা ঠেকিয়ে রাখ্তে পারে। বৃটিশ সরকার এবং বলা বাহুল্য, নিজেদের সরকারের উপর আক্রমণ চালিয়েই কমিউনিষ্ট-প্রভাবিত দলগুলির আনন্দ। মস্কো সম্পর্কে তারা কোনও উচ্চবাচ্য করেনা, তাদের কাছে মস্কো' হলো পবিত্র গাভীস্বরূপ।

'গোপনে প্রবেশলাভ'এর কৌশল ব্যর্থ হলে মার্কিণ কমিউনিষ্টদের মুখোস খসে যায়; তখন তারা রাশিয়ার মারাত্মক শত্রু মার্কিণ-ধনতন্ত্ররূপ দৈত্যকে বধ করতে ছোটে, অন্ততঃ কাদা ছুঁড়তে থাকে তার দিকে।

চমৎকার এক চাল দিয়ে বিব্রত হবার দায় থেকে স্টালিন উদ্ধার পেয়েছেন। কাগজে-কলমে কমিণ্টার্ণের অবসান ঘটানো হয়েছে; কোনও সরকারই আজ আর তার কার্য্যকলাপের জন্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করতে পারেননা। তা ছাড়া, বৈদেশিক

কমিউনিষ্ট দলগুলির যখন কাগজে-কলমে মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তখন তাদের কাছ থেকে মস্কো যে উপকার পেয়েছে, এখন তার থেকে ঢের বেশীই পাচ্ছে।

রাশিয়ার সাম্রাজ্যবিস্তারলিপ্সাকে চরিতার্থ করবার ব্যাপারে বৈদেশিক কমিউনিষ্ট দলগুলির যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

যুদ্ধের সময় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যে তুমুল মর্য্যাদার অধিকারী হয়েছিল তার ফলে প্রথম দিক্‌টায় ইউরোপ এবং এশিয়ার কমিউনিষ্ট দলগুলির কাজের খুব সুবিধে হয়ে যায়। হিটলারকে পরাজিত করবার ব্যাপারে রাশিয়ার কৃতিত্বই সর্ব্বাধিক। কিন্তু এ ব্যাপারে গ্রেট বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, অন্যান্য ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র এবং, লেণ্ড-লীজের ভিত্তিতে আমেরিকার কাছ থেকে রাশিয়া যে ঋণ পেয়েছিল তার কৃতিত্বেরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কমিউনিষ্টরা সে কৃতিত্বকে ছোট করে' দেখায়; নয়তো তাকে গ্রাহ্যই করেনা। ইউরোপ এবং এশিয়াবাসীরা সোভিয়েট সরকারের সামরিক শক্তির পরিচয় পেয়ে মোহিত হয়েছিল; স্বভাবতই তারা মনে করে নিয়েছে যে ক্ষমতাই হলো সারবস্তু।

রাশিয়া সম্পর্কে এই-যে ভালো ধারণা, রাশিয়ার দখলবহির্ভূত অঞ্চলেই এ-ধারণা অদ্যাবধি টিঁকে আছে।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, পশ্চিম ইউরোপ, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং অন্যত্র নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী পুস্তক, প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং বেতার-বিবৃতি মারফৎ "রাশিয়া-সম্পর্কিত তথ্য" প্রচার করা হয়। কিন্তু মধ্য ও পূর্ব্ব এশিয়ায় রুশ-সৈন্যদের আচরণের মধ্য দিয়েই রাশিয়া-সম্পর্কিত তথ্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। পথে বার হয়ে রুশসৈন্যরা সেখানে হাতঘড়ি ক্রয় করেছে, নয়তো চুরি করেছে। ইউরোপীয়দের কাছে এটা খুব ভালো ঠেকেনি।

লালফৌজের সমরসম্ভারের অপ্রাচুর্য্য, তাদের ঘোড়াটানা গাড়ী তাদের ছেঁড়া পোষাক এ-সবই ইউরোপ দেখেছে। সোভিয়েট সৈন্যদল কখনো কখনো বা গরু অথবা মহিষে-টানা গাড়ীতে করে এসে পৌঁছুতো। সোভিয়েট বাহিনীর বিভিন্ন পল্টন মঙ্গোল, আজেরবাইজান এবং প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের বসিন্দাদের নিয়ে গঠিত হওয়ায় ইউরোপীয়রা তখন 'এশিয়ার যাযাবর'দের কথাই বলাবলি করেছে।

বৈদেশিক বিজয়ীকে কেউই সুনজরে দেখেনা। লালফৌজের ক্ষেত্রে কিন্তু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। সংখ্যায় তারা ছিল মার্কিণ বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্যদের মোট সংখ্যার চাইতেও ঢের বেশী। যুদ্ধ-বিপর্য্যস্ত স্বদেশের বাইরে থেকেই তারা তাদের আহার্য্যের যোগাড় করেছে। মার্কিণ সৈন্যরা কিন্তু মাতৃভূমি থেকেই খাদ্যদ্রব্য আনিয়ে নিতো; এমন কি জার্ম্মান এবং অষ্ট্রীয়দের জন্যেও তারা খাদ্যদ্রব্য আমদানি করেছে। মার্কিণ এবং ফরাসীদের সঙ্গে তুলনা করে পূর্ব্ব এবং মধ্য ইউরোপের জনসাধারণ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে, রাশিয়ার জীবনধারণের মান শোচনীয় রকম নীচু।

রুশ সৈন্যদের অবস্থা যারা দেখেছে তারা আরও দেখেছে যে, শুধুমাত্র বাস্তুচ্যুত পোল্ এবং বল্ট্রাই নয়, যথেষ্টসংখ্যক সোভিয়েট নাগরিকও রাশিয়ার চাইতে ইউরোপকেই পছন্দ করে বেশী। মার্কিণ সৈন্যদের গানের একটিই মাত্র ধুয়া ছিল—আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে চাই। ইংরেজ, ফরাসী, এমন কি চক্রশক্তিপক্ষীয় যুদ্ধবন্দীরাও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। অথচ হাজার হাজার রুশ, শুধু সৈন্যই নয়,—সোভিয়েট অঞ্চলের যে-সমস্ত নরনারীকে নাৎসীরা ক্রীতদাস করে' নিয়ে এসেছিল, তারাও চাইতো যে তাদের লুকিয়ে রাখা হোক। তাদের যাতে আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করতে হয় সেজন্যে তারা সর্ব্বপ্রকার কৌশলই অবলম্বন করেছিল। অথচ তাদের সেই স্বদেশকেই 'বিত্তহীনের স্বর্গ বলে' প্রচার করা

হয়েছে। ইয়াল্টা-সম্মেলনে স্টালিন দাবী করেছিলেন যে, এইসমস্ত অনিচ্ছুক সোভিয়েট নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে রুজ্‌ভেল্ট এবং চার্চ্চিল তাতে সম্মত হন। কাউকে কাউকে জোর করে' স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। তাতে কেউ কেউ আত্মহত্যা করবারও চেষ্টা করে। কোথাও কোনও গলদ ছিল নিশ্চয়ই।

লালফৌজের সৈন্যদের কিছু কিছু কার্য্যকলাপে ইউরোপের অধিবাসীরা বিস্মিত হয়ে যায়। ইউরোপের সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী, আদর্শবাদী এবং সাধারণ ভদ্র ব্যক্তিরা যে কতখানি অধীর আগ্রহে লালফৌজের প্রতীক্ষা করছিলেন তা আমি সহজেই বুঝতে পারি। বার্লিনের শ্রমিক-পল্লী এবং আরো নানা সহরের বসিন্দারা জানালা এবং বারান্দা থেকে লাল-পতাকা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সচরাচর আত্মরক্ষার তাগিদেই এ-রকম করা হয়ে থাকে। তারা কিন্তু সে তাগিদে তা করেনি; বলশেভিক বিপ্লব এবং বিপ্লবের যে সন্তানেরা নাৎসীদের কবল থেকে তাদের মুক্ত করেছে তাদের প্রতি আন্তরিক বন্ধুত্ববোধকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যেই তারা তা করেছিল। লালফৌজ কিন্তু বুর্জ্জোয়া-পল্লীর মত শ্রমিক-পল্লীতেও সমানে লুঠপাট এবং ধর্ষণ চালিয়ে যায়। সোভিয়েটের প্রাক্তন আদর্শ ছিল আন্তর্জ্জাতিকতা ও শ্রেণী-সংহতি। তার স্থলে এখন রুশ জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

সোভিয়েট সৈন্যরা অতঃপর চোরাকারবার চালাতে সুরু করে। অন্যান্য বাহিনীর সৈন্যরা এবং জার্ম্মান ও অষ্ট্রীয়রাও চোরাকারবারে মেতে ওঠে। একত্রে তারা মুনাফা পিটেছে ও দ্রব্যবিনিময় করেছে।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সৈন্যদের সঙ্গে লালফৌজের যোদ্ধাদের কিছুমাত্রও পার্থক্য দেখা যায়নি। তবে রুশ সৈন্যদের দ্রব্যলোভ ছিল তাদের চেয়ে ঢের বেশী। যে সমাজতন্ত্রী সমাজ ব্যক্তিমুনাফা

ও ব্যক্তিপ্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়ে 'নতুন মানুষ' গড়ে তুলেছিল, লালফৌজের মধ্যে যাঁরা সেই সমাজের প্রতিনিধিদের দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

তারপরেই ইউরোপ দেখতে পেল যে কলকারখানা, গবেষণাগার গুদাম, শস্যক্ষেত্র এবং বাড়ীঘরের উপরে ক্রেমলিন তার দীর্ঘবাহু, তার কঠিন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে; মালগাড়ীতে করে সে সেই লুণ্ঠিত মালপত্র রাশিয়ায় চলান করে দিচ্ছে। শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলকেই লুণ্ঠন করা হলো। শুধুমাত্র শত্রুরাষ্ট্রই নয়, সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানের সদস্য পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং চীনের উপরেও লুঠপাট চালানো হয়েছে। অষ্ট্রীয়ায় ইহুদী এবং অন্যান্য নাৎসীবিরোধীদের কাছ থেকে নাৎসীরা যে সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল সোভিয়েট সরকার তাও বাজেয়াপ্ত করে নিলেন।

পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লোভিয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে লালফৌজের অফিসাররা বিরাট বিরাট কাহিনী গড়ে তুললেন। অগপুর গোয়েন্দারা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। রুশ এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সরকারকে মস্কোর সঙ্গে নানাপ্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা হলো। এই-ভাবেই সেইসমস্ত দেশের অর্থনীতির মূল বিষয়গুলিকে মস্কোর নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে। কমিউনিষ্টরা সর্ব্বত্রই হয় সরকারীভাবে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করলো, আর নয়তো পর্দ্দার আড়াল থেকে সূতো টানতে লাগলো তারা।

ব্যাপার দেখে মনে হলো অর্দ্ধ-ইউরোপ যেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়ে গেছে। ইউরোপের এই অর্দ্ধাংশের জনসংখ্যা হলো ১৫ কোটি।

শুধুমাত্র এই একটি কারণেই সঙ্ঘর্ষ বেধে উঠতে পারতো।

ক্রেমলিন তা বুঝতে পেরে অবস্থার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌বার জন্যে আগে থাকতেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

রাশিয়ানরা তাদের এলাকাভুক্ত অঞ্চলকে প্রথম দিক্‌টায় বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রাখে; মাসের পর মাস তা সেইভাবেই ছিল। পরে, কদাচিৎ কোনও সাংবাদিক অথবা কোনও সাংবাদিক-দলকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। তবে, সে-সফর সম্পূর্ণই নিয়ন্ত্রিত। তাড়াতাড়ি করে' কয়েকটি অঞ্চল তাদের দেখে নিতে দেওয়া হতো। বৈদেশিক কূটনীতিক, সামরিক বিভাগীয় লোকজন এবং সাংবাদিকদের গতিবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে; স্বাধীনভাবে সেখান থেকে তাঁদের তারবার্ত্তা পর্য্যন্ত পাঠাতে দেওয়া হয়নি। বৈদেশিক সরকাররা তাঁদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যে-সমস্ত বিবরণ পেয়েছেন মাঝে মাঝে তাতে দেখা গিয়েছে যে, ঐ অবরুদ্ধ এলাকায় মস্কোর আচরণ খুবই আপত্তিজনক। অথচ, পাছে সোভিয়েট সরকার ক্ষুণ্ণ হন, সেই আশঙ্কায় সে-সমস্ত বিবরণ চেপে যাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার মাঝে মাঝে পরস্পরের সম্পর্কে বড় বেশী শিষ্টতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাতে সত্যকেই বলি দেওয়া হয়, জনসাধারণও প্রকৃত তথ্য জান্‌তে পারেনা।

সত্য-সংবাদকে যথাসম্ভব গোপন করে রাখা হয়, মাঝে মাঝে তার থেকে ছিঁটেফোঁটা প্রকাশ হয়ে পড়ে মাত্র। জনমতের উপরে এর প্রতিক্রিয়া হয় অনেকখানি। রুশ-এলাকাকে যে বহির্জ্জগৎ থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে বিশ্বজন তা জানে, কিন্তু ভুলেও যায়। গ্রীস অথবা ইন্দোনেশিয়াতে কোনও কিছু একটা ঘট্‌লে আর কথা নেই; কনষ্টিট্যুশন স্কোয়ারে কী ঘটলো, কেমন করে জনতা সড়ক পার হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে চড়াও হলো এবং কে কী বল্লেন সংবাদপত্র এবং বেতার মারফৎ অম্নিই জনসাধারণকে তার বিস্তারিত

বিবরণ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড অথবা উত্তর ইরাণে অনুরূপ কোনও কিছু ঘটলে দেখা যাবে যে, চতুর্দ্দিকে অখণ্ড নীরবতা। ফলে এই হয় যে, যেহেতু গ্রীস ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য দেশে সংবাদ সম্পর্কে কোনও কড়াকড়ি নেই অতএব এই সমস্ত দেশের ঘটনাবলী নিয়েই বিশ্ববাসীর মন ও চেতনা তোলপাড় হতে থাকে। তা হওয়া উচিতও। কিন্তু রুশ-প্রভাবাধীন এলাকা ওদিকে অমসাবৃত হয়েই পড়ে থাকে, তা নিয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্য করেনা। রাশিয়ার সমর্থকরা এ অন্ধকারকে গাঢ়তর করে' তোলেন। যে সমস্ত দেশে রাশিয়া অন্যায় করে চলেছে সেখান থেকে সকলের লক্ষ্যকে বিচ্যুত করে', যে সমস্ত দেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের অপরাধ ঘটেছে সে সমস্ত দেশের প্রতিই তাঁরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই রকমভাবে স্পেন এবং আর্জ্জেন্টিনাই যেন একদা সমগ্র পৃথিবীর লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছিল। ওদিকে রাশিয়া এবং তার ইউরোপ ও এশিয়ামহাদেশস্থ সাম্রাজ্য ততক্ষণে সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেছে।

বৈদেশিক শাসন এবং একনায়কত্বকে যারা মেনে নিতে সম্মত হয়নি নিশ্ছিদ্র পর্দ্দার আড়ালে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ এবং তাদের সাহায্যকারীরা তখন তাদের উৎসাদনকার্য্যে নিরত। মাঝে মাঝে পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের ঘরোয়া শত্রুদের খণ্ড যুদ্ধের ছিটেফোঁটা খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো। মাঝে মাঝে পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে এত বেশী মেতে উঠতেন যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র-দপ্তর থেকে তার প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

তা সত্ত্বেও গণতন্ত্রী কামডানষ্টাবরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজতন্ত্রীদের উচ্ছেদপর্ব্ব সমানেই অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। পশ্চিম

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে যাঁরা প্রগতি ও স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করেন, ইউরোপের অপর অর্দ্ধাংশে তেমন লোকদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, নয়তো এখনও করা হচ্ছে। ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও উৎপীড়নবিরোধীদের প্রথম দফা উচ্ছেদপর্ব্ব নাৎসীরাই সমাধা করেছিল ;* অবশিষ্টাংশকে বলশেভিকরা হত্যা করেছে। এই কুৎসিৎ হত্যাপর্ব্ব যাতে ঠিকমতো সমাধা হতে পারে, তার জন্যে ফিনল্যাণ্ড থেকে আলবানিয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কমিউনিষ্টরা তাদের নিজেদের লোককে স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা করেছে ; সচরাচর তাঁরা সব হচ্ছেন মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কমিণ্টার্ণের অফিসার। স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের হাতে গোয়েন্দা-বিভাগেরও ভারার্পণ করা হয়।

রাশিয়ার মতোই রুশপ্রভাবাধীন অঞ্চলেও সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ এবং কমিউনিষ্টরা পুলিশী তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ প্রচারকার্য্যও চালিয়ে যান। ক্ষেত্রবিশেষে পুলিশের চাইতে প্রচারের ক্ষমতাই বেশী। সাহসী পুরুষেরা তলোয়ারকে পরোয়া না করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মনই এই অবাধ, স্থায়ী, একটানা, ধূর্ত্ত শব্দসম্বলিত একতরফা প্রচারকার্য্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে।

নীতি অনুসারেই প্রচারকার্য্য চালিয়ে যাওয়া হয়। সোভিয়েট-প্রভাবাধীন অঞ্চলে সোভিয়েটের নীতি কি? ক্রেমলিন কি জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যবিস্তারনীতি গ্রহণ করেছে? না-কি এশিয়ায় কমিউনিষ্ট-প্রভুত্ব বিস্তারের সূচনা হিসেবে সে এক কমিউনিষ্ট ইউরোপ গড়ে তুলছে?

তার উত্তর হলো, স্টালিনের রাজনৈতিক চাতুর্য্য এত বেশী যে, নির্দ্দিষ্ট কোনও একটা পথকে আঁকড়ে ধরে থাকবার মতো লোক তিনি নন। সুবিধামতো পথ পরিবর্ত্তন করাই তাঁর স্বভাব, তার

উপরে তিনি আবার বিবেকবোধেরও ধার ধারেন না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে তিনি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে থাকেন। উপায়গুলি যদি পরস্পরবিরোধী হয় তবে আরো ভালো; তাতে নানা মতাবলম্বী সমর্থক জুটে যায়, সমালোচকরাও হতভম্ব হয়ে পড়েন।

স্লাভদের কাছে গিয়ে মস্কো-কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, রাশিয়া হলো তাদের বড় ভাই, টিউটন-শত্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়াই হচ্ছে তাদের রক্ষাকর্ত্তা। সোভিয়েট প্রচারযন্ত্রে নিয়মিতভাবে এই স্লাভ-বনাম-টিউটন সুরটি বাজিয়ে যাওয়া হয়।

চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার জনসাধারণ এবং বহু পোলকেও রাশিয়াই হিটলারের হাত থেকে মুক্ত করেছে, সেজন্যে তারা রাশিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। জার্ম্মানীর পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু অনেকের মনে আশঙ্কা বর্ত্তমান যে, আবার তার অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। এই আশঙ্কার ফলে রাশিয়ার সুবিধাই হয়ে গেছে। জার্ম্মানীর পুনরভ্যুত্থানের ব্যাপারটা যেখানে একটা সম্ভাবনামাত্রই, রুশপ্রভুত্বটা সেখানে একটা বাস্তব ব্যাপার। সর্ব্বক্ষণের জন্যে তাদের উপরে এই গুরুভার প্রভুত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া ফিনল্যাণ্ড, বাল্টিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, রুমানিয়া, হাঙ্গারী, অষ্ট্রীয়া এবং আলবানিয়ার জনসাধারণ স্লাভ নয়। পোলরা স্লাভ বটে, কিন্তু চিরদিনই তারা দুরন্তভাবে রাশিয়াকে বাধা দিয়ে এসেছে। পোলরা স্লাভ এবং ক্যাথলিক; পরিণামে এই প্যান-স্লাভবাদই পূর্ব্ব ইউরোপকে বিভক্ত করে ফেলবে।

প্যান-স্লাভবাদ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়াশীল জাতিগত আন্দোলন; সংস্কারবিরোধী রুশ ধর্ম্মসমাজ তার সমর্থক। এ আন্দোলন প্যান-জার্ম্মানবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ব্ব ইউরোপের উদার-নৈতিক ও সমাজতন্ত্রীরা এ আন্দোলনকে ঘৃণা করে। ইউরোপের

ইহুদীসমাজের কাছে প্যান-জার্ম্মানবাদের মতোই, প্যান-স্লাভবাদটাও বরাবরই একটা আতঙ্কজনক ব্যাপার।

তাছাড়া মস্কোর এই প্যান-স্লাভবাদী কার্য্যকলাপের ফলে এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে যে, স্লাভ 'মাতা-রাশিয়া'কে কেন্দ্র করে' পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়াকে নিয়ে সরাসরিভাবে অথবা ছদ্মবেশে একটি গোষ্ঠী গঠন করা হতে পারে। তাতে তাদের পৃথক জাতীয় সত্তার অবসান ঘটবে।

এই আশঙ্কার প্রতিষেধক হিসেবে মস্কো তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লালফৌজ যখন এস্তোনিয়ার মধ্য দিয়ে পোল্যাণ্ডের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে, সোভিয়েট-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ষোলটি রিপাবলিককে তখন নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী গঠনের এবং নিজ নিজ বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রাখবার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল; অধিকন্তু ইয়াল্টা-সম্মেলনে স্টালিনের দাবী মেনে নিয়ে রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল সোভিয়েট ইউক্রেনিয়ান রিপাবলিক এবং সোভিয়েট হোয়াইট রাশিয়ান রিপাবলিককে (এরা এখন আর নেব্রাস্কার চাইতে এতটুকুও বেশী স্বাধীন নয়) সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেন।

ইউক্রেন, হোয়াইট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিরা আন্তর্জ্জাতিক সমস্ত সভাতেই রাশিয়ার পক্ষে ভোটদান করে থাকেন; তাঁরা যদি ভেবে থাকেন যে, কূটনৈতিক ব্যাপারে তারা স্বাধীন তবে তাঁরা নিদারুণ মূর্খতারই পরিচয় দেবেন। পূর্ব্ব ইউরোপের রাজনীতিকদের মধ্যে সেরকম মূর্খতা দুর্লভ। সোভিয়েট প্রভাবাধীন অঞ্চলের কোনও সরকারী কর্ম্মচারী যদি ক্রেমলিনের আদেশ পালনে অনিচ্ছুক থাকেন, রুশ-কর্ত্তৃপক্ষ অথবা কমিউনিস্টরা সহজেই তাঁকে সরিয়ে দিতে পারেন।

মস্কো জানে যে, এ অবস্থায় রুশবিরোধী জাতীয়তাবাদী

মনোভাবই উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার হয়। ব্যাপার বুঝে কমিউনিষ্টরাই তাই আজ বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধ্বজাধারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চেকোশ্লোভাকিয়ার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৬ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সফর করে এসে মরিস হিণ্ডাস্ লিখছেন, "যা-কিছুর মধ্যেই জার্ম্মানীর নামগন্ধ রয়েছে চেক্-কমিউনিষ্টরা তার সবকিছুই বর্জ্জন করতে চায়; এ ব্যাপারে তাদের আর জুরি নেই। বীঠোফেনের সঙ্গীত এবং শিলারের কাব্যকেও তারা বর্জ্জনীয় বলেই গণ্য করে। মালিকশ্রমিকনির্ব্বিশেষে সুদেতেনল্যাণ্ড থেকে সমস্ত জার্ম্মানকেই তারা বিতাড়িত করতে দৃঢ়সংকল্প। অন্ততঃ কারো থেকেই এ বিষয়ে তারা কিছুমাত্র কম উৎসাহী নয়...।" জার্ম্মানীর কমিউনিষ্টরা আবার জার্ম্মান জাতীয়তাবাদী। ১৯৪৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন্'-এ মার্গারেট হিনিগিন্‌স্-প্রেরিত একটি তারবার্ত্তা প্রকাশিত হয়েছে। এটি তিনি পাঠিয়েছেন জার্ম্মানী থেকে। তাতে তিনি জার্ম্মানীর রুশ-অধিকৃত এলাকায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের উল্লেখ করে বলেছেন, "কর্ণেল সেরজাই তুলপানভ নামক একজন রুশ মুখপাত্র সেখানে সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ দেন। কমিউনিষ্টরা এবং তিনি যে-সমস্ত আবেদন জানালেন তাতে জার্ম্মানদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকেই উস্কিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।" ইউরোপীয় বিজয়-দিবস থেকে আমি জার্ম্মান সংবাদপত্রগুলি পড়ে আসছি; সেখানেও এ-দুটি বিবৃতি সমর্থিতই হয়। ওদিকে ফরাসী কমিউনিষ্টরা আবার জার্ম্মানবিরোধী আন্দোলন চালায়।

এই-যে চেক্‌দের মধ্যে জার্ম্মানবিরোধী জাতীয়তাবাদ, জার্ম্মানদের মধ্যে জার্ম্মান জাতীয়তাবাদ এবং ফরাসীদের মধ্যে ফরাসী জাতীয়তাবাদ

উস্কিয়ে দেওয়া হচ্ছে—ইউরোপে শান্তিপ্রতিষ্ঠার এই কি পথ? প্রত্যেকটি দেশের জাতীয়তাবাদী দলগুলিকে যাতে হাত করা যায় এবং তারা যাতে না রুশবিরোধী হয়ে ওঠে তারই জন্যে রাশিয়ানরা এই আপত্তিজনক পথ অবলম্বন করেছে। ত্রিয়েস্তে দখলের ব্যাপারে ইটালীয় কমিউনিষ্টদল টিটোর পক্ষাবলম্বন করেছিল, এই ইটালীবিরোধী মনোভাবের ফলে তাদের সমর্থক-সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা আবার ডিগবাজী খায়। ত্রিয়েস্তের ব্যাপারে ইটালীয় কমিউনিষ্টদের সহযোগিতালাভের চাইতে ইটালীয় কমিউনিষ্টদলকে শক্তিশালী করে তোলাতেই মস্কোর স্বার্থ বেশী।

মস্কোর পররাজ্যদখললিপ্সার ফলে পূর্ব্ব-ইউরোপের জাতীয়তাবাদী চেতনা খুবই আহত হয়েছিল; ঈপ্সিত ভূমিখণ্ড দান করে মস্কো সেই আহত স্থানের উপরে প্রলেপ লাগিয়ে চলেছে। পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মান-অঞ্চল দেওয়া হলো। যুগোশ্লাভিয়া দাবী করছে যে, গ্রীস এবং ইটালীর কাছ থেকে ম্যাসিডোনিয়া এবং ত্রিয়েস্তেকে খসিয়ে নিয়ে ও দুটি অঞ্চলকে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যোজনা করতে হবে। বুলগেরিয়াও তুর্কী ভূখণ্ড চায়। মানচিত্রের উপরে এই সমস্ত অদলবদলের ফলে সোভিয়েট-প্রভাবাধীন অঞ্চলে সীমানা আরও বিস্তৃত হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে রাশিয়া আবার সেই প্রাচীন জাতীয়তাবাদী রাজ্যবিস্তার-নীতিরই ধ্বজাধারী হয়ে উঠেছে। রাশিয়া কী কেড়ে নিচ্ছে সেদিকে তখন আর কারো নজর থাকেনা, রাশিয়ার সহযোগিতায় কী পাওয়া যেতে পারে সেইদিকে গিয়েই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এই সীমানাবিরোধের মধ্যে যে-কোনও বল্‌কান রাষ্ট্রই জড়িত থাকুক না কেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তার সাহায্যলাভের প্রয়োজন হবে। ক্রেমলিন তার প্রভুত্বের বড়িটির উপর চিনি মাখিয়ে দিচ্ছে; এইভাবেই সে তার প্রভুত্বের সীমানাকে

বাড়িয়ে যেতে চায়। ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় একটা স্থায়ী অশান্তিসৃষ্টিই এর পরিণতি।

একনায়কত্বের পক্ষে কখনো কখনো সকলের মনোযোগকে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে; বৈদেশিক সাফল্যই তাকে খাড়া করে' রাখে। চক্রশক্তিপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির কার্য্যকলাপের পিছনে এরই তাড়না বর্ত্তমান; একটা উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে হিটলার একে নীতি হিসেবেই দেখিয়েছেন। ১৯৪০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফ্র্যাঙ্কোর পররাষ্ট্র-সচিব সেরানো স্থনার বার্লিনে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ-সম্পর্কে রাষ্ট্র-দপ্তর থেকে প্রকাশিত যে দলিল পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, সেরানো স্থনারের প্রতি অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে হিটলার বলেছিলেন, "স্পেনকে এখনও হয়তো তার ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে বিব্রত হতে হচ্ছে; বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জন করে' সে সেই ঘরোয়া সমস্যা উত্তীর্ণ হোক। ইতিহাসে এরকম নজীর রয়েছে...।"

অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং জনসাধারণের অসন্তোষের প্রতিষেধক হিসেবে একনায়করা জাতীয়তাবাদের জীবাণু ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হন। সে জাতীয়তাবাদ রাজ্যবিস্তারের নেশা জাগায়। ফলে যে আন্তর্জ্জাতিক অশান্তির সৃষ্টি হয় পুলিশী সরকারের তাতে সুবিধেই হয়ে যায়। তাঁরা তখন সরকারকে সমর্থন করতে এবং দেশকে সশস্ত্র ও শক্তিশালী করে' তুলবার জন্যে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাতে পারেন।

নিজেকে কায়েম করবার এবং কাজ হাঁসিলের উদ্দেশ্যে একনায়কত্ব-বাদী সরকার বৈষয়িক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা না করে' উগ্র জাতীয়তাবাদ

পরিবেশন করেন, রুটির বদলে বন্দুক। একনায়কশাসিত রাষ্ট্রগুলি শত্রুর অস্তিত্বের কথাই জোরগলায় প্রচার করে গেছে; বস্তুতঃ শত্রুর অস্তিত্বই তাদের এক পরম সম্পদ।

একনায়কেরা একনায়কদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মস্কোর ইটালীয় দূতাবাসের উপরে স্থায়ী নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল যে, স্টালিনের রাজনৈতিক কৌশলগুলি সম্পর্কে মুসোলিনীকে যেন তথ্য সরবরাহ করে যাওয়া হয়। যুগোশ্লাভরা চীৎকার করে—"টিটো। টিটো। টিটো!", ইটালীয়রা চীৎকার করে—"ডিউস্! ডিউস্! ডিউস্!", আর স্প্যানিয়ার্ডরা চীৎকার করে—"ফ্র্যাঙ্কো! ফ্র্যাঙ্কো। ফ্র্যাঙ্কো!" গুরুত্বপূর্ণ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই পূর্ব্ব ইউরোপীয় একনায়কশাসিত রাষ্ট্রগুলি আজ মস্কোর ছাঁচেই নিজেদের ঢালাই করে চলেছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকেও তাঁদের নিজেদের শাসনব্যবস্থার ছাঁচে ঢালাই করে নিতে চেষ্টা করেন। স্টালিনের বিশ্বাস—১৯৪৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একথা তিনি বলেছিলেন—যে, "অ-সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থা যে জীবনের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ একথা প্রমাণসিদ্ধ। সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে যে-কোনও অ-সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর সুচারুভাবেই সমাজবিন্যাস সম্ভব হয়েছে।" সম্প্রতি যে সমস্ত দেশ তাঁর প্রভুত্বাধীন হয়েছে স্বভাবতই সেই সমস্ত দেশেও সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাই স্টালিনের লক্ষ্য।

সবসময়েই যে তা দ্রুত সম্ভব হয় তা নয়। ধীরে ধীরে তাকে সম্ভব করে' তোলা যায়। কোন দেশে কতখানি তাড়াতাড়ি স্টালিনের সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা যাবে সেটা সেই দেশ এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও তার রাজনৈতিক ভাবনাধারণার উপরেই নির্ভরশীল। ক্ষেত্রবিশেষে তার তারতম্য হয়।

টিটো মস্কো থেকে তালিম নিয়ে এসেছেন। একদলীয় একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। তাঁর রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্র। অগপুর মতোই সেখানে একটি গোয়েন্দাবিভাগ রয়েছে। ইয়াল্টা-সম্মেলনে স্টালিন, চার্চ্চিল এবং রুজভেল্ট যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তদনুসারে টিটোকেও তাঁর মন্ত্রিসভায় অ-কমিউনিষ্ট এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলকে জায়গা করে' দিতে হয়েছিল। কয়েক মাস পরেই কিন্তু অ-কমিউনিষ্টদের বাতিল করে' দেওয়া হয়।

টিটোর সহযোগিতায় প্রতিবেশী-রাষ্ট্র আলবানিয়ার একনায়ক হোক্সাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

রাদেস্কুকে প্রধানমন্ত্রী করে' রুমানিয়ায় যে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছিল সোভিয়েট সরকারের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব ভিসিন্স্কি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে' তার পতন ঘটান। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বুখারেষ্টে গিয়েছিলেন। অতঃপর সেখানে তিনি তাঁর পছন্দসই এক নূতন মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা করলেন। 'কৃষক দল'ই হলো রুমানিয়ার বৃহত্তম্ দল; কিন্তু রুশ ও কমিউনিষ্ট আধিপত্যের বিরোধী বলে' মন্ত্রিসভা থেকে তাদের বাদ দেওয়া হলো।

বুলগেরীয় সরকার "ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্ট"-এর প্রভুত্বাধীন। লাইপজিগ্ রাইখ্‌ষ্ট্যাগ ট্রায়ালখ্যাত এবং প্রাক্তন কমিণ্টার্ণ-প্রধান জর্জ্জ ডিমিট্রফ্‌ই হচ্ছেন তার সংগঠক ও নেতা। বহুদিন তিনি মস্কোতে কাজ করেছেন।

লালফৌজের অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গারীপ্রবেশের পরে সেখানে যে মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা হয়, জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিষ্টদের সংখ্যাধিক্য না থাকা সত্ত্বেও, অষ্টীয়া ও হাঙ্গারীর সেই মন্ত্রিসভায় অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন কমিউনিষ্ট।

পোল্ সরকার প্রথমে গঠিত হয় মস্কোতে, অতঃপর তাকে লুবলিনে স্থানান্তরিত করা হয়—শেষ পর্য্যন্ত ওয়ারসতে; এ মন্ত্রিসভাতেও

কমিউনিষ্টদেরই সংখ্যাধিক্য। প্রথম প্রথম এ মন্ত্রিসভায় শক্তিশালী 'শ্রমিক দল' থেকে কোনও সদস্য গ্রহণ করা হয়নি। এ-দলের নেতা মিকোলাজিক পূর্ব্বে প্রবাসী পোল্ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মিত্রপক্ষের চাপের ফলে মিকোলাজিককে পরে ওয়ারস-মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়। দল ও দেশের সেবা করতে পারবেন বলেই তিনি আশা করেছিলেন; তিনি আরো আশা করেছিলেন যে, কমিউনিষ্টরা ক্ষমতাচ্যুত হবে। তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব যে-কোনও পোল্ নেতার চাইতেই বেশী, রাজনৈতিক ক্ষমতা কিন্তু যে-কোনও নেতার চাইতেইকম।

ফিন্-মন্ত্রিসভাতেও মস্কো-থেকে চাপিয়ে দেওয়া কমিউনিষ্ট-সদস্য গ্রহণ করতে হয়েছে। যুদ্ধেব বাবদ মস্কো তার কাছ থেকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করে। মস্কো থেকে আদেশ দেওয়া হয় যে, উচ্চপদস্থ ফিন্ সরকারী কর্ম্মচারীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে; ফিন্ল্যাণ্ডের হয়ে রাশিয়াব বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার অপরাধে তাঁদের শাস্তিবিধানও করা হয়। অবশ্য, সোভিয়েট প্রভাবাধীন এলাকাভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় ফিনল্যাণ্ডকে অধিকতর পরিমাণেই স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

রাশিয়ার কক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহেব মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবক্ষায় সমর্থ হয়েছিল। সংখ্যানুপাতে সেখানকার কমিউনিষ্টরাও বড়বেশী প্রভাবশীল হয়ে উঠেছে।

জার্ম্মানীর রুশ-অধিকৃত এলাকায় কমিউনিষ্টরাই হচ্ছে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মেরুদণ্ড। এদের মধ্যে অনেকেই সোভিয়েটের তালিম নিয়ে এসেছেন।

নয়া রুশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র কমিউনিষ্টদেব ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো স্টালিনের প্রথম কাজ। স্টালিনকে তারা ক্ষমতা জোগায়। অতঃপর, অবস্থা বুঝে তারা কমিউনিজ্‌ম্ আমদানি করতে সুরু করতে পারে।

বহু রাষ্ট্রেই এইভাবে কমিউনিষ্ট-সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে সেখানকার জনসাধারণের যুদ্ধপূর্ব্ব রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিভাত হয়না। জনসাধারণ যে প্রাক্তন আদর্শ বর্জ্জন করে' কমিউনিষ্ট বনে' গেছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। অষ্ট্রীয়া এবং হাঙ্গারীর মত যেখানেই আবাধ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে যে কমিউনিষ্টরাই হলো সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল। এই নির্ব্বাচন রাশিয়া-বিরোধী গণভোটেরই তুল্য। ভোটদাতারা শুধুমাত্র স্বদেশী কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধেই ভোট দেয়নি, সোভিয়েট আধিপত্যের বিরুদ্ধেও দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট দখলদার-বাহিনীর হাতেই পূর্ণ কর্তৃত্ব রইলো। হাঙ্গারীর নির্ব্বাচনেও কমিউনিষ্টরা মোট ভোটসংখ্যার অতি অল্পাংশই লাভ করেছিল। তা সত্ত্বেও রাশিয়ার দৌলতে মন্ত্রিসভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রুশ-প্রভাবাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্টপ্রায় মন্ত্রিসভাগুলির পিছনে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন নেই; সুতরাং একনায়কত্ব, গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ এবং রুশ-বেঅনেটের সাহায্যেই তাদেরকে টিঁকিয়ে রাখতে হয়েছে।

সোভিয়েট-ক্ষমতা প্রসারের অনিবার্য্য অর্থই হলো ব্যাপকতর ক্ষেত্র জুড়ে' একনায়কত্বের প্রসার। জাতীয়তাবাদী, আদর্শগত, ধর্ম্মগত, রাজনৈতিক, শ্রেণীগত অথবা অর্থনৈতিক কারণে যাঁরা একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে চান, একনায়কত্ববাদী সরকার গুলী চালিয়ে তাঁদের হত্যা করেন, কারারুদ্ধ করে রাখেন অথবা নির্ব্বাসন দেন, আর নয়তো অন্যপ্রকারে উৎপীড়ন চালান তাদের উপরে। একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চল্‌ছে, চল্‌বেও। কিন্তু পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপে সোভিয়েট সরকারের ক্ষমতা যেরকম প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাতে বিনষ্ট না হয়ে পারেনা।

প্রায়ই বিস্ময়প্রকাশ করে' বলা হয়, "এমনিতেও তো ও-সমস্ত জায়গায় স্বাধীনতা অথবা গণতন্ত্রের বলাই ছিলনা। যা কিছু ছিল তার সবকিছুই সামন্ততান্ত্রিক এবং সেকেলে।"

এমন কথা অজ্ঞানতাপ্রসূত; যান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরাও এমন কথা বলে থাকেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে স্বাধীনতা বিরাজমান ছিল তা সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। দারিদ্র্য, জাতিগত বিদ্বেষ, দুর্নীতি, অযোগ্য রাজনীতিক, গেষ্টাপো-অগপুর মতো নৃশংস অত্যাচারকারী প্রহরীদল, জমিদারদের পর্য্যুষিত মুখ্যতন্ত্র এবং সেকেলে রাজতন্ত্র—এই সবকিছু মিলে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে' রাখে। তা সত্ত্বেও, যে-সমস্ত দেশে এখন সোভিয়েট সরকার ও কমিউনিষ্টদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্ব্বে সেখানে বিরোধীদলের অস্তিত্ব ছিল। হর্থিশাসিত হাঙ্গারীর সমাজতন্ত্রী দল খোলাখুলিভাবেই নাৎসীবিরোধী ছিল; এডমিরাল হর্থি ভূমিব্যবস্থা-সংস্কারের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা ভূমিব্যবস্থা-সংস্কারের পক্ষেই কথা বলে এসেছে। কোনও কোনও দেশের অবশ্য বিরোধী দলের প্রকৃত কোনই ক্ষমতা ছিলনা, সময়ে সময়ে উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের দমন করে' রাখা হতো। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রতিবাদ-ধ্বনি তুলে' পার্লামেন্টে নিজেদের অভিযোগও পেশ করতে পারতো তারা। প্রত্যেকটি দেশেই বিরোধীদলীয় সংবাদপত্র ছিল, সরকারের উপরে তারা আক্রমণও চালিয়েছে। ট্রেড-ইউনিয়ন ছিল। ধর্ম্মঘটও করা গিয়েছে। নাগরিকরা বাইরে গিয়ে আবার ফিরেও আসতে পারতো। সর্ব্বত্রই অবাধভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিদেশীরা, সংবাদপত্র ও পুস্তকপুস্তিকাও অবাধেই এসমস্ত দেশে প্রবেশলাভে সমর্থ হয়েছে। ইচ্ছে করলেই বহু নাগরিক তখন বৈদেশিক বেতার-বার্ত্তা শুনতে পেরেছে। সংস্কৃতির দিক থেকেও পূর্ব্ব-ইউরোপের অবস্থা তখন এমন কিছু আফগানিস্থানের মত ছিলনা।

১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং পূর্ব্ব ইউরোপের

অন্যান্য রাষ্ট্রে যে-সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল কখনো কখনো আমি তাঁদের সমালোচনা করেছি। উদারনৈতিক, প্রগতিশীল এবং সমাজতন্ত্রীরা আশা করেছিলেন যে, যুদ্ধের পরে পূর্ব্ব-ইউরোপের রুদ্ধস্রোত-গণতন্ত্র আরও বিকাশলাভ করবে; রাশিয়ার স্টালিন-মার্কা একনায়কত্বের হাতে সে-গণতন্ত্র একেবারে নিষ্পেষিত হোক্—এ তারা কখনোই চান্‌নি।

* গণতন্ত্রকে দমন করে' রাখা হ'লে যে-সমস্ত গণতন্ত্রী খুশী হন, গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হ'লে যাঁরা তার প্রতিবাদ জানাননা—তাঁরা যে কেমনতর গণতন্ত্রী তা আমার বুদ্ধির অগোচর।

আরো অনেকের মতো আমিও দাবী জানিয়েছিলাম যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা-প্রদান করা হোক্। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একনায়কত্বেরই রকমফের—তাকে আমি ঘৃণা করি কোনওরকম বে-আইনী কাজ না করা সত্ত্বেও, বৃটিশ-রাজ হাজার হাজার ভারতবাসীকে গ্রেপ্তার করে', কখনো কখনো বিনাবিচারেই, বছরের পর বছর তাঁদের কারারুদ্ধ করে রাখেন। বৃটিশ যুদ্ধ-বিমান থেকে মেসিনগান চালিয়ে ভারতবর্ষের বহু গ্রামকেই গোলাবিধ্বস্ত করা হয়েছে। দুর্দ্দিন ও রাজনৈতিক গোলযোগের সময়েই এ-রকম জঘন্য কাজ করা হয়, যেমন ১৯৪২ সালে করা হয়েছিল। তা-সত্ত্বেও সচরাচর স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, ভারতীয় সংবাদপত্র এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্ব্বক্ষণের জন্যই বক্তৃতা ও বিবৃতির মারফৎ বৃটিশ নীতি ও বৃটিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে' তুলে' সঙ্ঘবদ্ধভাবে সবকারের বিরোধিতা করে' এসেছেন। এমন কি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও তাঁরা তা করেছিলেন। পরাধীন দেশে একেও একরকম স্বাধীনতাই বলা যায়। এটা তেমন কিছুই সন্তোষজনক ব্যবস্থা নয় সত্যি, কিন্তু এরও একটা মূল্য আছে। যাঁরা কারারুদ্ধ হননি, স্বেচ্ছাচারী শাসকের উদ্যত মৃত্যুদণ্ডের

নীচে দাঁড়িয়ে দিনযাপন করতে হয়নি যাদের, তাঁরা সে-মূল্য বুঝবেননা। রাশিয়া অথবা রুশ-প্রভাবাধীন অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এ-স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। সম্ভব হলেই রাশিয়া তার নিজস্ব-ব্যবস্থাকে অন্যত্র চালান করে দেয়। সোভিয়েট সরকারের রপ্তানী মালের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হলো রুশ-দমননীতি। মস্কো গর্ব্ব করে যে, পূর্ব্ব ও মধ্য-ইউরোপ থেকে সামন্ততান্ত্রিক জঞ্জালকে সে ঝেঁটিয়ে দূর করেছে। কিন্তু তার জায়গায় সে যে রাজনৈতিক ও চিন্তাগত দাসত্বব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছে তা-ও, অন্ততঃপক্ষে সমানই নিন্দনীয়।

রাজনৈতিক জ্ঞান থেকে এটুকু অন্তত স্টালিন বোঝেন যে, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে কমিউনিষ্টরা যদি আরো ব্যাপকভাবে সমর্থক না পায় তাহলে শুধুমাত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করে' রুশ প্রভাবাধীন অঞ্চলকে বেশীদিন আয়ত্তে রাখা যাবেনা। এইজন্যেই পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপের যেখানে সম্ভব হয়েছে সেইখানেই রাশিয়ানরা বৃহৎ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় করে ফেলেছে, বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তিকেও ভাগ করে দিয়েছে তারা। এই ব্যবস্থায় তারা আন্তরিকভাবে আস্থাবানও। উৎপাদক শ্রেণী এবং বনিয়াদী জমিদারকুল স্বভাবতই কমিউনিষ্ট-বিরোধী; তাদের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যেই এইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিক এবং চাষীরা কিছু কিছু পরিমাণে জমি পেয়েছে—সুতরাং রাশিয়ান এবং কমিউনিষ্টদের প্রতি তারা কৃতজ্ঞ থাকবে।

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহুদিন পূর্ব্বেই জাতীয় সরকারের পক্ষে বিলাসী, উৎপীড়ক ও শোষণশীল জমিদারদের অধিকার খর্ব্ব করে' জমি-অন্ত-প্রাণ কৃষকদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ভূমিব্যবস্থার

সংস্কারসাধন করা উচিত ছিল। কিন্তু, যুদ্ধোত্তরকালে রাশিয়ার বিধানানুযায়ী ভূমিব্যবস্থার যে সংস্কারসাধন করা হলো তার প্রয়োগফল এবং হিতকারিতার কথা বড় বেশী বাড়িয়ে বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার কয়েকজন পুরাতন বন্ধুই 'নেশন' পত্রিকায় তা করেছেন। যে সমস্ত দেশে তা করা হয়েছে তার খবর এঁরা রাখেননা। বলশেভিক বিপ্লবের আদর্শগত ও রাজনৈতিক উপঘাতে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, বাল্টিক রাষ্ট্রত্রয়, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা হয়। হর্থিশাসিত হাঙ্গারীতে তা করা হয়নি, জার্ম্মানীতে তো নয়ই। (জার্ম্মানীতে গণতন্ত্রের অবসান ঘট্‌বার এটা অন্যতম কারণ।)

ফিন্‌ল্যাণ্ড, বাল্টিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া মূলতঃ জোতদারদের দেশে পরিণত হয়, নিজেদের জমি তাবা নিজেরাই চাষ করে নিত। কিছু কিছু জমিদারীও রইল বটে, তবে জাতীয় অর্থনীতির উপরে সেটা তেমন কিছু প্রভাববিস্তার করেনি। তুলনায় রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডেই জমিদারীর সংখ্যা ছিল বেশী। তা সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডের কার্জ্জন-লাইনের পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলে, অর্থাৎ আজকের খণ্ডিত পোল্যাণ্ডের, যুদ্ধপূর্ব্বকালেই সমগ্র জমির শতকরা প্রায় পঁচাশী ভাগ অংশ চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল।

লালফৌজ এসে কোনও দেশে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই, তা সে যে-ঋতুতেই হোক না কেন, স্থানীয় অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করে' সেখানকার ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা হতো। এর ফলে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও হাঙ্গারীতে গুরুতর খাদ্যসঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল, জনসাধারণকেও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনকালে জনসাধারণের দুঃখ

দুর্দ্দশাকে উপেক্ষাই করা হয়েছিল, এখানেও সে দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি বলশেভিকরা ভ্রূক্ষেপও করেনি। নতুন ব্যবস্থার পরিকল্পনাতেই তারা তখন বিভোর।

ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের ফলে পোল্যাণ্ডের চাষীরা বড়জোর আট একর করে' জমি পেয়েছিল, অনেকে পাঁচ একর করেও পেয়েছে। এব্যবস্থা তাদের দারিদ্র্যগ্রস্ত করে তোলে, কেউ কেউ বা পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর পোল-অধিকারভুক্ত নবলব্ধ অঞ্চলে পালিয়ে যায়। পোল্যাণ্ডের ভূমিব্যবস্থা-সংস্কার সম্পর্কে ১৯৪৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সোভিয়েটপন্থী লেখিকা আনা লুই স্ট্রং-এর একটি তারবার্ত্তা প্রকাশিত হয়। এটি তিনি মস্কো থেকে পাঠিয়েছিলেন। তাতে ভূমিবণ্টনব্যবস্থা বর্ণনা করে' তিনি লিখেছেন, "যে আটলক্ষ একর জমি পূর্ব্বে মাত্র এক হাজার মালিকের সম্পত্তি ছিল এই ব্যবস্থায় তাকে একলক্ষ পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে' দেওয়া হলো…।" দেখা যাচ্ছে প্রতি পরিবারের ভাগ্যে আট একর করে' জমি জুটেছে।

১৯৩৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর পোল অর্থসচিব কিয়াৎকোভস্কি পোল্যাণ্ডের সেম্ অর্থাৎ পার্লামেণ্টে বলেছিলেন যে, পোল্যাণ্ডের যে-সমস্ত চাষী পঁচিশ একর করে' জমির মালিক গড়পড়তায় বছরে তারা আট ডলার করে' খরচ করে। যে সমস্ত চাষী তখন মাত্র দশবারো একর করে' জমির মালিক জনসংখ্যার শতকরা ২১ ভাগ ছিল তারাই। তাদের তুলনায় প্রথম শ্রেণীকে লক্ষপতিই বলা যায়। মোট সংখ্যার শতকরা ৩৪ ভাগ চাষীর ভাগ্যে আরও কম পরিমাণ জমি জুটেছিল। কিয়াৎকোভস্কি বলেছিলেন, "জাতির অর্থ নৈতিক জীবনে এক কোটি লোকের কোনও স্থানই নেই", এরা আট একর কি তার চাইতে সামান্য কিছু বেশি পরিমাণ জমির মালিক। তাদের আয় এত সামান্য যে, শহরে তৈরী দ্রব্যাদি ক্রয় করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল।

যুদ্ধের মাঝখানেই তাহলে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করা হলো কেন?

আনা লুই স্ট্রং তার উত্তরে নানারকম যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি লিখছেন, "ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের ফলে লক্ষ লক্ষ চাষী যে শুধুমাত্র স্বেচ্ছায়ই পোল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হয় তাই নয়, তাদের পক্ষে যে পূর্ব্ব-প্রুশিয়া এবং পোমেরানিয়ার জমি পাওয়ার দরকার কেন সে সম্পর্কেও যুক্তিযুক্তভাবে তারা সচেতন হয়ে ওঠে ; সে যুক্তি হলো এই যে, পোল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি চাষীর পক্ষে অন্ততঃ বারো একর করে' জমি পাওয়া দরকার।" তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পোল্যাণ্ডে আট একর করে' জমি পেয়েও তাদের পোল্যাণ্ড ত্যাগ করতে হয়, জার্ম্মানীর সঙ্গে লড়াই করে' তার কাছ থেকে বারো একর করে' জমি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দরিদ্র দেশে ব্যষ্টিগত চাষ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে' জনসাধারণের মধ্যে কারও উন্নতিবিধান সম্ভব নয়, দেশকেও এতে সমৃদ্ধ করে' তোলা যায়না।

পূর্ব্ব এবং মধ্য ইউরোপে স্টালিন যেভাবে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেছেন সেপথে এই বিরাট অঞ্চলের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বিহিত করা সম্ভব নয়। শিল্পের অনগ্রসর অবস্থা এবং অর্থাভাবই হলো সেই সমস্যা। রাশিয়া তার বিহিত করতে নাচার। রুশ-প্রভাবাধীন এলাকাভুক্ত অঞ্চলে যে-সমস্ত পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় রাশিয়ার চাহিদাকে তা দিয়ে তৃপ্ত করা অসম্ভব। রাশিয়া থেকে কিছু কিছু কাঁচামাল অবশ্য সরবরাহ করা যেতে পারে, যথা পোল্যাণ্ডের কাপড়-কলগুলিকে তুলো যোগান দিতে পারে সে। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের জন্য খুব সম্ভবতঃ দশ পনের বছর, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে তার নিজের খাদ্য, বাসস্থান, পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক মূল-দ্রব্যাদির ঘাটতিজনিত সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকতে হবে। রপ্তানির সামর্থ্য রাশিয়ার নেই, সে গ্রহণই করে যাবে। অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী, রুমানিয়া এবং পোল্যাণ্ড থেকে সে তেল নিয়ে আসবে,

রুমানিয়া থেকে খাদ্যশস্য, হাঙ্গারী থেকে মাংস, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং আরও নানা জায়গা থেকে আরও নানা জিনিস।

এরই ফলে ইউরোপের রুশ-প্রভাবাধীন এলাকার পক্ষে বৈষয়িক সাহায্যের জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেনের মুখাপেক্ষী না হয়ে উপায় নেই, সে বৈষয়িক সাহায্য ব্যতিরেকে এসমস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব,—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়া আবার তাদের রাজনৈতিক বনিয়াদকেও শক্ত করে তোলা যাবেনা। আমেরিকা এবং ইংলণ্ডকে রুশ-এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কিনা মস্কোর সঙ্গে একটা ব্যাপক রাজনৈতিক মীমাংসার উপরেই তা নির্ভরশীল।

পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপের অর্থনৈতিক সমস্যার আশু কোনও বিহিত করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। জাতীয়তাবাদ থেকে রুশ-এলাকাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে যেসমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তারও সে একটা দ্রুত মীমাংসা করে' নিতে পারবেনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিটলারের জাতিবাদ, রুশ-অনুসৃত নীতি এবং প্যান-স্লাভবাদের ফলে সর্ব্বত্রই আজ জাতীয়তাবাদী মনোভাব উগ্রতর হয়ে উঠেছে। প্যানস্লাভবাদও জাতীয়তাবাদেরই একটা ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। এ অঞ্চলে চেক্‌রাই বোধ হয় সব চাইতে সভ্য জাতি, জাতিগতভাবে নিজেদের দেশকে পরিশুদ্ধ করে' তুলবার জন্য তারাও জার্ম্মান এবং হাঙ্গেরীয়দের তাড়িয়ে দিচ্ছে। সীমান্ত নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের মধ্যে যে কলহ চল্‌ত এখনও তা জীবিত। হাঙ্গেরীয়রা যাতে হিটলারের হ'য়ে লড়াই করে তার জন্যে ঘুষহিসেবে চক্রশক্তি ট্রানসিলভানিয়াকে তাদের হাতে অর্পণ করেছিল। রুমানীয়েরা রাশিয়ার হয়ে লড়াই করেছে, তার পুরস্কার হিসেবে স্টালিন আবার সেই ট্রানসিলভানিয়াকে নিয়ে রুমানীয়দের হাতে তুলে দিলেন।

ট্রানসিলভানিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় দুই-ই রয়েছে, সুতরাং হাঙ্গেরীয়রা এখন বিক্ষুব্ধ। বর্ত্তমান ব্যবস্থাটা কোনও সমাধান নয়, এটা একটা সাময়িক চাল মাত্র। যুদ্ধকালে যুগোশ্লাভিয়াতে ক্রোটরা সার্বদের হত্যা করেছিলে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে নিউ ইয়র্কের 'ফ্রি ওয়ার্ল্‌ড্‌' পত্রিকায় টিটোর একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "জার্ম্মানদের কার্য্যে উত্তেজিত হয়ে উস্তাচীরা (ক্রোট) লক্ষ লক্ষ সার্বকে হত্যা করে। মিহাইলোভিচের চেৎনীক্‌রা আবার জার্ম্মান ও ইটালীয়দের প্ররোচনায় হাজার হাজার ক্রোট্‌কে হত্যা করেছে...। যুদ্ধমান সার্ব জনসাধারণ ও বিপথচালিত চেৎনীক্‌দের (আমরা) বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, ক্রোট্‌মাত্রেই বজ্জাত নয়।" ক্রুদ্ধ সার্ব্‌ জনসাধারণ এ-যুক্তি মেনে নিয়েছে কিনা প্রশ্ন তা-ই। সার্ব্‌রা ক্রোটদের ক্ষমা করেনি, ক্রোট্‌-টিটোকেও না, টিটোর সমর্থক মস্কোকেও না। সার্বরা হলো যুগোশ্লাভিয়ার মেরুদণ্ড, সেখানকার অধিবাসীদের অর্দ্ধাংশ হলো তারাই। ক্রোট্‌রাও সার্ব্‌দের ক্ষমা করবে বলে' মনে হয়না। সার্ব্‌দের বিরুদ্ধে মস্কোপন্থী ক্রোটদের শক্তিশালী করে' তুলবার জন্য মস্কো আজ যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও ম্যাসিডোনিয়াকে একত্রিত করে' এক বিরাট 'দক্ষিণ শ্লাভ ফেডারেশন' গড়ে' তুল্‌তে চায়। এ-যোগাযোগের ফলে সার্ব্‌দের সংখ্যা সার্ব্‌বিরোধীদের চাইতে বেড়ে যাবে। এটাও জাতীয় সমস্যার কোনও সমাধান নয়। ক্ষমতা হস্তগত করবার পক্ষে এটা একটা চমৎকার চাল সন্দেহ নেই, কিন্তু যুদ্ধ ও উৎপীড়নই হচ্ছে তার পরিণতি।

সীমান্তব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, নৃশংস বিতাড়নপর্ব্ব কিংবা জাতিতে জাতিতে গোঁজামিল দিয়ে ইউরোপের জাতিগত সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। একমাত্র আন্তর্জ্জাতিকতাই সে সমস্যার একটা বিহিত করতে পারে। মস্কো কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদেরই বীজ ছড়িয়ে

দিচ্ছে; সে আজ জাতীয়তাবাদী কার্য্যকলাপে লিপ্ত। হয় জাতীয়তাবাদী বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষ, অথবা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন, অথবা শেষপর্য্যন্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আত্মবিলুপ্তি—এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে স্টালিন কখনও ব্যাপক কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেননা। জোড়াতালি দিয়ে কাজ করতেই তিনি পছন্দ করেন বেশী।

পূর্ব্ব-ইউরোপ, জার্ম্মানী এবং এশিয়ার ভবিষ্যৎ অশান্তিপূর্ণ; সেই অশান্তির সময়ে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে মস্কো এমন একটা বিশ্বাসযোগ্য হাতিয়ার চায়। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে দিয়ে সে উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব নয়, কারণ কোনদিনই তারা ব্যাপক জনসমর্থন পায়নি। সঙ্কটের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌বার জন্যে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। জাতীয়তাবাদীদের প্রলুব্ধ করবার জন্যে বুলগেরিয়ায় তাঁরা এক "ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্ট"-এর সৃষ্টি করেছেন, ইরাণে আবার এক "গণতন্ত্রী" দলের জন্ম দিয়েছেন তাঁরা। (যুগপৎ একনায়ক এবং গণতন্ত্রীদের হাতে "গণতন্ত্রী" শব্দটির কী অপপ্রয়োগই না ঘটছে!) অন্যত্র তাঁরা "পিপ্‌ল্‌স্ পার্টি" গঠন করেন। এ-সমস্ত ছদ্মবেশ ধরে ফেল্‌তে কারও কষ্ট হয়না।

ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট অথবা সোস্যালিষ্ট দলগুলির সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলগুলির মিলনের মধ্যেই ক্রেমলিনের প্রধান আশা নিহিত। ক্রেমলিন আশা করছে যে, রাশিয়ার সাহায্যে পুষ্ট হ'য়ে উঠে দুর্ব্বল কমিউনিষ্টরাই তখন অন্যান্য দলগুলিকে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে পারবে।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট অথবা সোস্যালিষ্টদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিষ্টদের এক তিক্ত বিরোধ চলে আস্‌ছে। কয়েক দশক আগে রাশিয়াতেও বলশেভিক এবং মেনশেভিকদের মধ্যে এরকম বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। বলশেভিকরা হিংসাত্মক পথে

সর্ব্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন; অন্যদিকে মেনশেভিকরা হিংসাত্মক কার্য্যকলাপকে বর্জ্জন করে' গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় কামনা করতেন। জার্ম্মানীতেও এই বিরোধের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ধরেছিল, তাতে হিটলারের অভ্যুত্থানের পথই পরিষ্কার হয়ে যায়। জার্ম্মান পার্লামেণ্টে বহুবারই কমিউনিষ্টরা নাৎসী-ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন; তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এতে করে' তাঁরা লাভবান হবেন। একই কারণে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধেও তাঁরা এক অবিশ্রান্ত অভিযান চালিয়েছিলেন। পরিণামে এতে নাৎসীদেরই সুবিধে হয়ে যায়; কমিউনিষ্ট এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাট—এই দু-দলকেই তারা চূর্ণ করে।

জার্ম্মানীর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ছিলেন মধ্যপন্থী। ১৯১৮ সালে জার্ম্মানীর সমাজবিন্যাসের প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটাবার তাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন, সে পরিবর্ত্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত জমিদারকুল ও সামরিক মনোভাবাপন্ন শ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হতো। কিন্তু মৌলিক সংস্কারসাধনের ব্যাপারে তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। তাঁদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাহস ও প্রতীতির অভাব ঘটেছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের শ্রেণীশত্রুদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, এঁরাই আবার হিটলারকে ক্ষমতাশালী করে' তোলেন।

জার্ম্মানীর দুটি শ্রমিকদলের ইতিহাসই বেদনাময়।

১৯৩৫ সালে নাৎসী অভ্যুত্থানের ফলে রাশিয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়ে; সে বুঝতে পারে যে, গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার আশু মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন। মস্কো থেকে কমিউনিষ্ট দলগুলিকে আদেশ দেওয়া হয় যে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলির সঙ্গে তারা যেন ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টা করে। কমিউনিষ্টরাও এই আদেশ অনুসারে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। অথচ তার কিছু আগেই এই কমিউনিষ্টরা

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের "সোস্যাল ফ্যাসিষ্ট" বলে' গাল দিয়েছে। কয়েকটি দেশে সেই মৈত্রীসম্পর্ক, বা যুক্তফ্রন্ট, বা পপুলার ফ্রন্ট্ স্থাপিতও হলো।

স্পেনে আবার ক্যাটালোনিয়াব সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর এই সম্মিলিত দল গিয়ে কমিণ্টার্ণে যোগ দেয়। স্পেনেব সোস্যালিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট যুব-প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হবার পরে সেগুলি খাঁটি কমিউনিষ্ট দল হয়েই দাঁড়াল।

মস্কোও তা-ই চেয়েছিল। বস্তুতঃ ১৯৩৮ সালেব মে মাসে মস্কোতে কমিণ্টার্ণ নেতা জর্জ ডিমিট্রফ্ আমাকে বলেছিলেন যে, প্রত্যেকটি দেশে কমিউনিষ্ট এবং সোস্যালিষ্ট দলগুলি মিলিত হলেই তিনি খুসী হবেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, এর ফলে এক সোস্যাল-কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠান দিয়েই কমিণ্টার্ণের কাজ চালানো যাবে।

কমিণ্টার্ণের যে অবসান ঘটানো হবে, ১৯৩৮ সালেই ডিমিট্রফ্ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আশা কবেছিলেন যে, যুক্ত সোস্যালিষ্ট-কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কমিউনিষ্টবাই প্রভুত্ব করতে পারবে।

বর্ত্তমানে এটাই হচ্ছে কমিউনিষ্টদের ও সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের সরকারী ও স্বীকৃত নীতি।

ইউরোপের কমিউনিষ্ট দলগুলি সোস্যালডেমোক্র্যাট দলগুলির সঙ্গে মিলিত হ'তে চেষ্টা করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে যেদল ঢের বেশী সমর্থন পেয়েছে এই মিলনের ফলে তার পৃথক সত্তার অবসান ঘটবে। কমিউনিষ্টরাও এর ফলে এক অখণ্ড ও সম্মিলিত শ্রমিকদলকে পরিচালনা করবার সুযোগ পাবে। বিভিন্ন দেশে সেই দলের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারে, আর নয়তো সরকারের উপরে প্রচণ্ড প্রভাব থাক্‌তে পারে তার।

জার্ম্মানীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে, এবং বার্লিনেও, লালফৌজের

অফিসাররা সোস্থালডেমোক্র্যাটদের উপরে হুকুম জারী করেছিলেন যে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের মিলিত হতে হবে। অধিকাংশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটই সে আদেশ পালন করেন; কেউ কেউ তা মেনে নিতে অসম্মত হওয়ায় সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। কেউ কেউ বা মার্কিণ ও বৃটিশ বাহিনীর সাহায্যে সোভিয়েট আতঙ্কের হাত থেকে পশ্চিম জার্ম্মানীতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

মস্কো জানে যে, কমিউনিষ্টরা যদি এক 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্রমিক দলের এবং ট্রেডইউনিয়নগুলির উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে মস্কোর পক্ষে তাহলে স্থানীয় রাজনীতিকদের সাহায্যে রুশ-প্রভাবাধীন এলাকাকে শাসন করা সম্ভব হবে। সামরিক দখলটাও সেক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে কম দৃষ্টিগোচর ও কম পীড়াদায়ক বলে মনে হবে। মস্কো যদি আজ জার্ম্মানীর মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী অধিকৃত এলাকার সোস্থালিষ্টদের সমর্থন পায় তাহলে মস্কোপ্রভাবিত এক কমিউনিষ্ট-সোস্থালিষ্ট দলের মাধ্যমে সমগ্র জার্ম্মানীর উপরেই রাশিয়া তার আধিপত্য বিস্তার করতে পাবে। "জার্ম্মানীকে নিয়ে কী করা যায়?"—এই বহুবিতর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে তা-ই হচ্ছে ক্রেমলিনের জবাব।

সোস্থালিষ্ট এবং কমিউনিষ্টরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধনতান্ত্রিক শোষণ এবং ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতে পারে; গণতন্ত্র সম্পর্কে কিন্তু তাদের মধ্যে মতের মিল নেই। তাদের অনৈক্যেরও এই হচ্ছে কারণ। সোস্থালিষ্টরা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের একটা সমন্বয় কামনা করে। অপরপক্ষে কমিউনিষ্টরা কী চায় জার্ম্মানীর ঝানু কমিউনিষ্ট নেতা উইলহেলম্ পিক্-এর ভাষাতেই তা বলছি। ১৯৪৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বার্লিনে সোস্থালিষ্ট কমিউনিষ্ট মিলনকামী এক জনতাকে উদ্দেশ্য করে' তিনি বলেছিলেন, "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যে খাঁটি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই সমাজতন্ত্রই আমাদের লক্ষ্য।"

কমিউনিষ্টদের পিতৃভূমি হলো রাশিয়া। এই জন্যেই জার্ম্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের মুখপাত্ররা খোলাখুলিভাবেই জার্ম্মানীর কমিউনিষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা রুশ-দল, না জার্ম্মান-দল? কমিউনিষ্টদের মস্কো-আনুগত্য অটুট, ওদিকে সোস্যালিষ্টরাও গণতন্ত্রকামী; প্রতিক্রিয়া, রাজতন্ত্রপ্রীতি, যাজকত্ব এবং ফ্যাসিবাদের দমনকল্পে যে যুক্ত-শ্রমিকদল গঠন করা প্রয়োজন কমিউনিষ্ট ও সোস্যালিষ্টদের এই মতবিরোধিতা সেই যুক্ত-দল গঠনের পথে এক দুরন্ত অন্তরায়।

তা সত্ত্বেও সোস্যালিষ্টদের মধ্যে কিছু কিছু অংশ কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠ্ছে। রুশ প্রভাবাধীন অঞ্চলবহির্ভূত যেসমস্ত স্থানে তা ঘট্ছে সেখানে তার জন্যে সোভিয়েটের প্রত্যক্ষ চাপ দায়ী নয়। দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলতার শক্তিবৃদ্ধিই তার জন্য দায়ী। দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতা হস্তগত করলে, অথবা তার উপক্রম করলে, বামপন্থী দলগুলির পক্ষে আদর্শগত গুরুতর অনৈক্য সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।

এই কারণেই, চার্চ্চিল যেদিন শ্রমিকদলের হাতে পরাজিত হন ইউরোপে সেদিন স্টালিনের মতো দুঃখী আর কেউই ছিলেননা। চার্চ্চিল রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁর রক্ষণশীলতাও অনপনোদনীয়,—এই কারণেই স্টালিনের কাছে তাঁর যথেষ্ট দাম ছিল। চার্চ্চিলের রাজতন্ত্রপ্রীতির দরুণ শ্রমিক, সোস্যালিষ্ট এবং উদারনৈতিকরা যাতে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগদান করে' তাদের রাজনৈতিক কৌশল অনুসরণ করে সেজন্য কমিউনিষ্টরা তাদের প্রতি আহ্বান জানাতে পারতো। কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক সরকারের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিষ্ট দলগুলির সঙ্গে যোগদানের ব্যাপারে হ্যারল্ড্ জে ল্যাস্কি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সোস্যালিষ্টদের নিরুৎসাহ করতে লাগ্লেন? আশ্চর্য্যের কথা এই

যে, এই ল্যাস্কিই পূর্ব্বে তুমুলভাবে রাশিয়ার "নব আদর্শে" বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই যে দৃঢ় অনিচ্ছা বর্ত্তমান ছিল্ ল্যাস্কি তাকে আরও শক্তিশালী করে তুল্‌লেন। তবে ইউরোপকে যদি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায় একমাত্র তাহলেই শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপ থেকে সোস্যালিষ্টরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে পারবে, কমিউনিষ্ট দলগুলির মধ্যে তাদের বিলুপ্তিও ঘট্‌বেনা। যুদ্ধ ও তার পরবর্ত্তীকালীন ঘটনাসমূহের দরুণ মধ্যবিত্ত ও চাকুরীজীবী শ্রেণী দরিদ্র হয়ে পড়েছে। তাদের ধর্ম্মনিরপেক্ষ সংহতি, রাজনীতিপ্রবণতা এবং চলিষ্ণুতাও বর্ত্তমানে হ্রাসপ্রাপ্ত। ফ্রান্স যুদ্ধকবলিত হবার পূর্ব্বে, এবং জার্ম্মানীতেও যখন হিটলারের অভ্যুত্থান হয়নি, চরম দক্ষিণপন্থীদেব হাতে নিপীড়িত হ'য়ে সোস্যালিষ্টরা তখন মধ্যপন্থীদের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারতো যদিও মধ্যপন্থীরা তখন কিছুটা দক্ষিণভাবাপন্নই ছিল। তারা এখন দুর্ব্বল। প্রতিক্রিয়াশীলরা পাছে ক্ষমতা হস্তগত করে ফেলে, এই আশঙ্কায় সোস্যালিষ্টদের পক্ষে তাই মাঝে মাঝে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে হাতমেলানো অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে।

প্রতিক্রিয়াশীলরা উৎসাহ পেতে থাক্‌লে সোস্যালিষ্ট কমিউনিষ্ট ঐক্যবন্ধন গড়ে উঠ্‌বেই। এ ঐক্যবন্ধনের ফলে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থহানি ঘটে, মস্কোও আহ্লাদিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী এবং রাজতন্ত্রসমর্থকদের উচ্ছেদ ক'রা হ'লে কমিউনিষ্টদের আলিঙ্গন থেকে সোস্যালিষ্টরা নিজেদের মুক্ত রাখ্‌তে পারবে। চরমপন্থী একনায়কত্ববাদী কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রেখে সোস্যালিষ্টরা তখন মধ্যপন্থী গণতান্ত্রিক সোস্যালিষ্ট হয়ে উঠবে।

বৃটেনের শ্রমিক-সরকারের পক্ষে আজ আর তাই শুধুমাত্র সোস্যালিষ্ট সম্মেলনগুলিতে ল্যাস্কি এবং তাঁর মতো কয়েকজন শক্তিমান বাগ্মীকে প্রতিনিধি করে পাঠালেই চল্‌বেনা। তাঁদের

আজ ইউরোপকে উদারনৈতিক বামপন্থী এবং সোশ্যাল ডেমক্র্যাট করে তুল্‌তে হবে। এখনও পর্য্যন্ত স্পেনে ফ্র্যাঙ্কো, পর্ত্তুগালে সালাজার, হাঙ্গারীতে রাজতন্ত্র-সমর্থক, অষ্ট্রীয়াতে কৃষি-দালাল, জার্ম্মানীতে ক্ষমতালোভী শিল্পপতি এবং ইটালীতে ফ্যাসিপন্থী ও সেকেলে মনোভাবাপন্ন স্থিতাবস্থা-সমর্থকদের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে; এ-সবের দরুণই সোশ্যালিস্টরা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়।

কমিউনিষ্টরা কেন সোশ্যালিষ্টদের গণতন্ত্রী কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেনা? কারণ, কমিউনিষ্টদল হলো একটি শৃঙ্খলানিষ্ঠ গুপ্তমন্ত্র প্রতিষ্ঠান। মস্কোর প্রতি আনুগত্যই তাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। ব্রাউডারের মত কেউ যদি কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে চল্‌তে থাকেন এবং রাতারাতি পার্টি যদি নতুন কোনও নীতি গ্রহণ করে তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই নতুন নীতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, ফলে "ধনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার দাস" আখ্যা দিয়ে তাঁকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়। কোনও কমিউনিষ্ট-নেতার মধ্যে সামান্যতম স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া গেলে পর তৎক্ষণাৎ তাঁকে "ট্রট্‌স্কীপন্থী শয়তান" আর নয়তো "ফ্যাসিপন্থী" বলে আখ্যাত করা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোনও কমিউনিষ্ট দলই মস্কোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের নীতির বিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন সাধন করতে সক্ষম নয়। মস্কো চায়না যে, কমিউনিষ্টরা গণতন্ত্র অথবা জাতীয় স্বার্থের সেবা করুক। কমিউনিষ্টরা "গণতন্ত্র"-এর কথা বলতে পারে, নিজেদেরকে "গণতন্ত্রী" বলে' জাহিরও করতে পারে। সে গণতন্ত্র হচ্ছে "সোভিয়েট গণতন্ত্র" গোয়েন্দা-পুলিশ, একক দল এবং একজন একনায়কের সাহায্যে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন চালানো হচ্ছে। সে একনায়ক হচ্ছেন একনায়কত্ববাদী গণতন্ত্রী।

সোস্যালডেমোক্র্যাটদের দলে টানবার জন্যে কমিউনিষ্টরা আজ যে চেষ্টা করছে তা যদি সফল হয় ইউরোপে তাহলে গণতন্ত্র ও বৃটিশ প্রভাবের অবসান ঘটবে। রুশ প্রভুত্বই তখন কায়েম হবে সেখানে। হিটলারের শুধু সৈন্যবাহিনীই ছিল, স্টালিনের আবার রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিও রয়েছে।

রুশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই পুরাতন সংগ্রাম আজ আবার নতুন করে' সুরু হয়েছে, সেইসঙ্গে বিস্তৃতও হয়েছে তা। এ সংগ্রাম আগে এশিয়া এবং পূর্ব্ব ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকতো; ইউরোপের আনাচে কানাচে এবং এশিয়ার সর্ব্বত্র তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে আরও দূরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিও বাদ যায়নি। নতুন নতুন অস্ত্রের প্রয়োগ চলছে সেইসঙ্গে। জারদের হাতে শুধু প্যান-স্লাভবাদ, রক্ষণশীল গ্রীক ধর্ম্মমত, কূটনীতিক, গুপ্তচর এবং সৈন্যবাহিনীই ছিল। বলশেভিকদের তো সেসব আছেই, অধিকন্তু প্রত্যেকটি দেশেই তাদের সমর্থনকারী শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাছাড়া তাদের আবার এক সমাজদর্শনও রয়েছে, বিদেশে তাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে তারা। আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আবেদন। জাররা দু-দুবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাড়াহুড়ো করে' ভারতজয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু সে পথে না গিয়ে ঔপনিবেশিক জনসাধারণের দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলবার আহ্বান জানাচ্ছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বৃটেন এখন দুর্ব্বল ও রাশিয়া শক্তিশালী। তেহরাণ ও ইয়াল্টা সম্মেলনে, চার্চ্চিল এবং রুজভেল্ট যে শান্তি-পরিকল্পনা করেছিলেন রাশিয়ার তাতে প্রচুর সুবিধে হয়ে যায়, তারি দৌলতে ইউরোপের অর্দ্ধাংশের উপরে আজ তার প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়েছে। বস্তুত অর্দ্ধাংশের থেকেও বেশী। রুশ-প্রভাবাধীন এলাকার সঙ্গে ভারসাম্যবিধানের জন্য ইংরেজ এবং অন্যান্যেরা আজ প্রস্তাব করছে যে, বৃটেনের অথবা বৃটেন ও

ফ্রান্সের নেতৃত্বে এক পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলী গঠন করা হোক।

সেরকম কোনও রাষ্ট্রমণ্ডলী গঠনের অবকাশ কোথায়?

যে সমস্ত দেশ রুশ-এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের কথাই চিন্তা করে দেখা যাক।

নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক দীর্ঘদিন ধরে' নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে' আসছে; স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এদিকে কোনও দল অথবা মণ্ডলীতে যোগ দিতে তারা অনিচ্ছুক। তাছাড়া নরওয়ে এখন রাশিয়ার প্রতিবেশী; ফলতঃ সুইডেন এবং ডেনমার্কও। রাশিয়া যদি পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীর বিরোধিতা করে তবে তাতে যোগদান করা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

হল্যাণ্ড অবশ্য পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীতে যোগ দিতে পারে, বেলজিয়ামও। ফরাসী কমিউনিস্টরা যদি তাদের বর্ত্তমান ভোটের জোর না হারায় তবে ফ্রান্সের পক্ষে তাতে যোগদান করা সম্ভব হবেনা। স্পেন এবং পর্ত্তুগালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে তারা বোধ হয় সে মণ্ডলীতে যোগদান করেন। ইটালী কি করবে সেটা কমিউনিষ্টদের নীতির উপরেই নির্ভরশীল। সুইজারল্যাণ্ড চিরকালই নিরপেক্ষ; ইংলণ্ডের প্রতি সে সহানুভূতিশীল বটে, কিন্তু তাই বলে কোনও মণ্ডলীতে সে সদস্যপদ গ্রহণ করবেনা। গ্রীসও তার আভ্যন্তরীণ কলহবিবাদে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। সে আজ স্পষ্টতরভাবে বৃটেনের পক্ষাবলম্বন করলে সেখানকার দক্ষিণ ও বামপন্থীদের শত্রুতা তাতে আরও বৃদ্ধি পাবে; তাতে যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার সঙ্গেও সঙ্ঘর্ষ বাধবে তার। স্বভাবতঃই সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তুরস্কের কিছুটা হচ্ছে ইউরোপীয়, কিছুটা এশিয়া মহাদেশীয়। বৃটেনের কাছেই সে ত্রাণকামনা করে বটে, কিন্তু রুশ-আক্রমণ সম্পর্কেও সে আতঙ্কিত। রাশিয়ার সঙ্গে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার শান্তিরক্ষা করে' চল্‌বার সম্ভাবনা

রয়েছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীতে সে যোগ দেবেনা।

জার্ম্মানী বাদে ইউরোপের অবশিষ্ট অংশের অবস্থা হলো এই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অসংখ্য জার্ম্মান পাশবিক আচরণের পরিচয় দিয়েছে। মানুষের উপরে তারা যে অত্যাচার চালিয়েছিল সে অত্যাচাবের তালিকা দীর্ঘকালের জন্য জার্ম্মানীর নামকে কলঙ্কিত করে' রাখ্‌বে। কোনও উপায়েই জার্ম্মানীর যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপূর্ব্ব অপবাধ অপনোদিত হবার নয়। জার্ম্মানীকে কি শাস্তির হাত থেকে বেহাই দেওয়া হবে? পরাজয় এবং পরাজয়জনিত অবস্থাই সে শাস্তিব অংশবিশেষ। জার্ম্মানীর সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীতে যে আতঙ্ক ও তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে তার আশুনিবৃত্তি ঘট্‌বেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিচারে দেখা যাবে যে, জার্ম্মানীর অপরাধেব উপযুক্ত শাস্তিবিধান সম্ভব নয়। তার কারণ হলো এই যে, জার্ম্মানীব উপবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হ'লে সে এত পঙ্গু হয়ে পড়বে যে, তার ফলে বহু নিরপবাধ জার্ম্মান এবং জার্ম্মানীর বাইরের বহু নিবপরাধ ব্যক্তিও পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। পরিণামে, বিশ্ব-পুনর্গঠন ব্যাহতই হবে। জার্ম্মানীর অপরাধের যদি উপযুক্ত শাস্তিবিধানই করতে হয় তবে সে শাস্তি এত নৃশংস হয়ে দাঁড়াবে যে, শাস্তিদাতাদের নৈতিক কাঠামোও তার ফলে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রয়োজনের খাতিরেই শয়তানির উত্তরেও আজ সাধু-ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের সভ্যতা আজ সঙ্কটাপন্ন। ইউরোপ ও এশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ,—বৃটিশ, ওলন্দাজ, ফরাসী, রাশিয়ান, আর্জ্জেন্টাইন, স্প্যানিয়ার্ড ও চীনাদের আচরণ লক্ষ্য করে' যাও। ফাঁসীর আসামীর উপরে যেমন করে' ফাঁসীর দড়ি ঝুলতে থাকে তেমনি করেই

আমাদের উপরে এক বর্ব্বরতার অভিশাপ নেমে আস্ছে। ফাঁসী হয়না আমাদের, সেই ফাঁসীর দড়ি সাথে নিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আমরা ঘুরে বেড়াই। আমাদের সভ্যতা আজ ধ্বসে' পড়বার উপক্রম করেছে। 'চোখের-বদলে-চোখ-চাই, চোখের-বদলে-চোখ'—কাউকে না কাউকে এই সর্ব্বনাশা প্রতিহিংসাপরায়ণতার অবসান ঘটাতে হবে। জার্ম্মানরা ভদ্রব্যবহার পাবার উপযুক্ত কিনা প্রশ্ন তা নয়; আমাদের ভদ্র হওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৫ সালের ১৮ই জুন তারিখে ওয়াশিংটনের এক সাংবাদিক-সম্মেলনে জেনারেল ডুইট ডি আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন, "ঘৃণা অথবা মুগুর দিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।" এই হচ্ছে প্রকৃত খৃষ্টীয় উক্তি।

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অবস্থানকালে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের প্রেসিডেন্ট চতুর্বর্গ-স্বাধীনতাব কথা বলছেন; স্বাধীন হবার স্বাধীনতাও তাব অন্তর্ভুক্ত তো?"

উত্তরে বলেছিলাম, "যুদ্ধের পরে পৃথিবী সুস্থতর হয়ে উঠ্‌বে।"

সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে গান্ধী প্রশ্ন করলেন, "ঠিক জান?"

উত্তরে বল্‌লাম, "আশা করি।"

গান্ধী বল্‌লেন, "যে-পৃথিবীতে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব, আজ যদি আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে দেখতে পাই, তবেই বুঝব যে তোমরা সে-পৃথিবী গড়ে তুল্‌তে পারবে।" এই উক্তি প্রকৃত খৃষ্টানের, কিন্তু এ-উক্তি যিনি করলেন তিনি খৃষ্টান নন, হিন্দু।

সম্প্রতি সেণ্ট্‌ লুইয়ে জনৈক ধর্ম্মযাজকের পত্নী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "শান্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চার্চ্চ কি করতে পারে?" বল্‌লাম, "খৃষ্টানদের খৃষ্টান করে' তুলুন।"

বহু দেশ আমি পর্য্যটন করেছি ; এমন হিন্দু, ইহুদী, প্রোটেস্ট্যাণ্ট এবং ক্যাথলিকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যাঁদের আচরণ প্রকৃত খৃষ্টানের মতই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও খৃষ্টীয় রাষ্ট্রের সন্ধান পেলামনা।

যাঁরা শান্তিপ্রতিষ্ঠা করছেন তাঁরা যতটুকু ভালো শান্তিও ঠিক ততটুকুই ভালো হবে।

জার্ম্মান, জাপানী এবং ইটালীয়েরাই যুদ্ধ বাধিয়েছিল সত্য, এ কার্য্যে তারা ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ান, মার্কিণ এবং অন্যান্যদের কাছ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে। যাঁরা মিউনিক চুক্তি নিষ্পন্ন করেছিলেন তাঁরাও। সমগ্র ইউরোপে একমাত্র জার্ম্মানরাই যুদ্ধোপরাধী নয়।

জার্ম্মানমাত্রেই আবার যুদ্ধোপরাধী নয়। এমন অনেক আছেন যাঁরা বলেন যে, সমস্ত জার্ম্মানই নাৎসী। জার্ম্মানীতে এমন অনেক জার্ম্মানকে আমি জানি যাঁরা এদের চাইতে অধিকতর নাৎসীবিরোধী। ১৯৪৫ সালে ন্যুরেম্বার্গ আদালতে অভিযোগ উত্থাপনপ্রসঙ্গে বিচারপতি রবার্ট জ্যাকসন বলেছিলেন, "সমগ্র জার্ম্মানজাতির উপরে অপরাধ চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা জানি যে, অধিকাংশ জার্ম্মানের ভোট লাভ করে' নাৎসীদল ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়নি। আমরা আরও জানি যে চরমপন্থী নাৎসী-বিপ্লববাদী এবং আক্রমণপরায়ণ জার্ম্মান সমরলিপ্সুদের শয়তানী চক্রান্তের ফলেই নাৎসীদল ক্ষমতালাভ করেছিল।" একথা ঐতিহাসিক সত্য।

জার্ম্মান জাতির অনুমোদন, কি অন্ততঃ যোগসাজস ব্যতিরেকে নাৎসীদের পক্ষে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হতোনা একথা বল্‌লে একনায়কত্ববাদী সরকারের অনিবার্য্য বৈশিষ্ট্যকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়। একনায়কত্ববাদী সরকার জনসাধারণের

অনুমোদন অথবা সম্মতি নিয়ে শাসন চালাননা। হিটলার সম্পর্কে এমন অযথা প্রশংসাবাক্য অমি উচ্চারণ করতে চাইনা যে, সমগ্র জার্ম্মান জাতির সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। অনেক—অনেক জার্ম্মানকেই তিনি জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন; অবশিষ্ট জার্ম্মানরাও তখন, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়, চুপ করে' থাক্‌তে বাধ্য হয়। অন্যথায় তাদের হত্যা অথবা কারারুদ্ধ করা হতো। আরও একটা কারণ হলো এই যে, পূর্ব্বসূরীরা যে দৃঢ়মূল জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই জাতীয়তাবাদের আগুনকে আরও তাতিয়ে তুলেছিলেন হিটলার।

জার্ম্মানী অথবা জাপানের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক্‌না কেন সে-পথে শান্তি আসবেনা। ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা কল্পনা সুরু হয়ে গিয়েছে। এটাই হবে প্রথম পরমাণু-যুদ্ধ। জার্ম্মানী, ইটালী অথবা জাপান এযুদ্ধ বাধাবেনা, ইচ্ছে থাক্‌লেও তাদের তা করবার উপায় নেই।

যুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র জার্ম্মানদেরই একচেটিয়া রোগ নয়, সমগ্র বিশ্বই এরোগে আক্রান্ত। কোনও ভৌগোলিক, শোণিতগত অথবা জাতীয় গণ্ডীতেই এরোগ সীমাবদ্ধ নয়।

সমগ্র বিশ্বেই দারিদ্র্য, অভাব, উৎপীড়ন এবং বৈষম্যের বীজ ছড়িয়ে গেছে। এরই ফলে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

জাতীয়তাবাদও যুদ্ধকে ডেকে আনে।

একনায়করাও যুদ্ধের সৃষ্টি করেন।

গণতন্ত্রের প্রয়াস যুদ্ধরোধ। সর্ব্বক্ষেত্রে অবশ্য একথা প্রযোজ্য নয়

জার্ম্মানীর গণতন্ত্রীদের মধ্যে ভীরুতা এবং ফেবিয়ানসুলভ আচরণেরই পরিচয় পাওয়া গেছে। সচরাচর তারা ছিল অহিংসাপন্থী। জার্ম্মানীর সামন্ততান্ত্রিক, সমরবাদী এবং একচেটিয়া অধিকারভোগী শ্রেণীর অনিষ্টকারী ক্ষমতা এখনও অক্ষুণ্ণ। তবে অস্থিরমতি এবং

দুর্ব্বল জার্ম্মান গণতন্ত্রীদের যাঁরা নিন্দে করেন অন্যান্য দেশের গণতন্ত্রীদের দিকেও তাঁদের তাকিয়ে দেখা উচিত। খাঁটি গণতন্ত্রী যদি কোথাও থেকে থাকে তবে সে স্পেনের গণতন্ত্রীরাই; স্পেনের ধমনীতে যেটুকু বা টিউটন রক্ত প্রবাহিত হতো তা-ও উপেক্ষণীয়। অথচ যে সমরবাদী, জমিদারগোষ্ঠীভুক্ত, ফ্যাসিপন্থী ও রাজতন্ত্রীরা সারাক্ষণ চক্রান্ত করে উদারনৈতিক সাধারণতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলো, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে গণতন্ত্রীরা কি তাদের চূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছে? ফ্রান্সেও গণতন্ত্রকে যথেষ্টই দাম দেওয়া হতো। ধর্ম্মানুষ্ঠানের মতোই একাগ্রতা এবং নিষ্ঠাসহকারে ফরাসীরা তাদের ভোটদানক্ষমতার প্রয়োগ করেছে। তা সত্ত্বেও, ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে যে সমস্ত গণতন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করেছে—ফরাসীরা কি তাদের উচ্ছেদসাধন করতে পেরেছিল?

স্বাধীনতার যারা আভ্যন্তরীণ শত্রু,—নিগ্রো, ইহুদী, শ্রমিকশ্রেণী এবং সংস্কারকে যারা ঘৃণা করে—প্রগতিপন্থী, উদারনৈতিক, আমূলপরিবর্ত্তনকামী এবং গণতন্ত্রী মার্কিণরাই বা তাদের উচ্ছেদসাধনে কতখানি সাফল্য অর্জ্জন করেছে? শুধু জার্ম্মানদের উপরেই দোষ আরোপ কোরোনা, নিজেদের উপরেও কোরো।

"জার্ম্মানীতে হিটলারবিরোধী কোনও গুপ্তদল ছিলনা, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইটালী, গ্রীস এবং অন্যান্য দেশে কিন্তু গুপ্তভাবে, নাৎসীবিরোধী কার্য্যকলাপ চালানো হয়েছে।" একথা কি পুরোপুরি সত্য? যুদ্ধের আগেই জার্ম্মান বন্দীশিবিরগুলি বোঝাই হয়ে উঠেছিল—বৈদেশিক বন্দীদের দিয়ে তা বোঝাই করে' তুলবার আগেই। নাৎসীবিরোধী জার্ম্মানদেরই আটক করে' রাখা হয়েছিল সেখানে। জীবন বিপন্ন করে' তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, প্রায়ই তা তাঁদের হারাতেও হয়েছে। নাৎসী-অধিকৃত দেশগুলিতে

যে-সমস্ত গুপ্তদল গড়ে উঠেছিল তা আরও বড় আরও শক্তিশালী ছিল সন্দেহ নেই। তার কারণ হচ্ছে এই যে, তখনও পর্য্যন্ত এসমস্ত দেশের অধিবাসীদের কাছে নাৎসী-অত্যাচার জার্ম্মানদের মতো অতটা গা-সহা হয়ে' ওঠেনি। তাছাড়া বিদেশী বিজেতার প্রতি জাতীয়তাবাদী বৈরীভাবও এসমস্ত গুপ্তদলকে কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠ্‌তে সহায়তা করেছে।

জার্ম্মানরা মৃত্যুবরণ না করায় বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসীই তাদের নিন্দে করে থাকেন। নিজেদের দেশকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অভিশাপের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যাপারেই বা তাঁরা কতটুকু ঝুঁকি নিতে রাজী আছেন? নিজেদের অন্তরের কাছ থেকেই তাঁরা আগে সেই প্রশ্নের উত্তরলাভ করুন। অভীষ্টলাভের সাধনায় কখনো কখনো তাঁরা কিছুটা সময়, বা কিছু অর্থ দান করে থাকেন। বৃত্তি, পরিবাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, চাকুরী এবং জীবনকে বিপন্ন করতে কি রাজী আছেন তাঁরা?

স্প্যানিয়াড´বা রাশিয়ানদের মধ্যেই বা কজন তাদের একনায়কদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়?

১৯৪৩ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে নিউ ইয়র্কে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সামনার ওয়েল্‌স্ বলেছিলেন, "এক কদর্য্য পৃথিবীতে আমরা দিন যাপন করে এসেছি, এখনও করছি।" জার্ম্মানীর কদর্য্য আচরণই সেই কদর্য্যতার সবটা অংশ নয়, তার একাংশমাত্র। প্রত্যেকটি দেশই সেই কদর্য্যতার কিছু না-কিছু অংশীদার।

জাপানের যুদ্ধপূর্ব্ব এবং যুদ্ধকালীন অপরাধের তালিকা দীর্ঘ এবং কুৎসিত। জার্ম্মানীর অপরাধী-তালিকার অপেক্ষাও তা দীর্ঘতর এবং জঘন্যতর কিনা কে তা বল্‌তে পারে। তা সত্ত্বেও জাপানের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে জার্ম্মানীর ক্ষেত্রে অবলম্বিত ব্যবস্থা থেকে তা যথেষ্ট পৃথক। জেনারেল ডগ্‌লাস ম্যাকআর্থারের

সম্মতিক্রমে সেখানকার সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনসাধন করা হয়েছে। যে ধরণের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিণরা প্রেসিডেণ্ট-পদের জন্য তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তারপরে আর কেউ এতখানি ব্যাপক সংস্কার আশা করতে পারতেননা। যে সমস্ত ব্যক্তি টোকিওর গণতন্ত্রবিরোধী আভ্যন্তরীণ উৎপীড়নের জন্যে দায়ী, নাম ধরে' ধরে' জাতীয় জীবনের ক্ষেত্র থেকে তাদের বহিস্কৃত করা হয়েছে। ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা হয়েছে সেখানে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও অক্ষুন্ন রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলে যোগদান করা সম্পর্কেও বাধানিষেধ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সেইসঙ্গে সম্রাটের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, তাঁর প্রতি আরোপিত স্বর্গীয় গুণাবলী এবং তাঁর প্রাক্তন মর্য্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিনা রক্তপাতে, বিনা সঙ্ঘর্ষেই সম্ভব হয়েছে এসব। জনসাধারণও আজ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থালাভে উন্মুখ। তাদের আচরণে এখন আর বিদেশীবিদ্বেষী তিক্ততার এতটুকু পরিচয় নেই।

জাপানের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে তার যোগ্য কিনা সে প্রশ্ন এখানে ওঠেনা। জাপানের ক্ষেত্রে কি নীতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্ত্তৃত্ব ছিল বলেই এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

জার্ম্মানীর ইহুদীপ্রধান ডাঃ বেক্ ১৯৪৬ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর করতে আসেন। হিটলারের হাতে জার্ম্মানীর ইহুদীদের তিনি শোচনীয়ভাবে নিহত হ'তে দেখেছিলেন; নিজেও কয়েক বছর বন্দীশিবিরে আটক ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও, জর্ম্মানীর গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাসী কিনা—এ প্রশ্ন করা হ'লে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়ই বিশ্বাসী। তবে জার্ম্মানীর সুস্থ ও সংগঠনী দলগুলিকে মিত্রপক্ষ কতখানি শক্তিশালী করে তুলতে পারেন তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।" ঘৃণার বিরুদ্ধেই তিনি যুক্তি

দেখিয়েছিলেন। জার্ম্মানদের নিজেদের উপরেও অনেক কিছুই নির্ভর করছে সন্দেহ কি, তবে জার্ম্মানী এ পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটা অংশমাত্রই। পৃথিবীতে আমরা আছি, পৃথিবীতেই থাক্‌তে হবে। জার্ম্মানী সম্পর্কে হাত গুটিয়ে বসে' থেকে আজ তার "নিজের পাপে ভরাডুবি" হতে 'দেয়া যায়না, কারণ প্রত্যেকেই আজ যে-যার পাপে জার্ম্মানীর সঙ্গে একসাথে ভরাডুবি হতে চলেছে।

জার্ম্মানী সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, বিজেতারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেখানে, সে ব্যবস্থা জার্ম্মানীর অপরাধের প্রতিশোধ নয়,—জার্ম্মানীর উপরে প্রভুত্ববিস্তারের জন্য আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চল্‌ছে এ-ব্যবস্থা হলো তারই পরিণতি।

জার্ম্মানী আজ ইউরোপীয় সমস্যার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া এসে প্রথমেই সরাসরিভাবে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার একাংশ দখল করে নেয়। পোল্যাণ্ড দখলের মারফৎ সাইলেশিয়া, পোমেরানিয়া ও পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার অবশিস্টাংশ—অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব্ব জার্ম্মানীর এক পঞ্চমাংশের উপরেই রাশিয়া তার প্রভুত্ববিস্তার করে। শিক্ষিত জনবল ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবহেতু পোল্‌দের নিজেদের পক্ষে এসমস্ত অঞ্চল হজম করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, বর্ত্তমান জার্ম্মানীর এক-তৃতীয়াংশও রাশিয়ার অধিকারভুক্ত। এক-তৃতীয়াংশের কিছু কম অংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হয়েছে, এখানে অনুমান ১ কোটি ৭০ লক্ষ জার্ম্মানের বাস। বাদবাকী অংশ বৃটেন ও ফ্রান্সের অধিকারে।

প্রধান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যদি আজ কলহদ্বন্দ্বের অবসান না ঘটে তা হলে তাদের প্রত্যেকেই যে তার অধিকারভুক্ত জার্ম্মান-অঞ্চলকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে একথা বলাই বাহুল্য।

যা' কিছুকেই নিজেদের প্রভুত্বাধীন করে' রাখা সম্ভব তাকেই

শক্তিশালী করে' তোলা, এবং যা কিছুকেই প্রভুত্বাধীন করে' রাখা যায়না তারই মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে তাকে দুর্ব্বল করে দেয়া—এই হলো রাশিয়ার নীতি। চীন এবং অন্যান্য স্থানের মতো জার্ম্মানীতেও সে আজ এই নীতিই অনুসরণ করে' চলেছে।

রাশিয়া তার নিজের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে জার্ম্মানীকে মূলতঃ এক কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করবার নীতিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেনা। অথচ তা সত্ত্বেও কমিউনিষ্টদল এবং তাদের সমর্থকরা আজ দাবী তুলেছেন যে, জার্ম্মানীর যে সমস্ত অঞ্চল অন্যান্য শক্তির অধিকারভুক্ত সেখানকার জার্ম্মান কলকারখানাগুলিকে ভেঙে দিয়ে জার্ম্মানীর শিল্পশক্তির অবসান ঘটানো হোক্।

জার্ম্মানী যাতে আবারো যুদ্ধ বাধাতে না পারে তার জন্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। জার্ম্মানী আজ বৈদেশিক প্রভুত্বাধীন ; যুদ্ধের ফলে তার শক্তিসামর্থ্য ধ্বংস হয়ে' গেছে। বিজেতারা তার উপরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে অধিকারকে তারা বজায় রাখবেন বলেই মনে হয়। এ-অবস্থায় আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়া যদি চায় যে জার্ম্মানরা আবারো যুদ্ধ বাধাক্, একমাত্র তাহলেই তাদের পক্ষে যুদ্ধ বাধানো সম্ভব। জার্ম্মানীর অস্ত্রসজ্জার কতখানি হ্রাস হয়েছে, শিল্পশক্তিকেই বা কতখানি নষ্ট করে' দেয়া হয়েছে তার—তাতে কিছুই এসে যায়না ; শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ আজ যে-কোনও মুহূর্ত্তেই সে-ব্যবস্থাকে উল্টোপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে ১৯২২ সাল থেকেই জার্ম্মানী পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছিল। ভার্সাই চুক্তির সর্ত্ত লঙ্ঘন করে' গোপন ব্যবস্থানুযায়ী ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত সোভিয়েট এলাকায় সে সমরাস্ত্র উৎপাদন করে' গেছে। যে কোনও সময়েই এই একই পথে, অথবা অন্য কোনও পথে, এর পুনরাবৃত্তি ঘট্‌তে পারে।

যুদ্ধে হেরে গিয়ে জার্ম্মানী আজ নানা নীতির অধীন। তা তার নিজের নীতি নয়। পুনর্ব্বার যুদ্ধ বাধাবার সামর্থ্য তার নেই, তবে তাকে নিয়েই পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে।

ইউরোপে যত যুদ্ধ হয়ে গেছে—সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রই তা বাধিয়েছে। এককালে সে রাষ্ট্র ছিল রোম; ক্রমানুসারে স্পেন, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীই সেই রাষ্ট্র হয়ে' দাঁড়িয়েছিল। এর কারণ অতি সহজ; একমাত্র বলীশ্রেষ্ঠের মনেই আশা থাকে যে, যুদ্ধে সে জয়লাভ করবে। আক্রান্ত হবার আশঙ্কা তার নেই। নেই বলেই সে অপরকে আক্রমণ করে' বসে। ইউরোপ মহাদেশে জার্ম্মানী আজ আর বলীশ্রেষ্ঠ নয়, তা হয়ে উঠ্‌বার সম্ভাবনাও তার নেই।

এ-অবস্থায় শুধুমাত্র জার্ম্মানীর শিল্পশক্তির ধ্বংসসাধন বা জার্ম্মানীর কোনও কোনও অঞ্চলে শিল্পোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে' যুদ্ধরোধ করা সম্ভব হবেনা। জার্ম্মানীর সাম্প্রতিক শত্রুরা যদি আজ নিজেরাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসেন তবে জার্ম্মানদের সে যুদ্ধে টেনে নামানো হতে পারে, তাদের সমস্ত শিল্পশক্তি যদি বিনষ্ট করে দেয়া হয়—তবুও। অপরপক্ষে মিত্রপক্ষ যদি আজ নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রেখে চলেন জার্ম্মানরা তাহলে কোনই অনিষ্টসাধন করতে পারবেনা।

কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর ধরে' জার্ম্মানীতে উগ্র জাতীয়তাবাদ পরিবেশন করে' আসা হয়েছে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন তারিখে এক সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে জেনারেল আইসেনহাওয়ার জার্ম্মানদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "শিশুদের মধ্যে কোনও জাতীয়তার বালাই নেই; শিক্ষা অথবা প্রচারকার্য্যের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সঞ্চার হ'তে থাকে। শৈশব অতিক্রম করবার পরে জাতীয়তা আয়ত্ত করে সে।" যে যোদ্ধা নাৎসীদের পরাজিত করেছিলেন তাঁর মুখেই এই খাঁটি নাৎসীবিরোধী উক্তি। জাতীয়তাবাদ

কারো রক্তকণিকায় জড়িয়ে থাকেনা, বংশলতিকায় নেমে আসেনা তা। এটা হলো কুশিক্ষা এবং প্রচারকার্য্যেরই সন্তান। কাইজার এবং হিটলারের শাসনকালে এই জাতীয়তাবাদই সেখানকার জঙ্গী মনোভাবকে পুষ্ট করে তুলেছিলো। ব্যাপক শিল্পশক্তিই আবার এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে সামর্থ্য সঞ্চার করে। চারদিকে সে তখন থাবা বাড়ায়।

অনেকে বল্‌ছেন, জার্ম্মানীর শিল্পশক্তির অবসান ঘটাও। তার চাইতে কি তার জাতীয়তাবাদী এবং জঙ্গী মনোভাবের অবসান ঘটানোটাই ভালো নয়? শিল্পশক্তি যুদ্ধ সৃষ্টি করেনা, দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিণ শিল্পশক্তির উল্লেখ করা যায়। যারা জাতীয়তাবাদী, যারা জঙ্গী মনোভাবাপন্ন—যুদ্ধ বাধায় তারাই।

বিজয়ী রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি আজ ইউরোপকে সুখী ও প্রগতিশীল করে' তুল্‌তে চায় তাহলে তাদের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে' সেখানে আব জাতীয়তাবাদ ও সমরসজ্জার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। জার্ম্মানদের মন এবং আত্মা যাতে নিরাময় হয়ে ওঠে এমন এক অবস্থারই সৃষ্টি করতে হবে সেখানে। জার্ম্মানীকে কৃষিপ্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করে' জার্ম্মান জনসাধারণের জীবনধারণের মানকে নিচুতে নামিয়ে নিয়ে এলে অবস্থা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত হয়েই দাঁড়াবে।

শুধু ইউরোপ নয়, সমগ্র পৃথিবীই আজ ক্ষুধার্ত্ত, নিরাশ্রয়, বস্ত্রহীন, পীড়িত, পরিশ্রান্ত। এ অবস্থায় যদি জোর করে' শিল্পোৎপাদন হ্রাস করা হয় তবে তাতে মানবসমাজের ওপরে অত্যাচারই করা হবে। জার্ম্মানীকে নিয়ে যে-সমাস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা জটিল। এ সমস্যা কয়েক দশকের সৃষ্টি। রাতারাতি তার বিহিত করা সম্ভব নয়। ঘৃণা, মুগুর বা প্রতিশোধের সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। যে কলকারখানা থেকে টেলিফোন, থার্ম্মোমিটার,

শয্যা, বাড়ী, গাড়ী, চেয়ার এবং জীবনের আরো নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যেতে পারে—তাকে ভেঙে ফেলে সে সমস্যার সমাধান করা যাবেনা।

জার্মানীকে পীড়িত করে' রাখা হ'লে ইউরোপকেও সে পীড়িত করে' তুল্‌বে।

জার্মানীতে যদি শূন্যতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে তার চারদিকের বাতাস স্বভাবতই সেই শূন্য স্থান পূরণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে।

জার্মানীকে যদি বিক্ষুব্ধ, নাজেহাল করে রাখা হয় তবে সে এক চরম সমাধানের জন্যে নতুনতর কোনও একনায়কলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌বে। সে একনায়কের অভ্যুত্থান ঘটতেও বিলম্ব হবেনা, মস্কোর একনায়কই তাঁকে তৈরী করে' জার্মানীতে পাঠিয়ে দেবেন। প্রতারক, ত্রাণকর্তা এবং স্বৈরাচারীরাই সকলের হাতে চাঁদ তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। সঙ্কটকালে জাতি যখন হতাশামগ্ন হয়ে পড়ে, তাদের কাছেই সে তখন আত্মসমর্পণ করে' বসে।

কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, হিটলারের হাতে বার বছর ধরে' নির্য্যাতন সহ্য করবার পর জার্মানদের মনে কি আজ একনায়কের হাত থেকে অব্যাহতিলাভের আশঙ্কাই প্রবল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক নয়? এ-কথা যুক্তিসিদ্ধ, তবে মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। জনসাধারণের মনে যে সঙ্কল্প, যে আত্মবিশ্বাস বর্ত্তমান—তাকে হত্যা করাই হলো একনায়কের প্রথম কাজ। শ্রান্ত জনসাধারণ তখন এক সর্ব্বময় ত্রাণকর্ত্তার হাতেই তাদের সমস্ত বোঝা তুলে দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। জাতি যখন দেখে যে সে ভগ্নহাল, খণ্ডিত ও দরিদ্র হয়ে পড়েছে—শক্তিমান ব্যক্তি ও ক্ষমতাশালী দলের মিষ্টি কথায় বিভ্রান্ত হয়ে সহজেই সে তখন তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে' বসে। যারা

মেরুদণ্ডহীন,* যারা দুর্ব্বল—তাদের কাছে শক্তির এক দুর্ব্বার আকর্ষণ রয়েছে।

একনায়ক তার কার্য্যকলাপে জনসাধারণকে তার প্রতি বিরূপই করে তোলে বটে, তবে তাদের প্রতিরোধ-শক্তিকেও সে নষ্ট করে' দেয়। হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটবার আগে জার্ম্মান জাতি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, তা নইলে অভ্যুত্থানই ঘটতোনা তাঁর। হিটলারকে পাবার ফলে তারা আজ দুর্ব্বলতর হয়ে পড়েছে। জার্ম্মানী আজ ইউরোপের পীড়িত দেশ।

ইউরোপ ও এশিয়াব জনসাধারণ এবং এই দুই মহাদেশের দুর্ব্বল দেশগুলি আজ নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকে আজ বন্ধু এবং আদর্শ তালাস করে ফিরছে তারা। যা ঘটেচে এবং যা ঘটছে—তাতে তারা শঙ্কিত। তারা আজ নতুনতর কিছু চায়, শ্রেয় কিছু। এ যুদ্ধ তাদের জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে দিয়ে গেছে। এতদিনকার শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের উপরে আজ আর তাদের কিছুমাত্রও শ্রদ্ধা নেই। শান্তির সঙ্গীত শুনবার জন্যে তারা আজ উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া, এশিয়ার জনসাধারণ ও উপনিবেশিক মানুষদের মনে শ্বেতাঙ্গসমাজ এবং পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আজ আর কিছমাত্রও শ্রাদ্ধা অবশিষ্ট নেই। তারা দেখ্ছে যে শ্বেতাঙ্গরা আজ তাদের নিজেদের সমস্যারই কোনও কিণারা করতে পারছেনা। সে সমস্যা শান্তি এবং সমৃদ্ধিরই সমস্যা। প্রগতির পথে মানবসমাজ যে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছে তাতে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা আজ স্বয়ংক্রিয় বিমান, র‍্যাডার, পেনিসিলিন, পরমাণু-শক্তি এবং প্লাস্টিক্স্ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছি। শক্তি এবং উদ্ভাবনীক্ষমতার প্রতি অশ্বেতাঙ্গ মানুষেরা সহজেই আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে

ক্ষমতা যদি নীতিবোধ ও ন্যায়বিচারের সহযাত্রী না হয় তবে তারা তাতে প্রতিরোধ-বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্ত্য শক্তি এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রাচ্য ভূখণ্ডে আজ বিদ্রোহ জেগে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্য যদি আজ নিজের রূপান্তর না ঘটায় তবে সে তার মর্য্যাদা হারাবে।

১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে জাপানের হাতে বৃটেনের পরাজয় ঘটে, তা ছাড়া বৃটেন আজ দুর্ব্বলতরও—পাশ্চাত্ত্যশক্তির বিরুদ্ধে প্রাচ্যের বিদ্রোহ এতে তীব্রতর হয়ে উঠ্‌বার অবকাশ পেয়েছে। ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডও আজ তাদের যুদ্ধপূর্ব্ব শক্তির তুলনায় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আমেরিকার অবস্থান বহু দূরে—প্রাচ্যের কাছে সে ততটা পরিচিতও নও। রাশিয়াও আজ পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পাঁয়তারা কষছে। প্রাচ্য তাতে উৎসাহিত।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এশিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে।

পূর্ব্ব, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় রাশিয়া যে ঘাঁটি পেতেছে তা বেশ শক্তসমর্থ। রাশিয়ার এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা এশিয়া মহাদেশীয়। বলশেভিক বিপ্লব তাদের কাছে এক নূতন দিক্‌চক্রবাল হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে বিপ্লব নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাদের কাছে। রাশিয়ায় জনসংখ্যা এবং তার শিল্পতৎপরতার ভারকেন্দ্রকে যুদ্ধপূর্ব্বকালেই পূর্ব্বদিকে সাইবেরিয়া ও তুর্কীস্থানের দিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল। তার উপরে যুদ্ধের সময় কারখানা এবং শ্রমিকদের অপসারিত করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ায় উপরোক্ত প্রক্রিয়া আরও দ্রুতগতি হয়ে ওঠে। এটা একটা স্থায়ী ব্যাপার।

এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশের জীবনেই সোভিয়েট রাশিয়া আজ এক তুমুল গুরুত্ব নিয়ে জড়িয়ে গেছে ;—যেমন ইরাণে তেমনি

আভায়, যেমন মাঞ্চুরিয়ায় প্যালেষ্টাইনেও তেমনিই। ভৌগোলিক অবস্থান, সোভিয়েট-নীতি এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণেই দায়ী। তা ছাড়া এর আরও একটা কারণ হলো এই যে এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশই আজ জরুরী, জটিল ও অমীমাংসিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদ্বারা পিষ্ট হচ্ছে। বৈদেশিক প্রভুত্বও দুর্বিংষহ হয়ে উঠেছে সেখানে।

পুরোনো প্রভুদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে এশিয়াবাসীদের মনে আজ যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয়েছে সে আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিরোধ্য —যুক্তি দিয়ে ঠেকানো যায়না তাকে। জাপানী প্রভুরা যে বৃটিশ প্রভুদের চাইতে আরো খারাপ হবে বর্ম্মী জনসাধারণের প্রতি সে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে' কোনও লাভ হয়নি। বৃটিশদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে চেয়েছিল তারা, তাই তারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

রাশিয়া যে স্বার্থপর এবং সাম্রাজ্যবাদী, পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় রাশিয়ার পক্ষেই যে এশিয়া মহাদেশে কায়েম হয়ে বসে' প্রভুত্ব করবার সম্ভাবনা অধিক—এশিয়াবাসীদের কাছে আজ আর সে কথা বলে' কোনও লাভ নেই। বহু প্রাচ্যদেশীয়ের কাছেই বল্‌শেভিক বিপ্লব হচ্ছে বর্ণসাম্য, নিপীড়িতের অধিকার, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পাশ্চাত্ত্যের সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধনেরই প্রতীক। অতএব সেই বলশেভিক বিপ্লবকেই স্ট্যালিন আজ তাঁর মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার কথা বলতে লোকের এখনো মনে পড়ে যে, চীন এবং ইরাণে অকুণ্ঠভাবে সে তার সুযোগসুবিধা বর্জ্জন করেছিল, ১৯২১ সালে তুরস্ককে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিল সে।

রাশিয়া আজ এক রাজ্যবিস্তারশীল আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তৈলসম্পদের ক্ষেত্রে সে আজ যে সাম্রাজ্যবাদী

কার্য্যকলাপে মত্ত হয়ে উঠেছে, যেমনভাবে সে আজ চুক্তিপত্র এবং ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রসমূহের অধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে, যেমনভাবে মাঞ্চুরিয়ার সম্পদ্ লুণ্ঠন করে নিয়েছে সে—তাতে, লেনিনের কার্য্যকলাপে প্রাচ্যদেশে রাশিয়ার যে সুনাম গড়ে উঠেছিল দ্রুত অবসান ঘটছে তার। দু-এক দিনের জন্যে মাত্র লেনিনের আদর্শের আস্তরণে ষ্টালিনের কার্য্যকলাপকে মুড়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সে কার্য্যকলাপ এখন বড় বেশী নৃশংস, বড় বেশী জঘন্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রাশিয়ার গুণাবলীর জন্যেই যে কিছু কিছু এশিয়াবাসীর মনে রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার হয়েছে তা নয়। প্রাচ্যদেশীয়েরা দীর্ঘদিনের জন্যে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলেই জেনে এসেছে—প্রাচ্যদেশীয়দের কাছে তাদের প্রভুত্ব এখন দুর্বিবসহ। রাশিয়া হচ্ছে সেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহেরই প্রতিদ্বন্দ্বী—রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার হবার এই হলো প্রকৃত কারণ। গভীর আবেগ থেকে এ সহানুভূতির সৃষ্টি—তাই যুক্তি অথবা তথ্য দিয়ে তার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়।

কমিউনিষ্টরা চায় যে, চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেয়া হোক। রাশিয়ার সুনাম তাতে আরো বর্দ্ধিত হচ্ছে। এশিয়া এক বিরাট মহাদেশ—সেখানকার চাষী এবং গোচারকরা দারিদ্র্যজর্জ্জর, বস্ত্রহীন, নিরক্ষর। এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশেই দেখা যাবে যে, একদল ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী, অভিজাত সম্প্রদায় এবং রাজ-কর্ম্মচারীরা নির্ম্মমভাবে জনসাধারণকে পেষণ করে চলেছে। ফলে সর্ব্বত্রই প্রতিবাদ-আন্দোলন অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। যে যুবসম্প্রদায় এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন প্রায়ই দেখা যাবে যে, তাঁরা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ অথবা মস্কোর শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার তাঁরা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাতে চান।

চীন, ভারতবর্ষ, ইরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত দেশেও প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করতে হবে। পশুর মতো যারা এতদিন জীবনধারণ করে এসেছে—একমুঠো মাটি, একটুকরো জমি, এর চাইতে দামী জিনিষ তাদের কাছে আর কিছুই নেই। রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া-লুণ্ঠনের পিছনে চীনা কমিউনিষ্টদের নিরুচ্চার সম্মতি ছিল সত্যি, কিন্তু নিজেদের শাসনাধীন এলাকায় কৃষকদের হাতে তারা জমিও তুলে দিয়েছে। ভারতীয় কমিউনিষ্টরা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল; যে মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্যই হলো জমিদার সেই মুসলিম লীগকেও তারা তোষণ করে চলে, একযোগে কাজ করে তাদের সঙ্গে। কিন্তু সেইসঙ্গে তারা চাষীদেরও সংগঠিত করে তুলছে, নৌবিদ্রোহের মতো যে কোনও সহিংস বিক্ষোভের সময়েও তারা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' এশিয়ার অবস্থা দুর্দ্দশাপীড়িত। সে দুর্দ্দশা যে কতখানি ব্যাপক, সে দুরবস্থা যে কতখানি গভীর—স্বচক্ষে না দেখলে তা কেউ ধারণা করতে পারবেননা। চারদিক যখন তমসাচ্ছন্ন—ক্ষুদ্র দীপশিখাকেই তখন জ্যোতির্ম্ময় সঙ্কেত বলে' ভ্রম হয়; চারদিকে যখন মরুভূমি—যে কোনও রকম জলই তখন নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে মানুষ।

রাশিয়ার ক্ষমতা, মর্য্যাদা এবং অতীত ইতিহাস—এ-সবই চীনা কমিউনিষ্টদের পালে হাওয়া জুগিয়ে এসেছে সন্দেহ নেই, তবে তাদের শক্তির উৎস আরো আমোঘ। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক জমিদারকুল দ্বারা পরিবৃত। তাঁর অফিসারদের মধ্যেও অনেকেই হচ্ছেন জমিদার, নয়তো জমিদারপুত্র। ফলতঃ কমিউনিষ্টরা ভূমি-ব্যবস্থার যে সংস্কারসাধন করেছে তাকে তিনি বাধা দিয়েই এসেছেন। কমিউনিষ্টরা ক্রেমলিনের পথানুসারী। তাতে চীনের উপরে রাশিয়ারই

প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কার্য্যকলাপ যদি চীনের স্বার্থবিরোধী হয়—তবুও।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-সমূহের সম্মুখে এই হলো রাশিয়ার তুমুল উক্তি।

এশিয়া এবং ইউরোপ সম্পর্কে আজ এক নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন, ইটালী, গ্রীস এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যদি আজ সেই নবব্যবস্থাকে দূরে ঠেলে দিয়ে অতীত এবং পর্য্যুষিত নীতিকেই আঁকড়ে থাক্‌তে চায়—রাজা, জমিদার, যুদ্ধবাদী এবং বৈদেশিক প্রভুকেই যদি আজ কায়েম করতে চায় তারা—মস্কোই তাহলে মক্কা হয়ে দাঁড়াবে।

আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া

অশ্বেত জাতির প্রগতির জন্য স্থাপিত জাতীয় সমিতির সম্পাদক নিগ্রোনেতা ওয়াল্টার হোয়াইট মাঝে মাঝে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতেন। রুজভেল্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পর ওয়াল্টার হোয়াইট ট্রুম্যানের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে হোয়াইট হাউসে যান। তিনি ট্রুম্যানের অফিসে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রুম্যান বলে উঠলেন: আপনি কি ভাবছেন। আমি জানি। আপনি ভাবছেন—কি আশ্চর্য্য, প্রেসিডেণ্ট তো এখানে বসে নেই?"

কিছুদিন পর দুজন লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকালে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেন: "আমি তো একাজ চাইনি। আমি একাজ চাইনে।"

জাগতিক ব্যাপারে আমেরিকার যে অবস্থান, সে অবস্থানই আমেরিকার কাঁধে এমন সব কাজ চাপিয়ে দিচ্ছে যা সে চায়না। সাগরপারের চাকুরী থেকে "ছেলেদের ফিরিয়ে আনো" দাবীর মত কোন দাবীই এত জোরালো, এত ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়নি, এত দ্রুত সফল হয়ে ওঠেনি। মার্কিণ জনসাধারণ চেয়েছিল তাদের ছেলেরা ফিরে এসে বাড়ীর সামনের অলিন্দে স্থান নিক, চাষ আবাদে লাগুক। আমেরিকান জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদী নয়। তারা বিশ্বস্তভাবে ট্যাক্স দেয় ট্যাক্সকে ঘৃণাও করে। যুদ্ধজাহাজ ও আমলাদের খাতে ব্যয়সঙ্কোচ ঘটানোর চেয়ে প্রিয়তর কিছু তাদের নেই। "সোনার বেণী" আর "পেতলের টুপিরা" হল তাদের সবচেয়ে অপ্রিয়। জঙ্গীবাদ বিরোধী মনোভাব সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই বিশেষ প্রবল।

"সোনার বেণী" আর "পেতলের টুপিরা" দ্বীপে দ্বীপে ঘাঁটি চান, বিরাট নৌবহর, বিমানবাহিনী আর সেনাদল। বিশেষ স্বার্থ আছে

এমন সব ব্যক্তিরা আরবের তেল কামনা করেন। তাদের অনুগামীর সন্ধান মেলে "জাতীয়তাবাদী" আর "দেশভক্ত"দের মধ্যেই। অফিসমহলে তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তির জোরও আছে। কার্য্যকারিতার দিক থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের মনোভাবও কখনো কখনো অল্প কয়েকজনের চক্রান্তের কাছে হার মানে।

জাপানের কাছ থেকে অকিনাওয়া, সাইপান আর ট্রুক কেড়ে নেবার প্রয়োজন নেই; এমন যদি হয় যে জাপানে নূতন সব আইন তৈরী হল—আর আমেরিকা জাপানকে সে সব আইন খাটাতে বাধ্যও করতে পারে, সে অবস্থার কোন সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখবার প্রয়োজনই থাকবেনা। সে যা হোক, সমরলিপ্সুরা এখন যুক্তি দেখাবেন যে প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আইসল্যাণ্ড গ্রীণল্যাণ্ড, বা এল্যুসিয়ন দ্বীপপুঞ্জ—আর বড়ো বড়ো অস্ত্রশস্ত্র হবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। পৃথিবীর ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এ যুক্তি জনসাধারণের মধ্যে সহানুভূতিসূচক প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলতে পারে।

আমেরিকা জাতি সম্বন্ধে সচেতন, সচেতন বর্ণসম্বন্ধে। পার্থক্যের ব্যাপারে এ ধরণের অসহিষ্ণুতা গণতন্ত্র বা খৃষ্টধর্ম্ম কোন কিছুরই অঙ্গ নয়। তবুও বলতে হবে, আমেরিকা প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতিও নয়, জনসাধারণ বিশেষ করে গীর্জ্জার দলগুলির চাপে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাসেবী সমিতিগুলিকে সেবাশুশ্রূষার জন্যে জার্ম্মানীতে জাহাজ পাঠাতে অনুমতি দেন। মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জাপানে যে নীতি অনুসরণ করছেন সে বিষয়ে আমেরিকানরা মোটামুটি খুশী; এতে ব্যয়বাহুল্যও নেই, আর এটা বাস্তবনীতি সম্মতও। তার ওপর কোন রূঢ়তাও নেই এতে। সোভিয়েট জনসাধারণদের প্রতি আমেরিকানরা বন্ধুভাবাপন্ন, তাদের প্রতি আমেরিকানদের সম্মানের মনোভাবও আছে। চৈনিকদের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্বন্ধ তাদের একটা ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

ইতালীয়ানরা তাদের শত্রু ছিল একথা স্মরণ করাও তাদের পক্ষে কঠিন।

দুঃখভোগে আমেরিকানেরা সাগ্রহে সমবেত হয়—এটা তাদের আদর্শবাদ বা ধর্ম্ম হতে পারে, হতে পারে এটা তাদের অতি সচ্ছল জীবনযাপনের জন্যে অপরাধজ্ঞানের ফল। ক্ষুধার্ত্তকে খাওয়াতে তারা ভালবাসে।

একটিমাত্র আদর্শবাদের প্রেরণায় তারা উদ্‌বুদ্ধ—তাতেই তারা আক্রমণকারী, অত্যাচারী বা একনায়কদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আমেরিকানরা নিপীড়িতের পক্ষ নেওয়াই পছন্দ করে।

স্বাধীনতাকে আমেরিকানরা স্বাভাবিক অধিকার বলেই মনে করে।

আমেরিকানরা চায় পৃথিবীর সবাই তাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করুক।

আমেরিকানেরা নূতন পৃথিবী গড়ার ভাল উপাদান।

কিন্তু……আমেরিকানরা ভয় পায় পাছে তারা শোষক হয়ে পড়ে। তাদের অনভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ কেউ নেবে—এ তারা অত্যন্ত অপছন্দ করে। প্রাচীনতর দেশগুলি তাদের বোকা বানাবে এ ভয় তারা করে। তারা যে যার কাজ করাই পছন্দ করে, অন্য কারুর কাজে মাথা ঘামাতে তারা বিব্রতই বোধ করে। নাইলন মোজা, ফ্রিজিডেয়ার, হাভানা সিগার, ঘোড়দৌড়, ডিটেকটিভ গল্প, কমিক, আর নূতন মোটরের মডেল—এসব জিনিষে ভরা পৃথিবী উপভোগ করতে ভালবাসে আমেরিকানরা। এটম বোমা, সুপারফোর্ট্রেস, রাজনীতির দ্বন্দ্ব, আর শত শত সমস্যাজড়িত পৃথিবীতে তারা বাস করছেন তা তারা জানে।

এভাবে দেখা যায়, আমেরিকানদের মস্তিষ্ক হল পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহের একটা আঁটি। আমেরিকানরা এখন পর্য্যন্ত তাদের যুদ্ধোত্তর দায়িত্বের উপযুক্ত হবার চেষ্টাই করছে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

শক্তি হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনে এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। আমেরিকা যেন এক শিশু—বিরাট ডিসেল ইঞ্জিনের মুখে হাত দিয়ে সে বসে আছে। যে কোন অঘটনই ঘটে বসতে পারে।

১৯৪৫ সালের ১৬ই এপ্রিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন: "সঙ্কোচমান পৃথিবীতে ভৌগোলিক প্রাচীরের আড়ালে নিরাপত্তার সন্ধান অর্থহীন। আইন ও ন্যায়বিচারের মধ্যেই প্রকৃত নিরাপত্তা সম্ভব হতে পারে।" সুন্দর। ১৯৪৫ সালের ২৮শে অক্টোবর নিউইয়র্কে তিনি বলেন: "পৃথিবীর কোন অংশেই এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানও আমরা চাইনে।" চমৎকার! কিন্তু এর পরেই তিনি আরও বলেন: "আত্মরক্ষার জন্য ঘাঁটি স্থাপন করবার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি নেই, এমন ভাবে অন্য কোন শক্তির কোন অঞ্চলই আমরা চাইনে।" ট্রুম্যান কংগ্রেসকে বলেন যে "প্রকৃত নিরাপত্তা লাভ সম্ভব আইন ও ন্যায়বিচারের মধ্যেই", তবু নিরাপত্তার জন্যে তিনি দ্বীপে দ্বীপে ঘাঁটি চান। ট্রুম্যান একদিন বলেন আইনের কথা, অন্যদিন বলেন দ্বীপে দ্বীপে ঘাঁটির কথা বা যুদ্ধের কথা—এর অর্থ কি? এর কারণ, আইন কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা না করলে আইনেরই অস্তিত্ব থাকেনা। আর বৃহৎশক্তিগুলির ওপর আইন খাটাবে কে, কোন জাতির ওপর আইন খাটানোর শেষ পন্থা, অধিকাংশ সময়ে একমাত্র পন্থাই হল সে জাতির ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করা।

যে পৃথিবী এটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে আর জাতীয়তাবাদের প্রাচীর দিয়েছে ভেঙ্গে, সে পৃথিবীতে বাস করায় পরস্পরবিরোধী ভাবের মধ্যে পড়ে গেছে আমেরিকা। এই একই পরস্পরবিরোধী ভাবের জালে সকল জাতিই বাঁধা পড়েছে। এই পরস্পর-বিরোধী ভাবে হয়তো মানবজাতির শ্বাস রোধ হয়ে প্রাণান্তই ঘটাবে।

অনেকে খুব জোর দিয়ে বলে থাকেন, রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ

কর। কিন্তু রাশিয়া যদি তার গতি রোধ করতে না চায়? এর একমাত্র উত্তরই কি আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ? সেটা কি হবে প্রথম আণবিক যুদ্ধ? প্রত্যেক জাতি, বিশেষ করে প্রত্যেক শক্তিমান জাতির মত নিজের ইচ্ছাই রাশিয়ার কাছে আইন। পৃথিবী হয় আন্তর্জ্জাতিকতাবাদের পথে এগিয়ে যাবে, নয়তো এক আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। কাজেই এ পৃথিবীতে রুশ-সমস্যা হচ্ছে জাতীয়তাবাদেরই সমস্যা।

পৃথিবীব্যাপী একটি তৃতীয় মহাসমরের সম্ভাবনা কোন পথে?

এ মহাসমর সুরু হতে পারে কি ভাবে।

১৯৪৫ সালে সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনের প্রাক্কালে এণ্টনী ইডেন (তিনি তখন ছিলেন বৃটিশ বৈদেশিক সেক্রেটারী) গ্লাসগোতে বলেন: "ইদানীংকালের ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে আমরা বরাবরই চেষ্টা করেছি যাতে করে ইউরোপ কোন একটি শক্তির কবলে গিয়ে না পড়ে। হয়তো কোন কোন সময় আমাদের চেষ্টার গতি হয়েছে মন্থর। আমরা নিজেদের জন্মে কখনো সে-ক্ষমতা চাইনি—আর আমরা অপর কোন শক্তিকেও সে-ক্ষমতা লাভের অধিকারী হতে দিইনি। কারণ, একথা আমরা জানতাম যে তাহলে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থায় আমাদের দেশের স্বাধীনতাও আর থাকবে না। এজন্মে তিন তিনটি জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ আমাদের চালাতে হয়েছে।

একই কারণে যুক্তরাষ্ট্র দু দু'বার যুদ্ধে নেমেছে।

ইউরোপ যাতে কোন একটি শক্তির কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে, সেজন্মেই ইংলণ্ড আর যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নেমেছিল। রাশিয়া যাতে ইউরোপে একাধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সেজন্মে ইংলণ্ড আর আমেরিকা এবারও ব্যস্ত। ইউরোপে প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হলে রাশিয়া এশিয়ায়ও প্রভুত্ব বিস্তার করবে। ইউরোপ

আর এশিয়ার সমস্যা মিশে এক হয়ে ইউরেশিয়ান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপ বা এশিয়ায় যেখানেই রাশিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করুক না কেন, তা নিয়ে আমেরিকার মাথা ঘামাতে হয়। একই কারণে তা নিয়ে বৃটেনেরও মাথা ঘামাতে হয়।

মার্কিণ ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিবেচনায় ইউরোপ বা এশিয়ায় ক্ষুদ্র বা দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির ওপর রুশ-আধিপত্যের অর্থ ই হল দেড়শত কোটি মানুষের ওপর রুশ-কর্ত্তৃত্ব স্থাপন, আর এজন্যেই পৃথিবীর বাকী অংশের পক্ষে তা আশঙ্কার ব্যাপার।

হিটলার বা জাপ-অভিযানের মধ্যে ছিল একই ভয়—ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেঁধে গেল।

হিটলার বোঝাতে চাইলেন যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই জার্ম্মানীকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। নাৎসীরা পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগই এনে বসল। পৃথিবীর সবাই হেসে উঠল—বাধ্য হল যুদ্ধে নামতে।

ইদানীংকালে বলশেভিকরাও নাৎসীদের উল্টোধরণের আক্রমণের ধারণার অধিকারী হয়েছে। ১৯৩৯ সালে স্টালিন আর মলোটভ কি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নি? অন্যান্য স্থানের কমিউনিস্ট সাধারণ লোক বা কমিউনিস্ট সহচররা কি একই অর্থহীন উক্তি করে যায়নি? একনায়কত্বের উপাসকরা প্রায়ই অভদ্র কথাবার্ত্তার দোষে দোষী। কিন্তু তাঁরা নিজেদের কুৎসার দাস হয়ে পড়েন না; তাঁদের আশা অন্যেরাও তা হবেন।

যে কোন অঞ্চলে যে কোন আক্রমণাত্মক কাজই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সংকেত হয়ে দাঁড়াতে পারে—সে আক্রমণ যত প্রচ্ছন্নই হোক না কেন, যত অজুহাতই দেখান হোক না তার পক্ষে।

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপানের আক্রমণ সুরু হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম গোলা বর্ষিত হল। কিন্তু দশ বছর পর ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর পৃথিবীর অপর প্রান্তে পার্লহারবারে তার প্রতিক্রিয়া না পৌছান পর্য্যন্ত বহু লোকই সে-আওয়াজ শুনতে পাননি।

বাহ্যতঃ বুদ্ধিমান বলে মনে হয় এমন আমেরিকানদের প্রবন্ধ বা বক্তৃতা আমি পাঠ করেছি, তারা বলেন: "আমেরিকা আর রাশিয়া পরস্পর থেকে বহু দূর বিচ্ছিন্ন, কোন ভূখণ্ড নিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধবে কেন?" আমেরিকার সঙ্গে জার্ম্মানীরও কোন বিবাদ ছিল না; তবু জার্ম্মানীর ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপার নিয়ে আমেরিকা দু' দুবার যুদ্ধে নামে। যাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে ভূখণ্ড সম্পর্কিত সংঘাতের অস্তিত্ব না দেখে নিশ্চিন্ত হন, তাঁরা সাধারণ ভূগোলের ওপর অতিরিক্ত নজর দেন। আর পৃথিবীজোড়া রাজনীতির ওপর নজর দেন না মোটেই।

বৃহৎ কোন শক্তি অপর কোন বৃহৎ শক্তিকে আক্রমণ করল—এভাবে যুদ্ধ বাধে না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে বৃহৎশক্তির ক্ষুদ্রশক্তিকে আক্রমণ করা নিয়ে। আবিসিনিয়া, স্পেন, মাঞ্চুরিয়া, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া আর পোলাণ্ড আক্রান্ত হল—ওহামা, লিভারপুল ও লেলিনগ্রাড থেকে ছেলেরা হল ঘরছাড়া—তাদের সমাধি ঘটল পৃথিবীর নানা জায়গায়।

আমাদের সকল দুঃখদুর্দ্দশার সুরু হয় ক্ষুদ্র দেশগুলি আক্রান্ত হলে, রাশিয়া কি এরি মধ্যে আক্রমণ সুরু করেছে?

আক্রমণের এক চমৎকার সোভিয়েট সংজ্ঞা রয়েছে। এ সংজ্ঞার রচয়িতা সোভিয়েট বৈদেশিক কমিশার ম্যাক্সিম লিটভিনভ্। প্রথমে সোভিয়েট, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লোভিয়া, তুরস্ক, লিথুয়ানিয়া ও পরে পোল্যাণ্ড, ইরাণ, আফগানিস্থান, ফিনল্যাণ্ড,

এসথোনিয়া ও ল্যাটভিয়া ১৯৩১ সালের ৪ঠা জুলাই লণ্ডনে এক চুক্তিতে এ সংজ্ঞা গ্রহণ ক'রে স্বাক্ষর করে।

চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় যে নিম্নলিখিত যে কোন একটা কাজ করলেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র "আক্রমণকারী" বলে অভিহিত হবে।

(১) অপর কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে।

(২) কোন দেশের সশস্ত্রবাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করে বা বিনা ঘোষণায় অপর কোন দেশের ভূখণ্ড, জলযান বা বিমানপোত অবরোধ করলে।

(৩) জল, স্থল বা বিমানবাহিনীর সাহায্যে ঘোষণা করে বা বিনা ঘোষণায় অন্য দেশের ভূখণ্ড, জলযান বা বিমানপোত আক্রমণ করলে।

(৪) অন্য রাষ্ট্রের উপকূল বা বন্দর নৌবাহিনী দিয়ে অবরোধ করলে।

(৫) যদি কোন দেশের অভ্যন্তরে গঠিত সেনাদল অপর কোন দেশকে আক্রমণ করে তবে সে-সেনাদলকে সহায়তা করলে।

এ চুক্তির পরিশিষ্ট মূল চুক্তির চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক—উদ্দেশ্যও তাতে অধিকতর স্পষ্ট। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ কোনপ্রকার আক্রমণকেই নিম্নলিখিত অন্যতম কারণগুলির অজুহাতে যুক্তিযুক্ত বলে দাবী করা চলবেনা :

"ক। কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা—যেমন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো, শাসনকার্য্যে ত্রুটির অভিযোগ, ধর্ম্মঘটমূলক গোলমাল, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ......"

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সরকারী সংজ্ঞার ভিত্তিতে বিচার করলে—ফিনল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এসথোনিয়া এবং ইরাণে সোভিয়েট সরকার আক্রমণ সুরু করেছেন। সবগুলি দেশই

লিট্‌ভিনভ্‌ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বৃহৎ ত্রিশক্তির একটি যখন প্রভুত্ব বিস্তার করেই চলবে, তখন বৃহৎ ত্রিশক্তির ঐক্য আশা করা বৃথা। রাশিয়ার আক্রমণ ও বিস্তার দেখে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড সতর্ক হয়ে উঠেছে। ঐক্য ও আক্রমণ পরস্পরবিরোধী। কয়া বৃথা। ঐক্য আর বিস্তার — এ দুয়ের মিল সম্ভব নয়।

রুশ-মার্কিণ মৈত্রীর জন্যে ওকালতি করা আর একই সঙ্গে যে-রুশ-বিস্তার সেই মৈত্রীকে তিক্ত করছে তাকে ক্ষমা করা একই রকম নিরর্থক।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পোলিশ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল সিকরসি যেবার ক্রেমলিনে স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেবার স্টালিন প্রথম পোলাণ্ডের কাছে পোলিশ অঞ্চল দাবী করেন। মস্কো ১৯৪৩ সালে বৃটেনকে জানায় যে বাল্টিকসাগর-তীরের অঞ্চলগুলি অধিকার করা তার অভিপ্রায়। ১৯৪৩ সালেই মস্কো চেকোস্লোভাকিয়ার অঞ্চল দাবী করে।

রাশিয়া নিজেকে সম্প্রসারণ করে চলেছে, রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল প্রথমে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে তেহেরাণে, পরে ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টায় এরূপ মত প্রকাশ করেন। এটা হচ্ছে সে-সময়কার কথা যখন পর্য্যন্ত বৃহৎ ত্রিশক্তির মধ্যে কোন গুরুতর মতবিরোধ বা সংঘাত দেখা দেয়নি। তখন পর্য্যন্ত হিরোশিমার ওপর এটম বোমাও বর্ষিত হয়নি। সে সময় গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও গভর্ণমেণ্ট রাশিয়ার প্রতি মৈত্রীভাবে অসম্ভবরকম মুখর হয়ে উঠেছিল। রাশিয়াকে সাহায্য করার মনোভাবও ছিল তাদের সমান। সুতরাং এটা বলা যায় না স্টালিনের সম্প্রসারণ ও রাজ্য-বিস্তারের কারণ ইঙ্গ-মার্কিণের শত্রুতা।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে একটা আইন-কানুনের প্রবর্ত্তনের জন্যেই আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চালিয়েছিলাম। কারণ, আইনের পরিধি

যতটা, শক্তিরও অস্তিত্ব থাকে ততটাই। কিন্তু চুক্তি অগ্রাহ্য করে আক্রমণ করা হল আইনবিরুদ্ধ কাজ, অন্য কোন দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদেশে সেনাদল রাখাও আইন-বিরুদ্ধ। সুযোগ সুবিধার জন্য কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর চাপ দেওয়াও আইন-বিরুদ্ধ—এগুলি হচ্ছে ঠিক সেধরণের আইন-বিরুদ্ধ কাজ যার ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আইনভঙ্গকারী অন্যের নিরাপত্তা কেড়ে নেয়। আর সাধারণত শেষ পর্য্যন্ত নিজেও গোলমালে জড়িয়ে পড়ে।

'দি সোভিয়েটস্ ইন ওয়ার্ল্ড এফেয়ার্স' বলশেভিক রাশিয়ার সঙ্গে পুঁজিবাদী পৃথিবীর সম্পর্কেব বিশদ ইতিহাস আমি লিখেছিলাম। বহু বৎসর ধরে সোভিয়েট ইউনিয়নেব ওপর অহেতুকভাবে সশস্ত্র আক্রমণ চালান হয়েছিল, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাকে করা হয়েছিল বয়কট, কোন কূটনৈতিক সম্পর্কও তার সঙ্গে স্থাপন করা হয়নি। সোভিয়েটের রাষ্ট্রদূতদের হত্যা করা হয়েছিল, বাহিরের সোভিয়েট-অফিসগুলির ওপর চালান হয়েছিল হামলা।

সে ছিল এক যুগ। এ যুগেব অস্তিত্ব ততদিনই ছিল, যতদিন রাশিয়া তুলনামূলকভাবে দুর্ব্বল আর সাম্যবাদী ছিল। ততদিন রাশিয়ার মনে ছিল ভয়, আক্রমণ সে করেনি। এখন রাশিয়া শক্তিমান আর জাতীয়তাবাদী। এখন রাশিয়া আক্রমণশীল হয়ে উঠেছে। এ সম্পূর্ণ এক নূতন যুগ। ভয় থাকলে রাশিয়া আক্রমণশীল হত না।

গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নাৎসীরা চিনে উঠতে পারে না। তারা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে অবজ্ঞা করত, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংকল্পের ওপর তারা অবিচাব করেছিল। ষ্টালিন যে পথে চলেছেন তাতে মনে হয় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সম্বন্ধে তিনিও ওধরণের ধারণাই পোষণ করেন। সত্যের অপলাপ না করে ষ্টালিন এ

ধরণের স্বগতোক্তি করতে পারেন: "জার্ম্মানী, পোলাণ্ড, বল্কান, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ফিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও সাখালিনে আমি যা চেয়েছিলাম, তেহেরান ও ইয়াল্টায় রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল আমাকে তাই দিয়েছিলেন। চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করার পূর্ব্বে তাঁরা যখন আমার পূর্ব্বপ্রুশিয়াব অঞ্চলবিশেষ অধিকার করার নীতি স্বীকরে বরেন, তাব আগেই আমি সে-অঞ্চল সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিলাম—আর তাতে তাঁরা আপত্তিও তোলেননি। তারপর রুমানিয়া, অষ্ট্রিয়া, পোলাণ্ড ও বুলগেরিয়ায় আমি এককভাবে আমার পছন্দমত গভর্ণমেণ্ট বসালাম। ইয়াল্টার চুক্তি ভঙ্গ বরেই আমি এটা করেছিলাম (যে বোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র বা প্রাক্তন একসিস্ তাঁবেদার রাষ্ট্রে সবল গণতান্ত্রিক গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিত্বমূলক অন্তর্বর্তী সরকাব গঠনের ব্যাপারে জনগণকে ত্রিশক্তি যুক্তভাবে সাহায্য করবে।) ট্রুম্যান, বার্ণস, এট্লী ও বেভিন এটা জানেন। তাঁরা যে এটা জানেন তা তাঁরা প্রবাশও করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে বিছুই তাঁরা করছেন না। প্রকৃতপক্ষে, জনমতের চাপে—আর আমার সেখানবার কমিউনিষ্ট পার্টির অবদানও যে তাতে ছিলনা এমন নয়, আমেবিবা ইউরোপ থেকে তার অধিবাংশ সৈন্যই সরিয়ে নিয়েছে। আমি তুরস্কের কাছে কার্স ও আদিহোন প্রদেশদ্বয় দাবী বরেছি। আর ইস্তাম্বুলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করবার জন্যে পটসৃডামে 'প্রণালীর ভেতর একটা দুর্গ'ও দাবী করেছি। এটা বেশ ভাল বথা যে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রণালীটা খোলা রাখতে স্বীকার হয়েছিল। বিন্তু আমার দুর্গের সাহায্যে প্রণালীর মুখ আমি বন্ধ করে দিতে পারতাম। কি অদ্ভুত! তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটা এত সাধারণভাবে নিয়েছিলেন। তাঁদের বিশেষ সক্রিয় বলে মনে হয় না। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের ভেতরে গোলমাল। আরবরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চীনদেশ দ্বিধাবিভক্ত। মার্কিণ

কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার বিভিন্ন ফ্রন্টগুলি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, উদারনৈতিক ও শ্রমিকদের কার্য্যকলাপ অচল করে, বেশ ভাল কাজই দেখিয়েছে। জার্ম্মান কমিউনিষ্ট পার্টি জার্ম্মানীতে নেতৃত্ব লাভ করতে চেষ্টা করছে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির জন্যে ফ্রান্স কোন বলিষ্ঠ কার্য্যক্রমই নিতে পারছেনা। ইউরোপ আর এশিয়া খাদ্যের অভাবে মরছে। আমি অতিবিরাট এক নূতন রুশ-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি। তাঁরা উট গিলেছেন, মশার ব্যাপার নিয়ে গোলমাল করবেন কি? ইরাণ আর তুরস্কের দিকে ফিরে দাঁড়ালে কি হয়। আমি একবার তা দেখতে চাই।"

আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এই মনোবৃত্তির সংযোগ, তারপর সামূহিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক সংঘাত—এ দুয়ের যোগাযোগে একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাসমরেরও সৃষ্টি এপথেই।

এ অবস্থায় কতক আমেরিকান ও ইংরাজ প্রস্তাব করেছেন যে আমেরিকা এটম বোমা তৈরী ছেড়েদিক। টি-এন্-টি বোমা, সুপার ফোর্ট্রেস আর সুপার-ড্রেড-নটস তৈরী বন্ধ করা যাক না কেন? নিরস্ত্রীকরণই বা হোক না কেন? কোন শক্তিই নিরস্ত্রীকরণে সম্মত হয়না কেন? এর কারণ, তারা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখতে পায়।

ধরা যাক, আমেরিকা আর এটম বোমা তৈরী করছেনা। তাতে করে কি এ নিশ্চয়তা মিলবে যে রাশিয়া এটমবোমা তৈরী করবেনা? সোভিয়েটের সর্ব্বত্র যে সব কলকারখানা, লেবরেটারী রয়েছে, রাশিয়া সে সব দেখ্‌তে দিতে সম্মত হবে কি? মস্কোর কাছে এ প্রশ্ন করতে হবে। রাশিয়া হল পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র, বহু বৎসর পর্য্যন্ত একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় সকল সোভিয়েট নাগরিককেই দেশের ভেতর পাশ-পোর্ট নিয়ে চল্‌তে হত—পুলিশকে তা দেখাতে

হত। * বৈদেশিকদের ওপর কড়া নজর রাখা হয়। এমনকি বৈদেশিক সংবাদদাতারা যখন কোন প্রাদেশিক সহরে গিয়ে শুধুমাত্র দৃশ্য দেখেন, সাধারণ লোকদের সঙ্গে আলাপ করে দেশের অবস্থা মোটামুটিভাবে বুঝতে চান, তখনও তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়না। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা সোভিয়েটের প্রত্যেক কলকারখানার আনাচকাচ খুঁজে দেখবেন এটম বোমা তৈরীহচ্ছে কিনা? কোন আন্তর্জ্জাতিক আণবিক কর্ত্তৃপক্ষ কি রাশিয়ার ইউরেনিয়াম সম্পদ ও আণবিক কলকারখানা পরিচালনা করবে! সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞানও যাঁর আছে তিনি এটা ভাবতেও পারেন না। যুক্তরাষ্ট্র ঋণ-ইজারার ভিত্তিতে সোভিয়েট সরকারকে আট বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও মালমসলা দিয়েছে। কিন্তু সে অবস্থায়ও মার্কিণ সেনা বিভাগের লোকজনদের সোভিয়েটের সীমানার ভেতর বা কলকারখানায় অল্পক্ষণের জন্য ছাড়া প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া হয়না।

কেহ কেহ বলছেন, রাশিয়াকে এটম বোমা দিয়ে দেওয়া হোক। এটম বোমা দিয়ে রাশিয়া করবে কি? জার্ম্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে? তার প্রয়োজনই নেই; জার্ম্মানী ও জাপান চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে তাদের ভূখণ্ড অধিকার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে? তাই যদি হয়, তাহলে রাশিয়াকে এটা দেওয়ার পক্ষে এমন কিছু সুযুক্তি নয়। রাশিয়া কি পরস্বাপহরণের জন্যে ক্ষুদ্র কোন শক্তির বিরুদ্ধে এটা প্রয়োগ করবে? রাশিয়াকে এটা দেবার পক্ষে এটাও এমন কিছু ভাল যুক্তি নয়।

এ-পক্ষ যুক্তি তোলেন: কিন্তু যেভাবেই হোক, এটম বোমা রাশিয়া লাভ করবেই। যে পর্য্যন্ত না রাশিয়া তা লাভ করে, সে পর্যন্ত কেবলমাত্র ইংগ-মার্কিণ শক্তির হাতে এটমবোমা থাকার

ফলে মস্কোতে সন্দেহের বীজই রোপিত হবে—দুই পৃথিবীর মধ্যে বিভেদ বেড়েই চলবে। হয়তো রাশিয়ার এটমবোমা রয়েছে; না হলে হয়তো রাশিয়া তা পেয়ে যাবে। বিখ্যাত আণবিক শক্তি বিষয়ক পদার্থবিদ্ অধ্যাপক হ্যারল্ড, জে, উরে ১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে, বলেন যে রাশিয়ানরা সম্ভবতঃ তিন বছরের মধ্যেই এটমবেমা তৈরী করতে পারবে। অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলেন পাঁচ থেকে দশ বৎসর। কিন্তু ধরা যাক, তা তিন বছর না হয়ে দুবছর, একবছব বা ছয়মাস হয়ে দাঁড়াল। ইউবোপ ও এশিয়ার মানচিত্র প্রতিদিনই কোন না কোন ভাবে নূতন করে তৈরী হচ্ছে এবং রাশিয়া এটমবোমা লাভকবলে সে-মানচিত্র এমনভাবে তৈরী হতে পারে যে তা ইউবোপ আব এশিয়াব পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইউবেশিয়ার দুর্ব্বল বাষ্ট্রগুলি এখনই রাশিয়ার ভয়ে কম্পমান। বাশিয়ার হাতে এটমবোমা থাকলে সে ভীতি আরও বেড়ে যাবে। এতে করে আমেরিকা ও ইংলণ্ড এখন যেভাবে রুশ-তোষণ করে চলেছে, তার চেয়েও বেশী তোষণ সুরু করবে। এদিক নিয়ে দেখতে গেলে, রাশিয়াকে এটম বোমা দান করলে আমরা যুদ্ধের বাইরে থাকতে পারব। তোষণ নীতি গ্রহণ করলে সব জাতিই যেমন যুদ্ধের বাইবে থেকে যায়—কিন্তু অল্পকালের জন্যেই তা সম্ভব। সে অবস্থায় তোষণের ফলে যে যুদ্ধ দেখা দেয় তা আরও খাবাপ।

আণবিক তথ্যের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে কি রাশিয়া সন্দেহ আর ভয় থেকে মুক্ত হবে?

আমি বলেছি: "এটা সত্যি নয় যে আমেরিকার এটম বোমা আছে।" শুনে শ্রোতারা চমকে গেল। বাস্তবিকপক্ষে অবশ্য আমেরিকার এটম বোমা আছে। কিন্তু কোন অবস্থায় আমেরিকা তা ব্যবহার করবে?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তমহাসাগরীয় নৌবাহিনীর কমাণ্ডার এড্‌মিরাল চেষ্টার, ডব্লিউ, নিমিংস্‌ ওয়াশিংটন ডি-সিতে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় এক অদ্ভুত কথা বলেন : "এটম বোমার দ্বারা জাপানের পরাজয় ঘটে নাই। বাস্তবিকপক্ষে হিরোশিমা ধ্বংসের ঘোষণা দ্বারা পৃথিবীতে আণবিক যুগের কথা ঘোষিত হবার পূর্ব্বেই, যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের আগেই, জাপান সন্ধি প্রার্থনা করে।

জাপানের পরাজয় ঘটানোর ব্যাপারে বিশুদ্ধ সমরকৌশলের দিক থেকে এটম বোমার কোনও চূড়ান্ত অবদান ছিলনা বলতে গিয়ে এই নূতন অস্ত্রের বিস্ময়কর শক্তিকে লঘু করে দেখাবার কোন চেষ্টা হচ্ছে না।

একথা যদি ঠিক হয়,—আর নিমিংসের তো জানবারই কথা—তাহলে হিরোশিমার ওপর এটম বোমা বর্ষণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বর্ব্বরতম অনুষ্ঠান বলতে হবে—নাগাসাকির ওপর দ্বিতীয় এটম বোমা বর্ষণের তো কথাই নাই। জাপ-বিরোধী সংগ্রামের অবসান হয়তো এতে দ্রুততর হয়েছে—তা সত্বেও এতে বর্ব্বরতার কিছু লাঘব হয়নি।

তা সত্বেও একথা সত্যি যে এটা ধারণাই করা যায় না, যুক্তরাষ্ট্র শান্তির সময় সুবিধা আদায়ের জন্যে মেক্সিকো, আর্জ্জেন্টিনা, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের ওপর এটম বোমা বর্ষণের আদেশ দেবে। যতদিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকবে, যতদিন সেখানকার জনমত বলিষ্ঠ, বিচারশীল ও মুক্ত থাকবে, ততদিন তা ধারণার বাইরেই থাকবে।

এটম বোমার হাত থেকে রক্ষার পথ আছে। সে পথ গণতন্ত্র।

স্টালিন জানেন যে প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র এটম বোমা ব্যবহার করবে না। সম্ভবতঃ তিনি আশা করেন যে ক্ষুদ্র কোন রাষ্ট্রের রক্ষার জন্যে এটম বোমা ব্যবহার করতে যুক্তরাষ্ট্র ইতস্ততঃ করবে।

মার্কিণ সংবাদপত্রে এমন বহু বিবৃতি আমি দেখেছি যেসব বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে সন্দেহ বা ভয় পোষণ করেন। সোভিয়েটের প্রকাশিত কোন লেখায়, ঘোষণায় বা সোভিয়েটের কোন কাজে এর কোন প্রমাণ আমি পাইনি। বাস্তবিকপক্ষে, রাশিয়া ভ্রমণ থেকে সদ্য ফিরে এসে ১৯৪৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কের এক ভোজসভায় সোভিয়েট-পক্ষপাতী লেখক জোসেফ বার্ণস্ বলেন যে রাশিয়ায় তিনি বহির্জগতের প্রতি দম্ভ আর বিদ্বেষের ভাবই দেখে এসেছেন।

পরিষ্কার দুটো কারণে রাশিয়া সন্দিগ্ধমনা বা ভীত কোনটাই নয়: বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ অবসানের পথে, আত্মরক্ষায় তৎপর; যুদ্ধজয়ের পর রণসজ্জার কথা আমেরিকা মন থেকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করেছে, যুদ্ধকালীন সেনাবাহিনীর দ্রুত বিলোপ ঘটিয়েছে। আর কারুর পক্ষে রাশিয়া আক্রমণ সম্ভব নয়—জার্ম্মানী, জাপান, ইরাণ, ফিনল্যাণ্ড, চীন, ফ্রান্স কারুর পক্ষেই নয়। বৃটেন দুর্ব্বল, আমেরিকা তার যুদ্ধকালীন সেনাদল এমনভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে যাতে বোঝা যায় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সে চায়না—এ দুটো কারণই স্টালিনকে উৎসাহিত করে তুলেছে, শক্তিকেই শ্রদ্ধা করে।

রশিয়ার কার্য্যকলাপের ব্যাখ্যা এভাবেই করা চলে যে আক্রমণের ভয় সে করে না, বরঞ্চ, সে যে আক্রান্ত হবে না সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত।

আমার মতামতে কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অন্যায় বা পক্ষপাতমূলক মনোভাব আর আমেরিকা বৃটেনের প্রতি অতি-সদয় বা অতি-বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখা গেল?

আমার মতামত আমি সতর্কাতর সঙ্গে পরীক্ষা করি। মার্কিণ ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কার্য্যকলাপ ও নীতির সমালোচনা করতে বা নিন্দা করতে কোনদিনই আমার দ্বিধা নেই। আমার প্রথম

আনুগত্য হল স্বাধীনতা, প্রগতি, শান্তি ও মানুষের সুখের প্রতি; যখন আমি মনে করি কেউ এসবের ওপর হস্তক্ষেপ করছে, তখন আমার মুখ খুলতেই হবে। সমালোচনার ফলে যুদ্ধ বাধে—এ আমি বিশ্বাস করিনে; বিপদ বা ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে নরম সুরে কথা বললেই দ্রুত যুদ্ধ ঘনাতে পারে। কেউ একজন একটা বক্তৃতা দিলেন বা বই লিখলেন, আর তারই ফলে হিটলার তার সেনা-বাহিনীকে জার্ম্মান সীমানার বাইরে রওনা করলেন—ব্যাপারটা এমন ভাবে ঘটেনি। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন তীব্র নিন্দাবাদ পাঠ করে স্টালিন তাঁর সেনাদলকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করেন না; তীব্র নিন্দাবাদের উত্তরে তিনি তীব্র নিন্দাবাদই করেন।

নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে চার্চ্চিল আগুনের ফুলকি ছোটালেও ১৯৩৯ সালে হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণ করেননি; তিনি আক্রমণ করেন অতি-ক্ষুব্ধ নির্ব্বাক পোল্যাণ্ডকে আর চেষ্টা করেন বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াতে। ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট থেকে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন পর্য্যন্ত সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ যে জার্ম্মানীর সমালোচনা থেকেই বিরত ছিলেন তা নয়, নতজানু হয়ে তোষামোদও করেছেন, আর তারপর জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে। যে সব প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিণ সংবাদপত্র সিণ্ডিকেট, বেতার ভাষ্যকার, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখক ও কংগ্রেসীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবিশ্রান্তভাবে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা আমার কাছে বিরক্তিকর। পার্ল হারবারের ঘটনার পূর্ব্বের স্বাতন্ত্রবাদী প্রচার কার্য্যের ফলেও যেমন আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি, এসব ব্যক্তিরাও তেমনি যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে তুলতে পারেন না। প্রচার কার্য্যের ফলে মনের কোন ধারণা জেঁকে উঠতে পারে, অথবা, প্রচারকার্য্যের দ্বারা মনের কোন ধারণার পূর্ণতা-লাভ বিলম্বিত করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তব সামরিক নীতিই যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে আসে—সেনাবাহিনীর মার্চ্চ, সহরের ওপর

বোমাবর্ষণ,—অর্থাৎ আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করলেই যুদ্ধ এগিয়ে আসে। রাশিয়ার আশঙ্কা বা ভাবনার কারণ ঘটতে পারে, বৃটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট এমন কিছু করেছেন কি ?

আর্জ্জেণ্টিনার একনায়কত্ব আর ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবার ইচ্ছার অভাবের জন্যে মার্কিণ গভর্ণমেণ্টকে সমালোচনা করা হয়েছে। ফ্রাঙ্কো-বিরোধী সংগ্রামে আমি সক্রিয়ভাবেই জড়িত ছিলাম, আর যে কোন ধরণের একনায়কত্বই আমি ঘৃণা করি। কিন্তু যুদ্ধরত নয় এমন কোন দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে বৃহৎশক্তিগুলির হস্তক্ষেপ করা মূলনীতি হিসাবে মেনে নেওয়া বিশ্ব-শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক বলেই আমার ধারণা। একদিন হয়তো একনায়কবাদী কোন গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করবার জন্যে কোন উদারনৈতিক সরকার হস্তক্ষেপ করল—তারপরদিন হয়তো দেখা গেল কোন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার কোন গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করে বসল। এক ক্ষেত্রে হয়তো উদ্দেশ্যটা বাস্তবিকই ফ্যাসীবিরোধী আর এক ক্ষেত্রে তা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবও হতে পারে। এমনকি, শ্রেণীসংঘাতমূলক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের জনগণ যখন কোন একনায়কের বিরোধীও হয়ে ওঠে, আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে তারাও তখন সেই একনায়কের পাশে এসে দাঁড়ায়।

স্পেন ও আর্জ্জেটিনার ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপের নিন্দায় যাঁরা সর্ব্বাধিক মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাই যে এখন সোভিয়েট রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ সমর্থন করছেন, এটা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। কিন্তু নিজেই ল্যাটিন আমেরিকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে সোভিয়েটের ইউরেশিয়ায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রতিবাদ করবে কোন যুক্তিতে ?

কোন কার্য্যকরী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান একটি বা দুটি শক্তিকে

হস্তক্ষেপের অধিকার দান করলে—সে শক্তি বা শক্তিদ্বয়ের চাপে পড়ে কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করতে সে প্রতিষ্ঠান বাধ্য হবেনা—এমন কোন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তের বলেই শান্তিপূর্ণ কোন রাষ্ট্রে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সমর্থন করা যেতে পারে।

স্পেন ও আর্জ্জেন্টিনার একনায়কবাদী সরকার দুটিকে বৃটিশ ও মার্কিণ সরকার তীব্র নিন্দা করেছেন, বারবার তাদের মুখোস খুলে দিয়েছেন; তবুও স্বশস্ত্র হস্তক্ষেপের পথে পা বাড়াননি—মস্কো অবশ্য এতেই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে এতেই বুঝতে পারা যায় নামমাত্র বাধা দিতে পারে এমন দুর্ব্বল দেশগুলির বিরুদ্ধেও সামরিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কত দ্বিধা। আর, সোভিয়েট ইউনিয়নের মত এক শক্তিমান সামরিক রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার ব্যাপারে তাদের দ্বিধা তো আরও বেশী হবে।

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বৃটিশ সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাকে সমালোচনা করবার পর্য্যাপ্ত অবকাশ বর্ত্তমান বলেই আমি মনে করি। এ সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরু ঠিক্‌ই লিখেছেন যে, এখানে "এক ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্য গিয়ে আরও জরাজীর্ণ এক সাম্রাজ্যকে সাহায্য করবার প্রয়াস পেয়েছে।" জাভার রক্তাক্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, ওলন্দাজ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যে আজ ফাটল ধরে গেছে। ক্রেমলিন এতে খুশী হয়েছে বলেই মনে হয়। ঔপনিবেশিক জনসাধারণ যখন পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, বলা বাহুল্য, রাশিয়ার তখন তাতে ঘাবড়াবার মতো কিছু নেই।

গ্রীসে অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের জন্যেও বৃটিশ সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। এটা একটা জটিল পরিস্থিতি, এবং একে আরও ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। আরো নানা দেশের মতো বিক্ষুব্ধ এবং

বুভুক্ষু গ্রীসের ঘরোয়া সমস্যাগুলির জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতাকাড়াকাড়ি যতোখানি দায়ী, ঘরোয়া রাজনৈতিক দলাদলি ততখানি নয়। ১৯৪৬ সালের ৬ই মার্চ্চের নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড্ ট্রিবিউন-এ সামনার ওয়েল্স্ লিখেছিলেন, "শত্রুকবল থেকে মুক্তিলাভের পর গ্রীস যে আজ সোভিয়েট এবং বৃটিশ সার্থের দ্বন্দ্বভূমিতে পরিণত হয়েছে এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।... এতে করে তার গৃহযুদ্ধের আগুনে ইন্ধনই যোগানো হয়েছে।... পশ্চিম এশিয়ার উপরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব বিস্তার করতে চায়: ওদিকে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগরের যোগাযোগ পথ যাতে সমস্ত রাষ্ট্রের কাছেই উন্মুক্ত থাকে—পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তারই ব্যবস্থা করতে দৃঢ়সংকল্প। এর ফলে, পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বিবাদ আজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।"

গ্রীসে যদি কমিউনিষ্ট দল অথবা প্রতিরোধ-বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় (এবং উত্তর আফ্রিকার ত্রিপলিতানিয়া সম্পর্কে রাশিয়া যদি একক অছি নিযুক্ত হয়) তুরস্ক তাহলে অর্দ্ধবেষ্টিত হয়ে পড়বে, রুশশক্তি ইটালীর গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াবে এবং পশ্চিম এশিয়ার বৃটিশ এলাকাভুক্ত অঞ্চলগুলির অবস্থাও তখন সঙ্গীন হয়ে উঠবে। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব বেভিন তাই বলেছিলেন, "রাশিয়া আজ আমাদের গলা টিপে ধরবার উপক্রম করেছে।"

গ্রীক রাজতন্ত্রীদের সমর্থন করাটা চার্চ্চিলের পক্ষে ভুলই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পক্ষে অবশ্য এ ভুল আশ্চর্য্যের কিছুই নয়। রাজতন্ত্রীদের প্রতি শ্রমিক-সরকারের কিছুমাত্রও সহানুভূতি ছিলনা, পক্ষান্তর গ্রহণেরই চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। তা সত্বেও অপারগ হয়ে তাঁদের টোরী কার্য্যকলাপেরই জের টেনে যেতে হয়েছে। সেইসঙ্গে তাঁরা বুঝেছিলেন যে দক্ষিণ ইউরোপে ইংলণ্ডের যে-কয়েকটিমাত্র

ঘাঁটি অবশিষ্ট রয়েছে রাশিয়া যাতে তা দখল করে না নেয় সেজন্যে তাকে বাধা দেওয়া দরকার। গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ-বাহিনী ও কমিউনিষ্ট দলের কার্য্যকলাপের মাধ্যমে এবং ওদিকে দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জকে গ্রীসের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে এক অদ্ভুত মনোভাব অবলম্বন করে রাশিয়া আজ গ্রীসকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করতে উদ্যত। একই উদ্দেশ্যে আলবেনিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়াকেও সে গ্রীক্-জমিদারী করতে উস্কে দিচ্ছে। ইংলণ্ডের ভাঙ্গা হাতিয়ার, তাই সে আজ হাটে আস্‌তে বাধ্য হচ্ছে।

রাশিয়া এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের মূল দ্বন্দ্বভূমি হচ্ছে জার্ম্মানী এবং চীন। রাশিয়া আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটা মিটমাট হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এদুটি দেশ, এবং সেইসঙ্গে গ্রীস ও ইটালীর কপালেও শান্তি কিংবা সমৃদ্ধি নেই। প্রত্যেক পক্ষই আজ পরাজিত চক্রশক্তি, ছোটখাটো নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং চীন অথবা তার কোনও কোনও অংশকে নিজ নিজ দলে টানবার চেষ্টা করছে।

এ প্রচেষ্টাকে নানারকম আবরণ এবং অসাধু প্রচার কার্য্যের আড়ালে ঢেকে রাখা হয়েছে। মার্কিণ এবং বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যদি মার্কিণ এবং বৃটিশ কমিউনিষ্টদের অভীপ্সা অনুযায়ী তাঁদের এলাকা থেকে নাৎসীদের উচ্ছেদ না করেন তবে এক তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অথচ ১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বার্লিনের কমিউনিষ্ট-দৈনিক-এ (Dentsche Volkzeitung) প্রস্তাব করা হলো যে, 'ক্ষুদে নাৎসী'দের জার্ম্মানীর কমিউনিষ্ট-দলে যোগদান করতে অনুমতি দেওয়া হোক্। ঐ সপ্তাহেই জার্ম্মানীর কমিউনিষ্ট-প্রধান উইলহেল্‌ম্‌ পিক্ নাৎসীদের কাছে আবেদন জানালেন যে, "জার্ম্মানীকে এক গণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসীবিরোধী রাষ্ট্রে পরিণত করবার জন্যে" তাঁরা যেন কমিউনিষ্টদের সাহায্য করেন। মার্কিণ

এবং বৃটিশ এলাকা থেকে নাৎসী-উচ্ছেদ নিয়ে যাঁরা মার্কিণ এবং বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছিলেন এক্ষেত্রে তাঁরা কিন্তু চুপচাপ। জার্ম্মান শিল্পপতিদের জার্ম্মানীর পশ্চিমাঞ্চলে কাজ চালাতে দিলে অমনি তাকে রুশবিরোধী যুদ্ধের প্রস্তুতি বলে সোরগোল তোলা হয়। অথচ রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে জার্ম্মান-শিল্পের পুনরুদ্ধারসাধন করলে তখন তাকে বলা হয় তুখোড় রাজনীতি।

জার্ম্মান শিল্পের পরিচালক কারা—গুণাগুণের বিচার তারই উপরে অনেকখানি নির্ভরশীল। হিটলারের অভ্যুত্থান এবং যুদ্ধের পিছনে জার্ম্মান শিল্পপতিদের অনেকখানি হাত ছিল। তাঁদের এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কয়েকটি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র বর্ত্তমান; সে যোগাযোগ কখনো কখনো বা অর্থনৈতিক রূপও নিয়েছে। শিল্পপতিদের আন্তর্জ্জাতিক যোগসূত্র এবং তাদের ঘরোয়া কার্য্যকলাপে কঠোর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখে তাকে আজ ব্যাহত করা প্রয়োজন। বৃটেনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, জার্ম্মান কলকারখানার উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করা হ'লে তাতে করে বুভুক্ষা, বেকার-সমস্যা এবং বিক্ষোভেরই সৃষ্টি করা হবে। পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তাতে নতুন নতুন অসুবিধায় পড়বে, কমিউনিষ্টদের শক্তিবৃদ্ধিরও সুযোগ ঘটবে তাতে। কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। জার্ম্মান শিল্পপতিদের বর্জ্জন করে জার্ম্মান শিল্পের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করাই বোধ হয় এ-সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণলাভের একমাত্র পথ।

জার্ম্মান-পরিস্থিতি সম্পর্কে সব চাইতে বড়ো কথা হলো এই যে, জার্ম্মানীর অর্দ্ধেকাংশই আজ রাশিয়া বা পোল্যাণ্ডের কুক্ষিগত; নয়তো রাশিয়াই তার দখল নিয়েছে। এ-অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মস্কো, পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আর সেখানে মাথা গলাবার কোনও আশা নেই। অপরপক্ষে জার্ম্মানীর

অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে জার্ম্মান কমিউনিষ্ট, কমিউনিষ্ট-প্রভাবাধীন কিছু জার্ম্মান সোস্যাল ডেমক্র্যাট এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু কিছু সোভিয়েটপন্থী মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী ট্রেড-ইউনিয়ন কর্ম্মী মিলে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে রাশিয়ার স্বার্থকে পরিপুষ্ট করেছে।

পূর্ব্ব-জার্ম্মানী এখন একনায়কের হস্তগত। হিটলারী বন্দী-শিবিরগুলিকে আবার নতুন করে খুলে দেওয়া হয়েছে, কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা পতাকা উড়ছে সেখানে। পশ্চিম জার্ম্মানীতেও অবশ্য গণতন্ত্রের অবস্থা তেমন পুষ্ট নয়; না হলেও, সেখানে আজ বক্তৃতা-দান, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল গঠন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

রাশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্ত্তমান তাতে ভাঙ্গন ধরলে পরিণামে জার্ম্মানী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে।

ক্ষমতাকেন্দ্রী রাজনীতির দিক থেকে বিচার করে দেখলে জাপান এবং চীনের ক্ষেত্রে সোভিয়েট সরকার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত। জাপানের রাশ এখন আমেরিকার হাতে। চীন যদি আজ কমিউনিষ্টবিরোধী চিয়াং কাইশেকের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে সমর্থ হয় তবে তা অমোঘভাবেই এক শক্তিশালী মার্কিণ-প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হবে।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে—"মার্কিণ সৈন্যবাহিনীই জাপানের পরাজয় ঘটিয়েছে।" খুবই সত্যি কথা, কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীও তো বাল্টিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং হাঙ্গারী থেকে হিটলারকে বিতাড়িত করেছে, জার্ম্মানীতে গিয়ে হিটলারকে চূর্ণ করবার জন্যেও তো তারাই রক্তপাত করেছে সব থেকে বেশী। তা সত্ত্বেও তো এই সমস্ত দেশে রাশিয়ার নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার আপত্তি বর্ত্তমান।

মুরগী আগে, না ডিম আগে?—বিতর্ক জিনিশটা সবসময়েই মুখরোচক বটে, কিন্তু সচরাচর তা ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হয়। মার্কিণ সৈন্যবাহিনী টোকিও উপসাগরে গিয়ে পৌঁছুবার এবং জাপ সৈন্যবাহিনী চীন থেকে বিতাড়িত হবার অনেক আগেই রাশিয়া গিয়ে বাল্টিক অঞ্চল, পোল্যাণ্ড, বল্কান রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং মাঞ্চুরিয়ায় তার দাবী জানিয়ে বাঁশগাড়ি করে এসেছে। উত্তরে মস্কোও বলতে পারে যে, জাপান এবং চীনের সম্পর্কে মার্কিন-অভিসন্ধি যে কী তা বুঝতে পারাটাও কিছুমাত্র কঠিন নয়। তা ছাড়া চার্চ্চিলও কি ঘোষণা করেননি যে, বৃটেন তার সাম্রাজ্যকে জলে ভাসিয়ে দিতে রাজী নয়? তবে রাশিয়াই বা কেন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে না?

আমার নিজের অভিমত হচ্ছে এই যে, ইংলণ্ডকে তার সাম্রাজ্য গুটিয়ে আনতে হবে, রাশিয়াকে তার সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতে হবে এবং আমেরিকার পক্ষেও সাম্রাজ্যাভিলাষী হওয়া চলবেনা। এই পথেই যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-ভীতির অবসান ঘটানো সম্ভব।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখন পিছু হট্‌ছে; মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদও তেমন কিছু পূর্ণাঙ্গ নয়। রুশ সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে ক্রমপ্রসরমান। যে জনসাধারণের উপর দিয়ে তা হিমপ্রবাহের মতো এগিয়ে চলেছে তাদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে তার কিছুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই। এ কথার প্রমাণস্বরূপ ইরাণ, মাঞ্চুরিয়া-লুণ্ঠন, পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান ও জার্ম্মানীর কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নেওয়া, এবং ইউরোপে যে সমস্ত অত্যাচারী সোভিয়েট-তাঁবেদার সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তার উল্লেখ করা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অথবা গ্রেট বৃটেন কিন্তু ইউরোপ মহাদেশের সামান্যতম পরিমাণ জমিও কুক্ষিগত করেনি, কোনও দেশকেই বিভক্ত করেনি তারা, কারুর উপরেই লুণ্ঠন চালায়নি। কোনও দেশেই তারা

নিজেদের খুশীমতো সরকারের প্রতিষ্ঠা করে তারপর তাকে কায়েম করে রাখবার জন্যে সেখানকার ভোটদাতাদের উপরে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করেনি।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী বিমান ও নৌবাহিনী গড়ে তুলেছে। সে আজ আরও কয়েকটি দ্বীপে ঘাঁটিস্থাপন করতে চায়। রাশিয়াও লক্ষ লক্ষ লোককে সশস্ত্র করে রেখেছে, বৃহত্তর এক নৌবাহিনীও গড়ে তুলতে চায় সে। অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধিতেই সে এখন ব্যস্ত। ১৯৩৯ সাল থেকে কাজে হাত দিয়ে সে আজ একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। সে সাম্রাজ্য ক্রমেই স্ফীততর হয়ে চলেছে—স্বাধীনতা সেখানে মৃত।

আমেরিকা অথবা বৃটেনের মনে যে রাশিয়াকে আক্রমণ করবার লেশমাত্র অভিসন্ধিও আছে—এমন কোনও প্রমাণ নেই। এমন কোন প্রমাণও নেই যে রাশিয়ার মনে আমেরিকা অথবা গ্রেট বৃটেনের উপরে আক্রমণ চালাবার অভিসন্ধি বর্ত্তমান। তবে একথা পরিষ্কার যে রাশিয়ার রাজ্যবিস্তারনীতির ফলে এক জটিল বিশ্ব-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যবিস্তারনীতি আমাদের যুদ্ধের মুখেই ঠেলে দেয়।

জার্ম্মানী এবং জাপানের পরাজয়ের পর বেশ কয়েক মাস ধরেই রাশিয়ার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে অসংখ্য মার্কিণ, ইংরেজ ও অন্যান্যদেশীয় ব্যক্তিদের মনও পীড়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাশিয়ার কু-মতলব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ না থাকায় তাকে তাঁরা রেহাই দিয়েই এসেছেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, পোল্যাণ্ড বল্‌কান রাষ্ট্রপুঞ্জ, অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মানী এবং এশিয়ার সম্পর্কে মস্কো যে নীতি অবলম্বন করেছে তা একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র। উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও তাই এ নিয়ে তাঁরা আর কোনও উচ্চবাচ্য করলেননা। মনে মনে নিদারুণ আশঙ্কা পোষণ করেও মুখে তাঁরা রাশিয়ার প্রশস্তি গেয়েই চললেন।

তেহেরাণ, ইয়াল্টা, পট্‌সডাম ইত্যাদি যুদ্ধকালীন সমস্ত সম্মেলনেই রাশিয়ার এক ভোটের গুরুত্ব ছিল গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুই ভোটের থেকেও বেশী। রাশিয়াকে চটানো চলেনা; লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনকে তাই বিচারবুদ্ধির মাথা খেয়ে রাশিয়ার কথা মেনে নিতে হয়েছে।

যুদ্ধকালীন কূটনীতি থেকে শান্তিকালীন কূটনীতিতে উত্তীর্ণ হবার সময়ে এ মনোভাবের মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনের সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধোত্তর সম্মেলনে মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব বার্ণেস্ এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব বেভিন, দুজনে মিলে রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব মলটফ্‌কে শান্তিকালীন গণিতের রীতিনীতি শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন: এক এক-ই, এক-এর গুরুত্ব দুইয়ের থেকে বেশী নয়। মলটফ্ বললেন, তা-নয়। এমন পুরোপুরিভাবে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য হলো যে, তাঁরা যে দ্বিমত হয়েছেন এ-কথা ঘোষণা করে ইস্তাহার প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁরা একমত হতে পারলেন না। শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফ্রান্স এবং চীনকেও মাথা গলাতে দিতে রাজী হলেন না মলটফ্। তিনি চেয়েছিলেন যে প্রধান রাষ্ট্রত্রয়ের প্রভুত্বই স্থাপিত হোক; আশা করেছিলেন যে, প্রধান রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে আবার রাশিয়া তার সেই যুদ্ধকালীন কূট-গণিতের সাহায্যে প্রধানতম হয়ে উঠতে পারবে।

এক-এর গুরুত্ব দুইয়ের থেকে বেশী — এ হলো গিয়ে একনায়কত্ববাদী গণিতশাস্ত্রের কথা। এক-এর গুরুত্ব সেখানে উনিশ কোটির থেকেও বেশী।

রাশিয়ার আচরণে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও সে আজ একনায়ক হয়ে উঠতে চায়। পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ এবং চীন তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তা-সত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে

সম্পর্ক বজায় রাখবার গুরুত্ব তখন এত বেশী যে, এত সহজেই সে সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়া চলেনা। বার্ণেস্ স্থির করলেন যে, আর একবার তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে পররাষ্ট্র-সচিবত্রয় পুনরায় মিলিত হলেন। ইরাণ এবং তুরস্কের অবস্থা তখন খুবই উত্তেজনাপূর্ণ, অথচ নিঃশব্দে এদুটি সমস্যাকে সেখানে এড়িয়ে যাওয়া হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে যা-কিছু নিয়েই আলোচনা হলো সেখানে তাতেই জিতলেন মলটফ্।

সকলের মনই তখন সংশয়াচ্ছন্ন; তা-সত্বেও তাদের সংযম এবং আশাবাদের বাঁধ ভাঙ্গেনি। অতঃপর ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন আহূত হলো। গ্রীস এবং ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ে ঘোরতর বাগবিতণ্ডা হয়ে গেল বেভিন এবং ভিসিন্স্কির মধ্যে। ইরাণ সম্পর্কে রুশ-প্রতিনিধি কিন্তু কথা পাড়তেই রাজী হলেননা। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সেখানে যে ভূখণ্ডের উপরে 'স্বাধীন' আজেববাইজান সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আবাব স্ট্যালিনের সোভিয়েট-জর্জ্জিয়ারই লাগোয়া। এ অঞ্চল তখন রুশ-সৈন্যবাহিনীর দখলে। এর কিছু আগে রাশিয়া দাবী করেছিল যে, উত্তর ইরাণে তাকে তেলের ব্যাপারে কিছু সুবিধা দান করতে হবে। তেহেরাণ তাতে রাজী হয়নি।

এর ফলে ইঙ্গ-রুশ এবং রুশ-মার্কিণ সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়। লণ্ডনে আমেরিকার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন সেনেটর আর্থার এইচ্ ভ্যান্ডিবার্গ। সেখান থেকে ফিরে এসে সেনেটে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলে। তাতে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—"রাশিয়ার উদ্দেশ্য কি এখন?" তিনি বলেছিলেন, "রাশিয়াকে নিয়েই এ যুগের সবচাইতে বড়ো সমস্যা।" পররাষ্ট্র-সচিব বার্ণেসও সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন থেকে ফিরে এসে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করেন। রাশিয়ার

'হামলা'র উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, পৃথিবীর অবস্থা আজ "সুস্থ অথবা আশ্বাসপ্রদ" নয়। ঐ একই দিনে সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে যোগদানকারী অন্যএকজন মার্কিণ-প্রতিনিধি জন ফষ্টার ডাল্‌স্‌—মাঝে মাঝে ইনি ডেমক্র্যাট সরকারের রিপাবলিক দলভুক্ত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ চালিয়েছেন—ফিলাডেলফিয়ায় এক 'বৈদেশিক নীতি সমিতি'র সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করা আজ রীতিমত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে; সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যে সে সহযোগিতা চায় তা-ও মনে হয়না।"

আটলাণ্টিক মহাসাগরের দুই তীরবর্ত্তী দেশ, এবং আরো নানা জায়গার সাংবাদিক, ভাষ্যকার, সম্পাদক এবং জনসাধারণ তখন ঘনায়মান সঙ্কট সম্পর্কে উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেছিল।

প্রত্যেকের মুখেই তখন এক প্রশ্ন, "রাশিয়াকে নিয়ে কি করা যায়?"

চিত্রশিল্পী উইনষ্টন চার্চ্চিল তখন শরীর সারাতে ফ্লোরিডায় এসেছেন। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাঁচ বছর ধরে তিনি যে গুরুদায়িত্ব পালন করে এসেছেন তাতে ন্যায্যভাবেই তাঁর এ-ছুটি পাওনা ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে তিনি মিসৌরীর ছোট্ট সহর ফুল্‌টনে এলেন। উদ্বেগাকুল পৃথিবী তখন কান খাড়া করে রয়েছে। চার্চ্চিলকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে ট্রুম্যান বললেন, "মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় যে গঠনাত্মক কথারই সন্ধান পাওয়া যাবে তা আমি জানি।" তিনি জানতেন, কেননা সে-বক্তৃতার বিষয়বস্তুও তিনি জানতেন। শুধু তিনি নন, পররাষ্ট্র-সচিব বার্ণেসও।

চার্চ্চিল সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, "সময় বড় কম।"

তিনি বললেন, "সময় থাকতেই সাবধান হওয়া ভালো।"

আরো বললেন, "মিত্রশক্তির জয়লাভে যে দৃশ্যপট আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার উপরে আজ এক কালো ছায়া এসে পড়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়া এবং তার কোমিণ্টার্ণ-সংগঠন নিকট ভবিষ্যতে কি করতে উদ্যত কেউ তা জানেনা। সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আজ যে রাজ্যবিস্তার এবং অপরকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার শেষ কোথায় তা-ও কারো জানা নেই।"

মারাত্মক কথা।

চার্চ্চিল বললেন, "সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধকামী এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনা। যুদ্ধেব ফলাফলকে তারা নিজেদের স্বার্থে নিযুক্ত করতে চায়; সেই সঙ্গে তাদের শক্তি এবং নীতির ক্ষেত্রকেও অনির্দ্দিষ্টভাবে প্রসারিত করে যেতে চায়।"

কিসের প্রস্তাব করলেন চার্চ্চিল ?

"ইংরিজীভাষী জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব।"

"বৃটিশ কমন্‌ওয়েলথ ও তার সাম্রাজ্যের সঙ্গে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রেব বিশেষ মৈত্রীবন্ধন।"

চার্চ্চিল তাঁর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা কবে বললেন, "আমাদের সামরিক-উপদেষ্টাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বর্ত্তমান তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তাতে করে পারস্পরিক সহযোগিতায় আমবা বিপদেব মারাত্মকতা অনুধাবন করতে পাববো; আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও শিক্ষাদানপ্রণালীও হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেইসঙ্গে আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতেও অফিসার এবং ক্যাডেটের আদানপ্রদান চলতে থাকবে। পারস্পরিক নিরাপত্তার বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তার জন্যে সারা পৃথিবীতে আমাদের যে সমস্ত নৌ ও বিমান-ঘাঁটি ছড়িয়ে রয়েছে সম্মিলিতভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।...ইতিমধ্যেই বহু দ্বীপ আমরা যুক্তভাবে ব্যবহার করেছি, নিকট-ভবিষ্যতে আরো দ্বীপ আমাদের রক্ষণাধীনে আসতে পারে।... যা কিছুই ঘটুক না কেন, আমরা যদি এই পথে চলি তবেই আমাদের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভবপর হবে।..."

এই উক্তি সামরিক মৈত্রীচুক্তির তুল্য।

স্টালিন এক সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে চার্চ্চিল, তাঁর এই প্রস্তাব এবং বৃটেনের শ্রমিক সরকারের তীব্র নিন্দা করেন। এ সাক্ষাৎকার এক অস্বাভাবিক ঘটনা। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলিও ক্রোধান্ধ বাক্যবাণে জর্জ্জর করে তুললো চার্চ্চিলকে। আমেরিকায় এর বিভিন্নপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কেউ কেউ তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গী এবং মৈত্রীপ্রস্তাবে খুশী হলেন। কারো কারো বা—তাঁদের মধ্যে আমিও একজন—মনে হলো যে, বর্ত্তমান যুগের মূল সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চার্চ্চিল তাদের উপকারই করেছেন সত্য, তবে তাঁর প্রস্তাবটি বাজে। এ প্রস্তাব পর্য্যাপ্তও নয়। শ্রমিকদের জন্যে যথেষ্ট মজুরী, কৃষকদের জন্যে যথেষ্ট জমি, জাতি ও শ্রেণী-নির্বিবশেষে সকলের জন্যে স্বাধীনতা এবং প্রত্যেকটি দেশ ও উপনিবেশের শৃঙ্খলমোচনের ব্যবস্থার উপরেই বিশ্বশান্তি নির্ভরশীল। শুধুমাত্র মৈত্রীচুক্তির মারফতে এ সব সম্ভব নয়।

এ যুগ জনসাধারণের যুগ নয়। জনসাধারণ সবেমাত্র চড়াগলায় তার দাবী জানাতে সুরু করেছে। যদি তার কর্ম্মসংস্থানের ত্রুটি ঘটে, যদি তার খাদ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা না হয়, বৈষম্যের হাত থেকে যদি সে মুক্তি না পায়—সে তাহলে সহজেই একনায়কদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে পারে। একনায়করা জনসাধারণকে এই সমস্ত কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেন। পরিবর্ত্তে, যতদিন না সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা পালন করছেন ততদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণকে তাঁরা স্বাধীনতা পরিহার করে অপেক্ষা করতে বলেন।

গণতান্ত্রিক পৃথিবীর যতো কিছু ত্রুটি বর্ত্তমান—কমিউনিষ্টরা সে ত্রুটিকে গণতন্ত্র ধ্বংসের কাজেই নিয়োজিত করবে। ইতস্ততঃ,

বিশেষতঃ ল্যাটিন আমেরিকায়, ফ্যাসিষ্টরাও এই একই কৌশল অবলম্বন করেছে।

মস্কো এক আয়না তুলে ধরেছে। সে আয়নায় যারা মুখ দেখতে যায়, কখনো কখনো তাদের দুঃখদুর্দ্দশা আরো বড় হয়েই ফুটে ওঠে তাতে। মৈত্রীচুক্তি অথবা ক্ষমতাকেন্দ্রী অন্য যে-কোনও রাজনৈতিক আয়োজনই এর বিরুদ্ধে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

চার্চ্চিলের প্রস্তাব হলো এক উনিশ শতকীয় ক্ষমতাকেন্দ্রী রাজনৈতিক প্রস্তাব। রুশ উচ্ছৃতির সামান্য কিছু অংশকে মাত্র এর সাহায্যে ঠেকিয়ে রাখা যায়, আর কিছু না হোক তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারা যায় হয়তো। কিন্তু রাশিয়া তো শুধু এক রাষ্ট্রমাত্রই নয়, রাশিয়া বলতে শুধুমাত্র পিটার দি গ্রেটকে বোঝায়না আর। পিটার এখনও পর্য্যন্ত সেখানে আছে সত্যি, তবে হাতে তার মার্ক্সীয় প্রহরণ। সে মার্ক্স বিকৃত, তাকে চিনে নেওয়া অসম্ভব। তা সত্ত্বেও, পর্য্যুষিত গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ, এখনও পর্য্যন্ত সেই মার্ক্সই তার প্রতীক।

হিটলারের বিরুদ্ধে চমৎকার যুদ্ধ চালিয়েছিলেন চার্চ্চিল, পিটারের বিরুদ্ধেও তিনি তা পারেন। কিন্তু মার্ক্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার মতো উপযুক্ত অস্ত্র নেই তাঁর। বস্তুতঃ হিটলারকে তিনি চূড়ান্ত আঘাত হেনেছেন কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ বর্ত্তমান। হিটলারও সারা পৃথিবীকে ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। ইউরোপের অবস্থা তখন রোগজীর্ণ। তা না হলে তাঁর সাঁড়াশী বাহিনী আর বোমারু-বিমান এত তাড়াতাড়ি ইউরোপকে ধরাশায়ী করে ফেলতে পারতোনা। এশিয়াতেও, যথা জাভায়, ব্রহ্মে ও চীনে, জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষ বর্ত্তমান—সেই অসন্তোষই জাপানের জয়যাত্রার পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে তুলেছিল। হিটলার এবং জাপান আজ পরাজিত; পৃথিবী এবং মানবসমাজকে এখন সুস্থতর করে গড়ে

তোলা দরকার। তা যদি না হয় তবে, হিটলার এবং জাপানী জঙ্গী-নেতাদের জায়গায় স্টালিনেরই অধিষ্ঠান হবে মাত্র।

হিটলার, মুসোলিনী এবং হিরোহিতো—গণতান্ত্রিক পৃথিবীকে এঁরা বিপদাপন্ন করে তুলেছিলেন। এঁদের আমরা চূর্ণ করেছি। রাশিয়া এখন গণতান্ত্রিক পৃথিবীকে বিপন্ন করে তুলেছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোনওদিনই গণতন্ত্রকে এতবড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। গণতন্ত্র যদি আজ তার শক্তিবৃদ্ধি না করে তবে তার বিনাশ অনিবার্য্য।

যাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই উদ্যতি—তাদের চাইতে তার শক্তিবৃদ্ধির অধিকতর অবকাশ বর্ত্তমান; কিন্তু তাই বলে চুপ করে বসে থাকা চলেনা। রুশ-প্রভুত্বাধীন জনসাধারণের কানে আজ বাইরের জগতের আহ্বান গিয়ে পৌঁছুবেনা। লৌহ-অবরোধে তাদের ঘিরে রাখা হয়েছে। উঁচু দেয়াল, এবং সে দেয়ালের অন্তরালবর্ত্তী জনসাধারণ তাতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। রাশিয়ার উদ্যতির মূলে তার শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তার ত্রুটি।

ভারতবর্ষে মানুষ মরছে; চীনে অসন্তোষ, গ্রীসে অন্তর্ব্বিরোধ, ইটালীতে সাধারণতন্ত্র এবং স্পেনে ফ্যাসীবিরোধিতার প্রাবল্য। রাশিয়ার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক আর নাই হোক তার জন্যে এর কোনও হেরফের ঘটবেনা। বর্ত্তমান ব্যবস্থার যারা বিরোধী—সোভিয়েট সরকার আজ তাদের মুখপাত্র এবং সমর্থক হয়ে উঠেছেন। বিরোধিদের একত্র করে সোভিয়েট সরকার আজ তাদের দিয়ে নিজের কার্য্যোদ্ধার করছেন।

"রাশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে" ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে হবে? রুশ-সীমান্ত অথবা রুশ-এলাকার বাইরে কি করে তার সাহায্যে রাশিয়াকে দমন করা সম্ভব? সৈন্যবাহিনী নিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উপর অভিযান চালিয়ে সোভিয়েট সরকারের পতন ঘটাতে হবে? কিন্তু তাতেও তো লক্ষ লক্ষ লোক

মারা পড়বে। না হয় সে অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলো, কিন্তু তাতেও তো গণতন্ত্রের অবক্ষয় রোধ করা যাবেনা। বরং তাতে তার উল্টো ফল ফলবারই সম্ভাবনা।

সামরিক এবং কূটনৈতিক ভিত্তিতেই চার্চিল এ-সমস্যার সমাধান করতে চান,—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিতে নয়। কিন্তু এ-সমস্যা প্রধানতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাই।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি বলতে এতদিন বিভিন্ন সরকারের সম্পর্ককেই বোঝাত। তা ছিল বৈদেশিক নীতি। কিন্তু তার পরে এক তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। বৈদেশিক দপ্তরগুলি এখনো পর্য্যন্ত সে পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে উঠ্‌তে পারেনি। জনসাধারণের নানারকম সমস্যা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কূটনীতির সামনে। চীনের সঙ্গে আমেরিকার যে সম্পর্ক বর্ত্তমান, সে সম্পর্ক শুধু সেখানকার চীফ অব ষ্টেট, পররাষ্ট্র-সচিব বা বৈদেশিক বণিকদের মধ্যেই সীমিত থাকতে পারেনা; চীনের বর্ত্তমান ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন, এবং তার শিল্পোন্নয়নের জন্যেও আমেরিকাকে চেষ্টিত হতে হবে। জার্ম্মানীর কমিউনিষ্টরা আজ সেখানকার সোস্যাল ডেমক্র্যাটদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের গ্রাস করতে চেষ্টা করছে। সোস্যাল ডেমক্র্যাটরা এ সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পাবে কিনা—জার্ম্মানীর সঙ্গে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সম্পর্কনির্দ্ধারণের মধ্যে এই প্রশ্নই নিহিত। ইঙ্গ-মার্কিণ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনিবার্য্য-ভাবেই সমাজতন্ত্র, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা-প্রদান এবং শুল্ক-সংক্রান্ত নানাকথা এসে পড়বে।

এই কারণেই কূটনীতিকদের পক্ষে আজ শম্বুকধর্ম্মী হয়ে থাকবার কোনও উপায় নেই। কূটনীতিকে আজ নথিপত্র, "আলাপ-আলোচনা" এবং স্মারকলিপির মণিহর্ম্য থেকে চাষীর পর্ণকুটীরে, কারখানায় আর

রাজনৈতিক দলগুলির সমতলে নিয়ে আসতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হতাশা এবং কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও কূটনীতিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; এই হতাশা আর এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই একনায়কের পালে হাওয়া লাগায়।

মানবজীবন যতো উদার, যতো গভীর, যতো গ্রহিষ্ণু—আমেরিকা এবং বৃটেনের বৈদেশিক নীতিকেও ততোখানি উদার, গভীর এবং গ্রহিষ্ণু করে তোলা দরকার। রাশিয়া আজ যে উদ্ধতির পরিচয় দিচ্ছে একমাত্র এই তারা তার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারবে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যবিস্তারের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ সবকার ইতিমধ্যেই তাদের ভাঙা সামরিক সেতুগুলির সংস্কারসাধনে মন দিয়েছেন, সম্ভব হলে একযোগেই তা করছেন তাঁরা। রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ চল্‌তে থাক্‌লে তার ফলে এক ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক মৈত্রীসম্পর্কেরই সৃষ্টি হবে; নামে না হলেও কাজে হবে।

কিন্তু এখানেই থেমে গেলে পর ইংলণ্ড এবং আমেরিকার পক্ষে রুশ-প্রচেষ্টা সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভবপর হবেনা। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের মধ্যেই রাশিয়া ভাঙন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। দারিদ্র্য এবং গণতন্ত্রের মূল সমস্যার কোনও বিহিতই করতে পারা যাবেনা তেমন আবহাওয়ায়। সমরসজ্জার ব্যয়ভারে জনসাধারণের মেরুদণ্ড বেঁকে যাবে, নির্জীব হয়ে আস্‌বে স্বাধীনতা।

ভৌগোলিক বিচারে এ পৃথিবী যে অখণ্ড তাতে সন্দেহ নেই, তবে রাজনীতি এবং আদর্শের ক্ষেত্রে সে অখণ্ড সত্তায় ভাঙন ধরে গেছে। দুটি পৃথক পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে আজ, খুব সম্ভবতঃ তিনটির,—রাশিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা এবং অবশিষ্ট অঞ্চল। এই অবশিষ্ট অঞ্চলেই তাদের মধ্যে আজ বিরোধ বেধে উঠেছে।

ঘরে-বাইরের প্রবল চাপে ইউরোপ অথবা এশিয়ার কোনও দেশের পক্ষেই আর এখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব নয়। তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই, এমন কি যেসমস্ত দেশ পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে রুশ-প্রভুস্বাধীন—সেখানেও, দুই পৃথিবী আজ প্রাধান্যলাভের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বমান।

ইঙ্গ-মার্কিণ জগতের মধ্যে যেমন কমিউনিষ্ট প্রভাব এসে প্রবেশলাভ করেছে, তেমনি রুশ-অঞ্চলেরও যেখানে যেখানে মানুষ আজ অবিশ্রান্ত উত্তেজনার হাত থেকে মুক্তি আর পরিত্রাণ পেতে চায়, পাশ্চাত্য জগতের প্রভাব সেখানে বর্ত্তমান। অবিশ্রান্ত উত্তেজনাই হলো একদলীয় স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য।

কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট রণাঙ্গনে যে এই দুই পৃথিবীর যুদ্ধ চলছে তা নয়, একে অপরের সীমানা ডিঙিয়ে যায় মাঝে মাঝে। ফ্রান্সের মধ্যে দুই পৃথিবীরই প্রভাব বর্ত্তমান, জার্ম্মানীর মধ্যেও। যেখানে স্বাস্থ্য আছে কিন্তু পর্য্যাপ্ত শক্তি নেই, যথা স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অঞ্চল, সেখানে একবার এই দুই পৃথিবীর মধ্যে ভারসাম্যবিধানের জন্যে চেষ্টা করে দেখা হবে,—দুই পৃথিবীর কাছ থেকেই যাতে উপকার পাওয়া যায়, কারও কাছেই যাতে না হার মানতে হয়।

রণাঙ্গন দীর্ঘ, যুদ্ধও দীর্ঘদিন চলবে। রণাঙ্গন পরিবর্ত্তিত হবে, যুদ্ধেরও নিবৃত্তি ঘটবে মাঝে মাঝে। যুদ্ধবিরতির জন্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে মাঝে মাঝে, বন্দীবিনিময়ও চলবে সেইসঙ্গে।

শুধু চুক্তি নিষ্পন্ন করে কোনও লাভ নেই। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত যে পথ, তাকেও এই অনাক্রমণ-চুক্তি, শান্তি-সম্মেলন, শান্তিরক্ষার স্থির ও আন্তরিক প্রতিশ্রুতি এবং শান্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা দিয়েই মুড়ে রাখা হয়েছিল।

যুদ্ধটাও একটা রাষ্ট্রগত সম্পর্ক। স্বভাবতই সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন এবং জাতি-সঙ্ঘ ও শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

একটা নতুন রাষ্ট্রগত সম্পর্কের সৃষ্টি করে তারই মারফতে যুদ্ধের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে।

নাৎসী-জার্ম্মানীর তুলনায় পোল্যাণ্ড ছিল খুবই দুর্ব্বল—যুদ্ধ বাধবার প্রত্যক্ষ কারণই হলো তাই। পোল্যাণ্ডের পিছনে যদি কোনও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন থাকতো, আর হিটলার যদি জানতেন যে পোল্যাণ্ডকে (অথবা অন্য যে-কোনও রাষ্ট্রকে) রক্ষা করতে সে প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে—এযুদ্ধ তাহলে হয়তো না-ও বাধতে পারতো।

কিন্তু একথা বললে বিশ্ব-পরিস্থিতিকে অতিমাত্রায় সহজ করে দেখানো হয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, পোল্যাণ্ড সেরকম কোনও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন পায়নি; তখন তা সে পেতেও পারতোনা। কেননা, ইঙ্গ-ফরাসী ঘোঁটের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের ঔদাসীন্যের ফলে অনুরূপ যে কোনও প্রতিষ্ঠানেব কার্য্যই তখন ব্যাহত হতো।

অবস্থা আজ আগের চাইতে ভালো, কেননা যৌথ-নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আজ আমাদের ক্ষমতার মধ্যে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি আজ কোথাও রাজ্যবিস্তার করতে চায় কোনও রাষ্ট্রগোষ্ঠীই তবে তাকে ঠেকাতে পারবেনা। রাজ্যবিস্তারের নেশায় যুদ্ধ বাধাবাব ইচ্ছা অবশ্য তাব নেই।

আক্রমনাত্মক কার্য্যকলাপ থেকে ইংলণ্ডকে কিন্তু নিবৃত্ত করা চলতে পারে।

সরাসরিভাবে, অথবা কোনও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মারফত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যদি আজ কর্ম্মতৎপর হয়ে ওঠে রাশিয়াকেও তাহলে, আগামী কয়েকবছরের মধ্যে তো বটেই, ঠেকানো যেতে পারে; নাৎসীদের পরাজয় ঘটাতে যে পরিমান শোণিত এবং সম্পদ ক্ষয় হয়েছে তাতে সে আজ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সোভিয়েট

সরকার বড় রকমের কোনও যুদ্ধ চাননা; তাঁরা যদি বুঝতে পারেন যে, যৌথ-নিরাপত্তার তাগিদে অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রও ছোটখাট সঙ্ঘর্ষের মধ্যে মাথা গলিয়ে তাকে একটা গুরুতর ব্যাপারে পরিণত করবে, তবে ছোটখাট যুদ্ধ এড়াবার জন্যেও আপ্রাণ চেষ্টা তাঁরা করবেন।

রাশিয়ার রাজ্যবিস্তার নীতি প্রধান রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে যদি আজ বিচ্ছেদ না ঘটায়,—বিশ্বযুদ্ধ নয়, প্রভাববিস্তারলিপ্সু বৃহত্তর রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক ছোটখাট রাজ্যগ্রাস, আক্রমণ এবং তার ক্ষতিসাধনই তাহলে আগামী পাঁচ ছ' বছরের মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। যে সমস্ত রাষ্ট্র রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হয়নি তারাই কিছুদিন পরে একে একটা সঙ্কট বলে বিবেচনা করবে—এবং এরই ফলে হয়তো সৃষ্টি হবে প্রথম আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু-যুদ্ধের।

পররাজ্য আক্রমণ থেকে রাশিয়াকে নিবৃত্ত করবার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিণ মৈত্রীচুক্তি খুবই কার্য্যকরী হবে হয়তো। সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানকে যদি শক্তিশালী করে' তোলা যায়, অর্থাৎ যদি সেখানে ভেটো-ক্ষমতার অবসান করা হয়, তবে তাকে দিয়েও সে কাজ চল্‌বে। কিন্তু মৈত্রীচুক্তি অথবা সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পররাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিলোপসাধন-প্রচেষ্টা থেকে মস্কোকে নিবৃত্ত করা যাবে কেমন করে?

মিত্রপক্ষ অথবা কোনও কার্য্যকরী আন্তর্জ্জাতিক যৌথনিরাপত্তা সঙ্ঘের মারফতে কোনও রাষ্ট্রের বি-সম শক্তিকে সহজেই সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা যায়; কিন্তু এ-রকম ক্ষমতাকেন্দ্রী উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বি-সম সামাজিক, রাষ্ট্রিক অথবা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব নয়। এই বি-সম বৃদ্ধির ফলেই কেউ কেউ রাজ্যবিস্তারলিপ্সু হয়ে ওঠে, আবার কেউবা তাদের প্রতিহত করবারও ক্ষমতা হারায়।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি এবং শান্তি আজ মৈত্রীচুক্তি অথবা

কোনও সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠানের উপরে চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নীতি এবং বিভিন্ন সরকারের সামাজিক চরিত্রের উপরেই তা চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল।

মনে করা যাক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন এবং অন্যান্য যে-সমস্ত দেশ তাদের অনুসরণ করতে সম্মত তারা সকলে মিলে এক বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলো; আরো মনে করা যাক যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তাতে যোগদান করলোনা, কেননা সে কোনও পুঁজিবাদী সরকারের অংশবিশেষে পরিণত হতে অনিচ্ছুক—আর না হয়তো তার ধারণা যে, সেরকম কোনও প্রতিষ্ঠানে শোচনীয়ভাবে তাকে ভোটের জোরে হারিয়ে দেওয়া হবে। কি করা হবে তখন?

যে-মুহূর্ত্তে অ-সোভিয়েট দেশগুলি বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রস্তুত হচ্ছে—যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই মঙ্গল—সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বপ্রকারে তাদের সোভিয়েট সরকারের সহযোগিতা আহ্বান করতে হবে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই সেখানে ব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক অধিকার থাকবে। রাশিয়া যদি নিজেকে দূরেই সরিয়ে রাখতে চায় তাহলে সেজন্যে তার উপরে যেন কোনওরকম চাপ দেওয়া না হয়, কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেন না অবলম্বন করা হয় তার বিরুদ্ধে। অ-সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলিকে সেক্ষেত্রে পৃথিবীর চারপঞ্চমাংস নিয়েই বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সবসময়েই দরজা খোলা রাখতে হবে রাশিয়ার জন্যে।

পরিণামে যে-বিরোধের সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে তার হাত থেকে পরিত্রাণলাভের জন্যে কেউ কেউ বলতে পারেন—আপাততঃ বিশ্ব-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা মুলতুবী রাখা হোক। কিন্তু তাতে করে বিরোধের অবসান ঘটানো যাবেনা, সে-বিরোধকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হবে মাত্র। বিরোধ তো এখনই বর্ত্তমান। এ-পৃথিবী যদি অখণ্ড-পৃথিবী হতো—তবে আনন্দের সঙ্গেই তার অস্তিত্ব ঘোষণা করতাম আমরা।

পৃথিবী যখন দ্বিধাবিভক্ত সে-সত্যকে তখন স্বীকার করে' নেওয়াই ভালো।

রাশিয়ার যোগদানসাপেক্ষ বিশ্ব-সরকার সংগঠনের কাজ যদি মুলতুবী রাখা হয়, তবে তাতে করে রাশিয়াকেই চিরদিনের জন্যে অ-সোভিয়েট দেশগুলিকে বিভক্ত করে রাখতে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার চাপকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা তারা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আজ যে অখণ্ড পৃথিবীর স্বপ্নে মশগুল—বোল্‌শেভিকরা সেরকম কোনও স্বপ্ন দেখেনা—তাকে জীইয়ে রাখার চাইতে যদি আজ দুই পৃথিবীর মধ্যেকার ফারাককে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাদের চোখে তা-ই ভালো। পৃথিবীর এক অংশ আজ নিজের অবস্থাকে সুদৃঢ় করে নিচ্ছে—প্রভাবাধীন এলাকার সীমানা বাড়িয়ে যাচ্ছে—সেইসঙ্গে স্বার্থ বিপন্ন করে তুলেছে অপর অংশের।

পৃথিবী যদি এক-পৃথিবী হতো—সুস্থ পৃথিবী হতো—তবে তাতে খুব খুশীই হতাম আমি। কিন্তু চোখ বুজে বসে থেকেই তা কিছু সম্ভব করে তোলা যায়না। এক-পৃথিবী খুবই মহান আদর্শ। মানব-সমাজের সামনে এই আদর্শ তুলে ধরেছিলেন উইলকী—তিনিও একজন মহান ব্যক্তিই ছিলেন। কিন্তু এই এক-পৃথিবী একটা অবাস্তব ব্যাপার।

পৃথিবী দুই বি-সম অংশে বিভক্ত হয়ে গেলেই যে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটবে এমন কোনও কথা নেই। বানিজ্য এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিগত আদানপ্রদান বাড়তে পারে তাদের মধ্যে, এ ওর দেশে গিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারে। দুই-পৃথিবীর মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে অহিংস-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে' রাখা যেতে পারে দীর্ঘদিনের জন্যে।

এ-প্রতিযোগিতার স্বরূপ কি? সেই পুরোনো পাশ্চাত্যবিরোধী স্লাভ মেসায়াবাদকেই কি কমিউনিস্টদের আজকের এই আদর্শপ্রচারের